জীবন ও কর্ম
আয়েশা
رضي الله عنها
রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রী, সঙ্গিনী, ফকীহ
রাশীদ হাইলামায
অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী

Aisha ﷺ: The Wife, the Companion, the Scholar-এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী, সঙ্গিনী, ফকীহ

রাশীদ হাইলামায

ইংরেজি অনুবাদ | **তুবা ওযের গুরবুয**

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

◆

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর

খলীফা, হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.
মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ড. রাশীদ হাইলামায। তুরস্কের একজন ইসলামী গবেষক এবং সীরাত লেখক। ইতিমধ্যে আমরা তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছি; *খাদিজা রা. : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি*, প্রকাশকাল ২০১৫, ঢাকা। গ্রন্থটি উলামায়ে কেরামসহ সব শ্রেণির পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এ সুবাদে বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (রাসূল সা.-এর স্ত্রী, সঙ্গিনী, ফকীহ)*—ড. রাশীদ হাইলামাযের আরেকটি অনবদ্য কীর্তি (*Hazreti Aişe (ra.) Mü'minlerin En Mümtaz Annesi*, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, তুরস্ক)। ২০১৪ সালে আমেরিকার নিউ জার্সির 'তুগরা বুকস পাবলিকেশন' গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে (*Aisha : The Wife, the Companion, the Scholar*)।

মূল গ্রন্থটি তার্কিশ ভাষায় লেখা। ভাষা না বুঝলেও সেটি দেখার তাওফীক হয়েছে। এদেশে শিক্ষকতায় নিযুক্ত একজন তূর্কী ভাই বইটির বিভিন্ন অংশ আমাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন। এতে আমার মনে হয়েছে, ইংরেজি সংস্করণে অনুবাদক মূল লেখকের বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গি অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন। বাংলা অনুবাদেও একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে পাঠক মূল লেখকের কুরআন ও হাদীসের উপর বিশেষ প্রজ্ঞা, শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি ইসলামের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। বাংলা ভাষায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন ও কর্মের উপর এটিই একমাত্র রচনা নয়। তবে রশীদ হাইলামাযের জীবনের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, সত্য উদঘাটনে পৌনঃপুনিক গবেষণা এবং তার সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি সারা বিশ্বের ইসলামী প্রকাশনায় বিরল। এ গবেষণালব্ধ গ্রন্থের শুরুতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্মবৃত্তান্ত কিংবা শেষে তার মৃত্যুর কথা আলাদা কোনো পরিচ্ছদে লেখা হয়নি। 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের সময় বয়স কত ছিল'—এ অধ্যায়ে তার জন্ম এবং মৃত্যু সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার যোগ্যতা, মর্যাদা এবং অবস্থান এত ব্যাপ্তিময় যে, তার আবির্ভাব না হলে শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানই অজানা থেকে যেত। রাসূলের সহধর্মিণী হিসেবে এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি গভীর জ্ঞান, অপূর্ব ধীশক্তি, ইবাদত-বন্দেগী এবং অনুপুঙ্খভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামের অনুসরণ তাকে গৌরবের আরও সুমহান উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। প্রতিটি নারী-পুরুষেরই তার জীবন সম্পর্কে জানা খুব প্রয়োজন। তাকে অনুসরণ এবং অনুকরণ করে জীবনকে একইভাবে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি নতুন করে দ্বীনের প্রতি উজ্জীবিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি আলেম নই। তবে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এদেশের অন্যতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফীক দিয়েছেন। এ উসিলায় অন্তরে সামান্য যে দ্বীনী অনুভূতি তৈরি হয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই এ দুরূহ কাজ করার চেষ্টা করেছি। প্রফেসর হযরতের বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সাহেব অনুগ্রহ করে এটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পরিপূর্ণভাবে জাযায়ে খায়ের দিন।

আমরা গ্রন্থটি সার্বিকভাবে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৫ নভেম্বর ২০১৫

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

আয়েশা রা.-এর নিষ্কলুষ চরিত্র

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর

পঞ্চম অধ্যায়

আয়েশা রা.-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। প্রথমজন নবুওয়তের আগে পনেরো বছর ধরে মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কাজে সম্রাজ্ঞীর মতো সহযোগিতা করেছেন, আর দ্বিতীয়জন মদীনার জীবনে এবং পরবর্তীতে একই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সময়োপযোগী সঙ্গী দান করেছিলেন; মক্কায় যেখানে ঈমান, আত্ম-ত্যাগ ও সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, তিনি তাকে দিয়েছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে; আর মদীনায় যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির প্রয়োজন ছিল, তিনি তাকে দান করেছিলেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে।

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন মক্কার একজন প্রভাবশালিনী নারী। সবচেয়ে কঠিন সময়ে যখন রাসূলের উপর নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল এবং দুঃসহ ভোগান্তির দিনগুলোতে যখন একের পর এক সমস্যা ও প্রতিকূলতা তাকে আক্রান্ত করেছিল, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস্য সহযোগিতা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান করা শুরু করলে তিনি সম্পদ ও মনোবল দিয়ে তাকে সার্বক্ষণিক সাহায্য করেছেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন প্রথম মুসলমান, সবচেয়ে কঠিন সময়ে তিনি রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলেন যা রাসূলের জন্য খুব প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অবস্থান ছিল ভিন্ন। মদীনায় হিজরতের পরপর ইসলামের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল বেশি। এসময় তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত সহযোগী, নিবেদিত প্রাণ। উজ্জ্বল মানসিকতা, জিজ্ঞাসু অন্তঃকরণ এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার জন্য রাসূলের পরিবারে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে অতুলনীয় মেধা দিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসু। তিনি যা শুনতেন, তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি সবকিছু কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতেন। তার চোখ-কান সব সময় ওহীর প্রতীক্ষায় থাকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেতুবন্ধন ছিলেন তিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ছিলেন ওহীর ধারক-বাহক। এ কারণে তার শিষ্যরাও নবুওয়াতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়নি। বিভিন্ন দিক থেকে আগত পথিকদের যেমন কোথাও সাক্ষাৎ ঘটে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে চার খলীফার বেলায়ও তিনি তা-ই ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সালিশ নিষ্পত্তিকারীর মতো। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো ভুল হলে, তিনি ছিলেন সম্মানিত সংশোধক। ইসলামের সহজ-সরল পথে তিনি ছিলেন সঠিক জ্ঞান দানকারিণী এবং ধৈর্যশীলা।

যখনই তিনি কোথাও যেতেন, সে জায়গা জীবন্ত হয়ে উঠত। আর যারা তার কাছে আসতেন, তারা ওহীর ঘ্রাণ পেতেন এবং আবেগাপ্লুত হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতেন। মনে হত, তারা এইমাত্র স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে ফিরছেন! সাধারণত এমন কোনো প্রশ্নকারী তার কাছে আসেনি যে উত্তর না নিয়ে ফিরে গেছে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে কুরআন দিয়ে আলোচনা শেষ করতেন এবং সমস্যা সমাধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের দলীল পেশ করতেন। জটিল কোনো বিষয় উপস্থাপিত হলে তিনি তার মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিপ্রেক্ষিতে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মত দিতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সকল ঈমানদারদের মা, উম্মুল মুমিনীন। পরিবার ও মহিলাদের গোপনীয় অনেক তথ্য ও মাসআলা তার মাধ্যমেই মুসলমানদের জানার সুযোগ হয়েছে। ধর্মীয় প্রয়োজনেই তিনি সেগুলো বর্ণনা করেছেন। তার আবির্ভাব না হলে এসব বিষয় মুসলমানদের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব হত না। নির্জন ঘরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনভাবে সব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন যেন তিনি ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানোর জন্য লাইফবয় (Lifebuoy, পানিতে ধরে ভেসে থাকার জন্য গোলাকার চাকা বা ভেলাবিশেষ) ছুঁড়ে মারছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সচেতন মানুষকে ইসলামের সহজ-সরল পথে আহবান করতেন। আমরা আশা করি, আপনার হাতে এই বইটি আপনাকে নেক আমলে উৎসাহিত করবে।

ড. রশীদ হাইলামায
এপ্রিল ২০০৯, ইস্তাম্বুল

প্রথম অধ্যায়

মক্কার জীবন এবং হিজরত
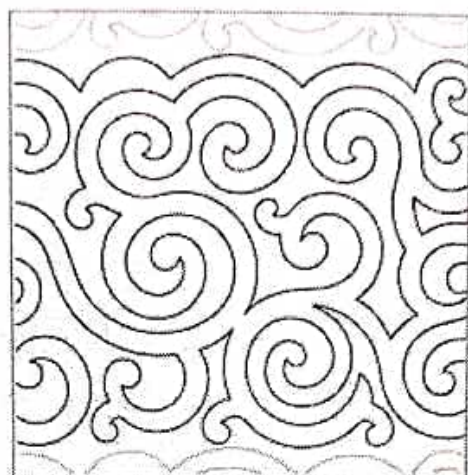
বিবাহার্থ বাগদান

একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। মুতঈম ইবনে আদী[1] ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তার ছেলে যুবায়েরের সাথে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মুতঈম ইবনে আদী বংশপরিক্রমা বিদ্যায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো পারদর্শী ছিলেন। এজন্যই তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে চেয়েছিলেন। তখন মক্কা খুব ছোট শহর ছিল। সবাই একে অন্যকে খুব ভালোভাবেই চিনত। এ কারণে মুতঈম ইবনে আদী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভবিষ্যৎ—বিশেষ করে তার স্বভাব-প্রকৃতি, আচরণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি এ রকমই একজন সম্ভাব্য বুদ্ধিমতী, সম্মানিতা এবং পবিত্র মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন। ঐ দিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবকে অস্বীকার করেননি। তখনকার সমাজে প্রস্তাব অস্বীকার না করলেই বাগদান হয়ে যেত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি তার কথাকে অলিখিত চুক্তি মনে করতেন, এ অনুরোধের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাক, দিন যতই গড়াতে লাগল, দুই পরিবারের মধ্যে ততই উদ্বেগ বাড়তে লাগল। ধর্মীয় দূরত্বের কারণে এ বিয়ের ব্যাপারে মুতঈম ইবনে আদীর পরিবারের আগ্রহ কমতে থাকে। তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়।

---

[1] মুতঈম ইবনে আদী বনু নাওফল গোত্রের নেতা ছিলেন। তায়েফ থেকে ফেরার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। একইভাবে তিনি তিন বছর ব্যাপী বয়কট সমাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বদরযুদ্ধে মক্কার কুরাইশরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'যদি মুতইম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন এবং এসব শিরকের দুর্গন্ধময় ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতেন, তা হলে আমি তাদের মুক্ত করে দিতাম।'

একসময় সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিল। ইসলামের পট পরিবর্তন হতে দেখে মুতঈম ইবনে আদীর পরিবার দ্বিধায় পড়ে যায়। যখন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হেরা গুহায় ওহী নাযিল হয়েছিল, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিলেন। শুরুর দিকে মুসলমানরা গোপনে দারুল আরকাম থেকে ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করে। তারপর একসময় এ প্রচারকার্য আর গোপন ছিল না। দাওয়াত এবং আমল প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। আর এ কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবী হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পরিবারের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। এ পরিস্থিতিতে একসময় যদিও আদীর পরিবার তাদের ছেলের পাত্রীর জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল, তারা এখন আবু বকরের পরিবারে যাওয়াই বন্ধ করে দিল। তারা দূর থেকে মুসলমান হওয়ার কারণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুঃখ-দুর্দশা দেখতে লাগল।

মক্কার স্মৃতি

জীবন থেমে থাকে না। এগিয়ে চলে। প্রতিদিন সকালেই নতুন নতুন মুসলমানের আগমনে মক্কায় নূর চমকাচ্ছিল। আর প্রতি রাতেই মুসলমানদের উপর অমানবিক অত্যাচারে মক্কার জীবনে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হচ্ছিল।

কষ্ট এবং আনন্দ একসাথে উপলব্ধি করেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যেন তিনি তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন। স্বভাবগত আগ্রহের কারণে প্রতিটি ঘটনা, ঘটনার গতিবিধি ফটোগ্রাফের মতোই তার অন্তরে গেঁথে যেত। তিনি জানতেন কোথায় কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে, কে কখন মুসলমান হয়েছে বা হচ্ছে। অনেক বছর পর, একদিন এক লোক ইরাক থেকে মদীনায় এসে মক্কার জীবনের কথা জানতে চাইল। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেই সময়ের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

মক্কায় অবস্থানকালীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন ছিল খুবই হৃদয়বিদারক, যা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তাদের জীবনের একমাত্র উজ্জ্বল দিক ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাদের বাড়িতে প্রতিদিন আসতেন এবং তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। এ ঘটনা স্মরণ হলেই আনন্দে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'জন্মের পর থেকেই আমি আমার পিতা-মাতাকে একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবেই দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন, হয় সকালে না হয় সন্ধ্যায়, আমাদের বাড়িতে আসতেন।'[২]

বিয়ের প্রস্তাব

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর কিছু দিন পার হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই তিন মেয়েকে নিয়ে বসবাস করছেন। উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তিনি খুব আদবের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি বিয়ে করতে চান?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন পঞ্চাশ। তার মেয়েদের মতো তিনিও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুতে বিমর্ষ। তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু কাকে?'

খাওলা প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে আরেকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বিধবা বিয়ে করতে চান, না কুমারী? খাওলার কথার ধরনেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি এমন একজন মহিলা যিনি দুধরনের পাত্রীরই সন্ধান দিতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টার ব্যাপারে জানতে চাইলেন।

খাওলা জবাব দিলেন, 'আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আয়েশা।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬/১৯৮; বাইহাকী, *সুনান*, ৬/২০৪।

সাল্লাম বিধবা পাত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। খাওলা বিধবা পাত্রী হিসেবে সাওদা বিনতে যাম'আর কথা বললেন। সাওদা ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান। মক্কার কঠিন দিনগুলোতে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তার স্বামী সাকরান ইবনে আমর দুঃখজনকভাবে ইন্তেকাল করেন। তারপর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। দুটো প্রস্তাবই সম্ভাবনার পর্যায়ে ছিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই জায়গায়ই খোঁজখবর নিতে বললেন।

প্রথম প্রস্তাব

খাওলার মন খুশিতে ভরে উঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট লাঘবে তিনি খুব আশাবাদী হয়ে উঠলেন। সাওদা বিনতে যাম'আ ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কা এবং বুদ্ধিমতী মহিলা। যদিও তিনি তখনো মৃত স্বামীর জন্য ব্যথাতুর ছিলেন, কিন্তু এ প্রস্তাবে তার সে বিয়োগব্যথা মুছে গেল। সাওদার পিতা বেঁচে ছিলেন। তিনি তার অনুমতি নিতে চাইলেন। এ দায়িত্বও খাওলার উপর পড়ল।

অবশেষে খাওলা সাওদার বৃদ্ধ পিতার কাছে গেলেন। তাকে আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। যখন বৃদ্ধ বাবা মুহাম্মাদের নাম শুনল, তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলে উঠলেন, 'এ তো খুব ভালো ও মানানসই সম্বন্ধ। তোমার বান্ধবী এ ব্যাপারে কী বলে?' খাওলা দ্রুত জবাব দিলেন, 'সাওদাও এ প্রস্তাব পছন্দ করেছে।'

পরবর্তীতে সাওদা দেখেছেন যে, তার কিছু আত্মীয়-স্বজন এ বিয়েতে অমত পোষণ করেছেন। তার আপন ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ[৩] এ খবর শুনে তার পিতার বিরোধিতা করেছেন। তার এক চাচাও এ বিয়ের পক্ষে ছিলেন না। সেই চাচা কবিতার ছন্দে বিয়ের বিরোধিতা করেছেন।

---

[৩] পরবর্তী কালে আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এ কাজের জন্য অনুতাপ করতেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

তারপর খাওলা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে গেলেন এবং তার স্ত্রী উম্মে রুমানের সাথে দেখা করলেন। তাকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আপনার মেয়ের সাথে তার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন।' এ কথা শুনে উম্মে রুমান খুশিতে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু এ আনন্দের মধ্যেই তার অতীতের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। এতে মনে ভয় দানা বেধে উঠল। অনেক আগে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এ মেয়ের ব্যাপারে মুতঈম ইবনে আদীকে ওয়াদা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এজন্য তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অপেক্ষা করতে বললেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাসায় এলে খাওলা তাকে একই সংবাদ দিলেন। তিনি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সাথে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী ছিলেন। তবে তার মনে একটি সন্দেহ ছিল। ইসলামের পূর্ব যুগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেওয়াকে বৈধ মনে করা হতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন যে, ইসলামে একজন আরেকজনের দ্বীনি ভাই। এ রকম ভাইদের সন্তানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো অসুবিধা নেই। এ কথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এত খুশি হলেন যে, তার চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হলো। কিন্তু তিনি অন্য সমস্যাটির কথাও ভুলে যাননি।

তিনি মুতঈম ইবনে আদীর বাড়িতে গেলেন। তার সাথে কৃত ওয়াদার সুরাহা করতে না পারলে কষ্টের সীমা থাকবে না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেমন আশা করেছিলেন, তা-ই হলো। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা অতীতের বাগদানের ব্যাপারে আর আগ্রহী ছিলেন না। খাওলা এবং উম্মে রুমান এ খবর পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খাওলাকে বললেন, 'এখন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আসতে পার।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ হয়ে গেল। এটা ছিল নবুওতের দশম বছর, শাওয়াল মাস। বিয়ের মোহরানা ছিল চার শত দিরহাম।[৪] ঐ দিন থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নতুন জীবন শুরু হলো। আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দার স্ত্রী হতে পেরে তিনি সকল যুবতী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন পরম খুশি। অন্যদিকে উম্মুল মুমিনীন[৫] হিসেবে তার উপর অল্প বয়সে বিশাল দায়িত্ব চেপে বসে। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার সান্নিধ্যে থেকে তিনি এলমের এমন উচ্চ মার্গে পৌঁছেছিলেন, যা অন্য কারও ভাগ্যে জোটেনি।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি যেভাবে ওহী নাযিল হওয়ার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতেন, এখন তাতে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করলেন। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি ক্ষণ ফটোগ্রাফের মতো অবিকল অন্তরে ধারণ করা শুরু করলেন।

উম্মে রুমানের প্রতি উপদেশ

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মা উম্মে রুমানের দায়িত্ব বেড়ে গেল। তার মেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী হতে যাচ্ছে। তিনি মেয়ের শিশুসুলভ আচরণের ব্যাপারে খুব সচেতন হয়ে উঠলেন। যখন তিনি কোনো আচরণ অপছন্দ করতেন, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে শাসন করতেন। কখনো একটু বেশি কড়াভাবে শাসন করতেন। একদিন এ রকম একটি ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এলেন। ঘরের ভাবগম্ভীর পরিবেশ দেখে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন। উম্মে রুমান এতে বিব্রত হলেন। কিন্তু মেয়ের সাথে যা হয়েছে, তিনি তার পুরো ঘটনাই রাসূলকে খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে রুমানের দিকে ফিরে বললেন, 'হে উম্মে রুমান! অনুগ্রহ করে আমার স্বার্থে আয়েশার সাথে উত্তম আচরণ করুন এবং তার চাওয়া-পাওয়ার দিকে লক্ষ রাখুন।'[৬]

---

[৪] নাসাঈ, *নিকাহ*, ৬৬ (৩৩৫০); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬/৪২৭ (২৭৪৪৮)।
[৫] কুরআন মাজীদে সূরা আহযাব (৩৩:৬)-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে 'ঈমানদারদের মা' বলা হয়েছে।
[৬] হাকীম, *মুসতাদারক*, ৪:৬ (৬৭১৬)।

পবিত্র হিজরত

বিয়ের পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পিতৃগৃহেই ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের অন্যান্য গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন। তিনি উন্মুক্ত মনের অধিকারী ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করতেন যারা ইসলাম কবুল করবে। এ কারণে তিনি তায়েফ গেলেন এবং খুবই দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর এমন কিছু ঘটল যাতে তিনি দুঃখ-বেদনা সব ভুলে গেলেন।

এ দুঃসময়ে তিনি মেরাজ প্রাপ্ত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা থেকে জেরুযালেমে আল-আকসা মসজিদে রাতের একটি ক্ষণে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন এবং একই রাতে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। যখন মক্কার কাফেররা এ মেরাজের ঘটনা শুনল, তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য এটাকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। কিন্তু এ ঘটনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিল; বিশ্বাসীদের আরও দৃঢ় ঈমানের দিকে উন্নীত করল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন। আবু বকরের পরিবারের সদস্যা হিসেবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে তিনি এসব ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

মক্কার কাফেররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেই চলছে। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের জন্য মক্কায় অবস্থানের সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। মূলত এ অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনার পথে তার সাহাবীদের হিজরত করার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এটা এত সহজ ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি নিজের বাড়ির মতোই ছিল। এমন দিন খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে যেদিন তিনি এ বাড়িতে আসেননি।

একদিন তিনি দুপুরে এ বাড়িতে এলেন। এটা ছিল একটি অনভিপ্রেত আগমন। সবাই এতে খুব অবাক হলো। বিষয়টি দ্রুত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানানো হলো।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন। তিনি জানতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে অন্যের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখেন। অন্যের বিশ্রামের সময় এসে কাউকে অসুবিধায় ফেলা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এ রকম অবস্থায় রাসূলের আগমনে তিনি ধরে নিলেন, নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাইলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। এখানে আমার পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের কেউ নেই।'

তিনি ঠিকই ছিলেন। নবুওয়াতের প্রথম বছর থেকেই আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দুজনকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। তারা গোপনীয় বিষয় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে। দুই বোন খুব কাছে থেকেই এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমাকে মক্কা ছেড়ে হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

এ কথার জন্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি জানতেন মক্কার এ নির্যাতন একদিন শেষ হবে। এজন্য খুব খুশি হলেন। কিন্তু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেতে পারবেন কি না, এ বিষয়ে খবু উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি একসাথে যাব?'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরের জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ফিরলেন। আর তখনই তার বরকতময় ঠোঁট থেকে বের হলো, 'হ্যাঁ, একসাথে।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে কেঁদে ফেললেন।[৭] ঐ সময় থেকে তার বাসায় হিজরত ছাড়া আর কোনো বিষয় আলোচিত হয়নি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং তাদের মা উম্মে রুমান রাযিয়াল্লাহু আনহা সফরের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা[৮] এবং বয়সে তার দশ বছরের ছোট বোন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই পবিত্র হিজরতের প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তারাই প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হিজরতের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনেছিলেন। তারা হিজরতের বিষয়গুলো খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর মধ্যে হিজরতের পথ-পরিক্রমা, গাইডের ব্যবস্থা, সওর পর্বত যেখানে তারা লুকিয়ে থাকবেন এবং সবকিছু শান্ত হওয়া অবধি সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন, আরও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন কে কখন তাদের সাথে দেখা করবেন, কার কী দায়িত্ব এবং তা পালনের পদ্ধতি—সবই তারা জানতেন।

যখন মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের খবর পেল, তারা এটাকে স্তব্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা শুরু করল। তারা মদীনার বিভিন্ন পথে গোয়েন্দা নিয়োগ করল, অনেক হিজরতকারী সাহাবীদের ফিরিয়ে আনল, অনেককে হিজরতে বাধা দিল, তাদের সব মালামাল ছিনিয়ে নিল এবং এমনকি অনেক মুসলমানকে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করল। তবে তারা মুসলমানদের আটকে রাখতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মক্কার কাফেররা সবাই মিলে পরামর্শ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল।

---

[৭] তাবারি, *তারীখ*, ১:৫৬৯, ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ৩:১১।

[৮] আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ২৭ বছর এবং তিনি যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী ছিলেন।

একদিন মক্কার মৃত্যু উপত্যকার বিবর্ণ রাস্তাগুলো দুজন পথিককে বিদায় জানাতে উদ্যত হলো। যখন সময় ঘনিয়ে এল, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারে গভীর দুঃখের ছায়া নেমে এল। অবশ্যই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে দ্বিগুণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনায় ক্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কষ্ট ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। রাসূলের একটু খবর জানার জন্য ঐদিন থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চারিদিকে কান পেতে থাকতেন। তার এ চরম উদ্বিগ্ন, অস্থিরতার কথা মক্কার মুশরিকদের বর্ণনায়ও ফুটে উঠেছে; তিনি যে কোনো জায়গা থেকেই খবর শোনার চেষ্টা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধরতে অথবা হত্যা করতে না পেরে মক্কার কাফের সর্দাররা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তারা মুহাম্মাদকে জীবিত অথবা মৃত হাজির করার জন্য একশ উটের পুরস্কার ঘোষণা করল। আর জানা কথা যে, মক্কার এসব কাফেরদের সর্দার ছিল আবু জেহেল। সে খুব রাগান্বিত হয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে এসে তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইল। বাড়ির লোকজনের এ বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। কিন্তু এটা আবু জেহেলকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। সে আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার গালে খুব জোরে চড় মারল। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।[৯]

গন্তব্য গোপন করে দুজন পথিক মক্কা ছেড়ে গেলেন। কিন্তু কাবা শরীফের চারিদিকে জমা হওয়া একদল লোক আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার দৃষ্টি কাড়ল। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কথা শোনার জন্য কাবা শরীফের কাছাকাছি গেলেন। একজন লোক বলছে, সে দুজন পথিককে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তার সাথে মদীনার পথে যেতে দেখেছে। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরে ফিরে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে এ সংবাদটি নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন দুজন খুব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। মক্কার কাফেরদের শত বাধার মুখেও তাদের পিতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে গিয়েছেন।

---

[৯] আবু নুআইম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া* ২:৫৬; ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ৩:১৪।

হিজরতের প্রথম বছর

তিন মাস পার হয়ে গেছে। এখনো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো খবর জানা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ একদিন আয়েশা ও আসমা তাদের ভাই আব্দুল্লাহকে আনন্দচিত্তে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেন। মুহূর্তকাল দেরি না করে তারাও আনন্দে দৌড়ে তার কাছে গেলেন। তাদের পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি চিঠিতে পুরো পরিবারকে মদীনায় যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন!

যায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবু রাফেঈ চিঠিটি নিয়ে এসেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের গাইড আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিতও তাদের সঙ্গী হয়েছেন। চিঠির শেষ দিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ছেলে আব্দুল্লাহকে তার মা ও বোনদের মদীনায় নিয়ে যেতে বলেছেন।[১০]

যায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবু রাফেঈর কাজ আগেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাদের পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের দুটি উট ও পাঁচ শত দিরহাম দিয়ে নিজের পরিবারকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সঙ্গে মদীনায় নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

খুব দ্রুতই প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। মক্কার কাফেরদের অগোচরেই দুটি পরিবারের সদস্যগণ একসাথে হিজরতের পথে রওনা হয়ে গেলেন। তারা

[১০] বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে পাঁচ দিরহাম ধার নেন। যখন তারা কাদিদ নামক স্থানে এসে পৌছেন, তখন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সফরের জন্য তিনটি উট ক্রয় করেন। দেখুন আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯:২২৭; যাহাবী, সিয়ার ২:১৫২।

যাচ্ছেন মদীনায়—সভ্যতার কেন্দ্রে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তাদের মনে একটিই ইচ্ছা, তারা আর কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না এবং এ সফরের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অতীতের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনায় ভরা ছিল তাদের এ সফর। তারা মক্কা থেকে মীনায় এসে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর দেখা পান। তিনিও হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন। ইসলামের শুরুতেই ঈমান আনয়নকারী এরকম একজন বিশ্বস্ত সাহাবীকে পেয়ে তাদের মনোবল আরও বেড়ে যায়। তাদের চোখে-মুখে এ আনন্দের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। পুরো দল গন্তব্যের দিকে পথ চলছিল। তারপর একসময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বহনকারী উট অজ্ঞাত কারণে খেপে যায়। উটটি দলের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি উম্মে রুমানকে খুব ভাবিয়ে তুলল। কারণ উটটি রাসূলের ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে বহন করছিল। উটটি তার ইচ্ছামতো যেদিকে ইচ্ছা চলতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল এখন আর কিছু করার নেই। উটটির প্রতি পদক্ষেপে আয়েশা আরও দূরে সরে যাচ্ছিলেন। উম্মে রুমান অস্থিরচিত্তে বলে উঠলেন, 'উটের লাগাম ছেড়ে দাও।'

তিনি আশা করেছিলেন কোনো কিছু করার চেয়ে তার উপদেশই কাজে লাগবে। তার মনে হলো, লাগামটি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোনো গাছের শাখায় আটকে যাবে এবং উটটিকে আরও দূরে যাওয়া থেকে থামিয়ে দেবে।[১১] উম্মে রুমান যা ভেবেছিলেন, একদম তা-ই হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার মায়ের উপদেশ অনুযায়ী উটের লাগামটি ফেলে দিলেন। তারপর সেটি একটি গাছের সাথে আটকে গেল। ফলে উটটি আর বেশি দূর যেতে পারেনি। অবাধ্য উটটি ইচ্ছামতো ছুটোছুটি করা থেকে বিরত হলো।

দলের অন্যান্য সদস্যগণ ছুটে গিয়ে উটটিকে বশে আনল। সবকিছু আগের মতো ঠিকঠাক হয়ে গেল। তাদের সফর আবার নতুন করে শুরু হলো।

---

[১১] তাবরানি, *আল মুযামু'ল কাবির*, ২৩:১৮৩ (২৯৬)।

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য এ সফর ছিল খুব কষ্টের। সে কষ্ট ছিল ব্যতিক্রম। তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তার প্রসববেদনা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। কুবায় পৌছার পর তার আর এ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। যদিও কাফেলা গন্তব্যের খুব কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল, তবু তারা সেখানে থামলেন। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা একটি ফুটফুটে ছেলেসন্তান প্রসব করলেন। পরবর্তীতে এই সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া ছেলেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কছে নিয়ে আসা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোলে নিয়ে নাম রেখে দিলেন আব্দুল্লাহ।[১২]

মদীনার সংক্রামক ব্যাধি

তারা যখন মদীনায় পৌছলেন, ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় মসজিদ নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন।

মক্কার সমস্যা আপাতত মনে হয়েছিল শেষ হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে তাদের এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো যাতে তাদের সুখের উপর দুঃখের ছায়া নেমে এলো। মুহাজিরগণ মদীনার পরিবেশে অভ্যস্ত ছিলেন না। তারা অপরিচিত এক রোগে আক্রান্ত হলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন। তিনি প্রচণ্ড জ্বরে কাবু হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। সম্ভবত কারও বরকতী হাতের ছোঁয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন যাতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তারা মূলত মদীনার সংক্রামক এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এটা এখানে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। অসুস্থতার জন্য অনেকের দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। এ কারণে তারা বসে নামায পড়তে বাধ্য হন যা তারা কখনো করতে রাজি ছিলেন না। তাদের দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা জেনে রাখ, বসে বসে নামায আদায়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে।[১৩]

---

[১২] বুখারী, *মানাকিবুল আনসার*, ৪৫ (৩৯০৯, ৩৯১০); মুসলিম, *আদাব*, ২৫-২৬ (২১৪৬); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৫৪, ২০৬।

[১৩] তিরমিযি, *সালাত*, ২৪৭; ইবনে মাযাহ, *সালাত*, ১৪১, আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ২:১৯২, ২০৩, ২১৪; ইবনে কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৩:২২৪।

এ কথা শুনে সাহাবীরা সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি পেয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পিতাকে দেখতে এলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো অনেক অসুস্থ। বিলাল ইবনে রাবাহ হাবশী এবং আমির ইবনে ফুহাইরা আবু বকরের সাথে একই ঘরে থাকতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পিতার কাছে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল। তার কাছে মনে হয়েছে, তিনি তার পিতাকে দেখছেন না, অন্য কাউকে দেখছেন! কর্মঠ মানুষটি জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। তিনি কাছে গিয়ে বললেন, 'আব্বাজান, এখন কেমন আছেন? কী রকম অনুভব করছেন?'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার কাছে মনে হলো একটি নূর উদ্ভাসিত হয়েছে। সেটা তার মেয়ের কাছ থেকে ভেসে আসছে। তথাপি তার আত্মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ প্রশ্ন থেকে ছিল অনেক দূরে। তিনি সচেতন দৃষ্টিতে তার মেয়ের দিকে তাকালেন যে কিনা কয়েক মাস ধরে দূরে ছিল। তারপর বললেন, 'প্রতিটি ব্যক্তি তার পরিজনের মধ্যে সকালে শয্যা ত্যাগ করে; আর মৃত্যু তো জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মারত্মকভাবে আহত হলেন। হ্যাঁ, মৃত্যু সবার জন্যই নিকটে। কিন্তু অসুস্থ মানুষের জন্য জীবন তো এখনো বাকি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থতার বিষয় দিয়ে প্রথমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উপদেশ দিতে চেয়েছেন, তারপর সবাইকে। তিনি চিন্তা করলেন, 'নিশ্চয়ই তার পিতা জানেন না তিনি কী বলছেন।'

বিলাল ইবনে রাবাহ হাবশী এবং আমির ইবনে ফুহাইরা—তারাও প্রায় অচেতন অবস্থায় ছিলেন। গৃহকাতরতা তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছে। নতুন জায়গায় নতুন বাড়ি এ অসুস্থতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যথিত মনে বিদায় নিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি অসুস্থতার প্রকোপ আসলে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তিনি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে যা দেখেছেন এবং শুনেছেন, তা বললেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'তারা মারাত্মক জ্বরে ভুগছেন এবং নিজেরা একে অন্যের সাথে অচেতনভাবে কথা বলছেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুব কষ্ট পেলেন। তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ করলেন। তাদের বিরুদ্ধে দুআ করলেন যারা মুসলমানদের জন্য এ বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, 'ইয়া আল্লাহ, আমি উতবাহ ইবনে রাবিয়াহ, শাইবা ইবনে রাবিয়াহ এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে তোমার হাতে ন্যস্ত করছি; তারা আমাদের নিজেদের শহর থেকে বিতাড়িত করেছে এবং এমন জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে যেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি তাদের সমুচিত শাস্তি দাও।'

তারপর তিনি ফিরে মুসলমানদের জন্য দুআ করলেন,

> ইয়া আল্লাহ, মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন মক্কার মতো বা তার চেয়েও বেশি। এ শহরকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দিন এবং প্রাচুর্যে ভরে দিন। এ মদীনার মহামারিকে আপনি সরিয়ে জুহফার দিকে নিয়ে যান।[১৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে রাতে একটি স্বপ্ন দেখলেন : জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গী নারী—যার মাথার চুল উশকোখুশকো—মদীনা থেকে বের হয়ে জুহফায় অবস্থান নিয়েছে। এ স্বপ্ন তার দুআ কবুল হওয়ার আলামত। এরপর থেকে মুহাজিরগণ আর এ রকম জ্বরে আক্রান্ত হননি অথবা মদীনার আবহওয়ার প্রতিকূলতার জন্য অন্য কোনো রোগেও ভোগেননি।[১৫]

---

[১৪] বুখারী, সহীহ, *ফাযায়েলে মদীনা*, ১১; *ফাযায়েলুস সাহাবাহ*, ৭৫, *মার্দা*, ৮।
[১৫] প্রাগুক্ত।
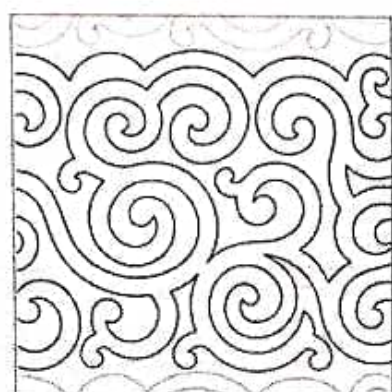
দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখ-শান্তির বাড়ি

বিয়ে

পরিবারের সাথে হিজরত করে মদীনায় আসার পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বাভাবিকভাবেই পিতৃগৃহে ছিলেন। তাদের পড়শি ছিলেন বনু হারিস ইবনে খারায। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেহমান হিসেবে আবু আইয়ূব আল-আনসারীর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

মদীনায় এসেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সফর এবং মদীনার ভিন্ন পরিবেশ তার জন্য ছিল কঠিন। তার শরীরের ওজন কমে গেল এবং মাথার চুলও পড়ে যাচ্ছিল। উম্মে রুমান মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি তার মেয়েকে দেখতে গেলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতার জন্য দুআ করলেন।

প্রায় এক মাস অসুস্থতার পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কিছুটা ভালো বোধ করা শুরু করলেন। মায়ের বিশেষ যত্নে তার শরীরের ওজনও কিছুটা বাড়ল।

এ সময়ে মসজিদে নববী নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই মদীনায় যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে, ইতিমধ্যে তা প্রতিভাত হওয়া শুরু হয়েছে।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন : 'আয়েশা আপনার স্ত্রী। তাকে ঘরে তুলুন।'

এদিকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের কাছে এসে একই প্রশ্ন করলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন : 'সাদাক!'

সাদাক হচ্ছে মহরের টাকা যা বিয়ের সময় স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কোনো জাগতিক মূল্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুলনা করার অবকাশ ছিল না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রয়োজনীয় টাকা ধার দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা দেরি না করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে পাঠিয়ে দেন। জাহেলি যুগে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। মহরের টাকা মেয়ের বাবাই আত্মসাৎ করত এবং মেয়েকে সেটা দিত না। যতই দিন গড়াতে থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের এসব দুর্নীতি দূর করতে থাকেন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৬]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য আরও কিছু কাজ বাকি ছিল। তিনি নিজের টাকা দিয়ে মসজিদের পাশে এক কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। তারপর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য একটি ছোট ঘর তৈরির কাজ শেষ হয়। ঘরটি এত ছোট ছিল যে, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালে তার মাথা প্রায় ছাদের সাথে লেগে যেত। আর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেখানে বিশ্রামের জন্য ঘুমালে নামায পড়ার আর কোনো জায়গা খালি থাকত না। বাস্তবিক ঘরটি ছিল ছোট এবং জৌলুসহীন, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এটা সারা বিশ্বকে আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আর এভাবে এ ঘর তৈরি শেষ হলে খালিদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসায়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান হিসেবে থাকার সময় শেষ হয়, যেখানে তিনি গত সাত মাস ধরে অবস্থান করছিলেন।

হিজরতের পর আট মাস পার হয়ে গেছে। স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য শাওয়াল মাসকে নির্বাচন করা হলো। এ নির্বাচনের একটি কারণও ছিল।

---

[১৬] তাবরানি, *আল মুযামু'ল কাবির*, ২৩:২৫ (৬০)।

ইসলামের পূর্ব যুগে এ মাসে বিয়ে হতো না। তারা এটাকে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করত। অনেক বছর পর, সমাজের এ কুসংস্কার নিরসনের জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শাওয়াল মাসে বিয়ে করাকে উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন, 'রাসূলের সাথে আমার বিয়ে এবং স্বামীগৃহে গমন - দুটোই হয়েছিল শাওয়াল মাসে। আর স্বামীর নিকট আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী আর কে ছিল?'[১৭]

সময় হয়ে এল। উম্মে রুমান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে অনেক আনসার মহিলারা এসে ভিড় করেছিল। তারা এত দ্রুত হেঁটে গেলেন যে, সেখানে পৌঁছে তারা হাঁপাতে লাগলেন। দুনিয়ার সবচেয়ে গৌরবান্বিতা পাত্রীকে দেখে মহিলারা বলে উঠল, 'তোমার আগমন শুভ ও কল্যাণময় হউক।'[১৮]

তখন দুপুর হতে ঘণ্টা-তিনেক বাকি। আসমা বিনতে ইয়াযিদসহ তার অন্যান্য বান্ধবীদের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নতুন ঘরে প্রথম পা রাখেন, যে ঘর পরবর্তীতে 'নবীর মাদরাসা' হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সবকিছুই ছিল অন্যরকম। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একটু আগেও ছিলেন খুব ভীত এবং বিচলিত। তার অন্তর এখন শান্ত হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি পেয়ালায় দুধ পান করতে দিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লজ্জা পেলেন। তিনি মাথা নিচু করে ফেলেন। রাসূলের দিকে তাকাতে পারছেন না। তখন তার বান্ধবীরা বলল, 'রাসূলের কাছ থেকে দুধের বাটি গ্রহণ কর। তার দান ফিরিয়ে দিও না।'

এ কথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার হাত থেকে দুধের বাটিটি নিলেন এবং পান করা শুরু করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথীদেরও কিছু অংশ পান করতে দিতে বললেন। তারা তা পান করতে রাজি হলো না। তারা বলল, 'আমাদের পান করার ইচ্ছা নেই।'

---

[১৭] মুসলিম, *সহীহ*, নিকাহ, ৭৩ (১৪২৩)।
[১৮] বুখারী, *সহীহ*, ফাযায়েলু'স সাহাবাহ, ৭৩ (১৪২৩)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তা পান করতে বলে বললেন, 'ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র হতে পারে না।' এ কথা শুনে আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন কেউ বলে যে, আমি সেটা চাই না অথচ মনে মনে সেটা সে চায়, এটা কি মিথ্যা?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ। মিথ্যা লেখা হয়। এমনকি ছোট ছোট মিথ্যাও লেখা হয়।'[১৯]

কোনো আড়ম্বর ছাড়াই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনামতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন কোনো উট বা দুম্বা জবাই করেননি। বরং খাযরায গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে উবাদাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়িতে কিছু খাবার নিয়ে এসেছিলেন। সেটাই বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিবশেন করা হয়।'

তখন থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে এসে মানুষের কল্যাণের জন্য একাকী চিন্তা-ভাবনা করতেন, তখন তিনি পাশে থাকতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার সমকালীন এক মহীয়সী নারী ছিলেন যিনি মুসলমানদের উন্নতিতে সাহায্য করেছেন, বিচক্ষণতার সাথে প্রতিটি ঘটনা দেখেছেন ও বুঝেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে যা সংঘটিত হয়েছে বা যা তিনি শুনেছেন, পরবর্তীতে চমৎকার বর্ণনাশৈলীতে তা বর্ণনাও করেছেন। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালু নবী সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের উৎস ছিলেন। তাকে এ রকম একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নারী এত গভীরভাবে পদে পদে অনুসরণ করত যা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে পারিবারিক জীবন এবং মহিলাদের বিভিন্ন গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি বর্ণনা না করলে মুসলমানরা হয়ত কখনই সেগুলো জানার সুযোগ পেত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য পথ প্রদর্শক এবং তাকেই সবার অনুসরণ করা উচিত।

---

[১৯] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৪৩৮ (২৭৫১১)।

আবু বকর রা.-এর আচরণ

কুরআন মাজীদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ

> হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। (সূরা আহযাব, ৩৩:৩২)

এ আয়াতে তাদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি আয়াতের নির্দেশ পালনে ত্রুটি হয়, তাহলে ঝুঁকিও অনেক। অবিরাম কষ্ট-সাধনার মাধ্যমেই বড় পুরস্কারের আশা করা যায়, সেখানে সামান্য ত্রুটিও বিপদের কারণ হয়। বস্তুত রাসূলের স্ত্রীদের এ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে যেন তারা পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে জান্নাতের পথে পাড়ি জমাতে পারেন।

যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতা, তবু তিনি তাকে মা বলে ডাকতেন এবং নিজের মা থেকেও তাকে বেশি সম্মান করতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নামে যখন অপবাদ ছড়ায়, তখন আবু বকর খবর পেলেন মিসতাহ ইবনে উসাসাও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে অনেক মন্দ কথা বলেছে। এতে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। মিসতাহকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে যে অর্থ সাহায্য করতেন, তিনি তা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিছু দিন পর কুরআন মাজীদের এই আয়াত নাযিল হলো,

وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَ
الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا
تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

> তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা আন-নূর, ২৪:২২)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু বকর তার আচরণ পরিবর্তন করেন এবং অনুশোচনা করে বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর ক্ষমা আশা করি।' তারপর তিনি মিসতাহকে আবার দান করা শুরু করেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এখনই তাকে আবার দান করা শুরু করছি।'[২০]

আয়েশা রা.-এর ঘরের বাস্তব অবস্থা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কোনো বড় রুমে বাস করতেন না। তার ঘরটি ছিল খুবই ছোট। কোনোমতে তার প্রয়োজন মিটত। এ ঘরটি ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে এবং এর দরজা ছিল পশ্চিম দিকে - মসজিদের ভেতরে। মসজিদ ছিল তার ঘরের আঙ্গিনার মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে ইবাদতে মশগুল থাকতেন, বিশেষ করে রমযান মাসে, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরে থেকেই রাসূলের চুল আঁচড়ে দিতে পারতেন অথবা খুব তাড়াতাড়ি কোনো খেদমত আঞ্জাম দিতে পারতেন।[২১] তার ঘরের দেয়াল ছিল মাটির এবং তা উচ্চতায় মাত্র ছয়- সাত হাত ছিল। আর ঘরের ছাদ যে কারও হাতের নাগালের মধ্যে ছিল। ছাদটি ছিল খেজুর পাতা এবং ডালের। বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য তার উপর কম্বল দেওয়া ছিল। এ ঘরের দরজাটি ছিল কাঠের।[২২]

---

[২০] বুখারী, *সহীহ*, শাহাদাত, ১৫ (২৫১৮), ঈমান, ১৭।
[২১] বুখারী, *সহীহ*, ই'তেকাফ, ৪ (১৯২৬)।
[২২] বুখারী, *সহীহ*, আদব আল-মুফরাদ, ১:২৭২ (৭৭৬)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন, সেজদার সময় তার হাতের সাথে আমার পা লেগে যেত, আমি তখন পা গুটিয়ে নিতাম। পা গুটিয়ে নেওয়ার পরই কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা করতে পারতেন।'[২৩]

রাসূলের অন্য স্ত্রীদের ঘরও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘর থেকে আলাদা কিছু ছিল না। একটিই পার্থক্য ছিল। তাদের ঘরের দরজা বাইরের দিকে খোলা ছিল, মসজিদের ভেতরে ছিল না। তাদের ঘরের সাদাসিধে কাঠামোর বর্ণনা দিতে গিয়ে হাসান বাসারী বলেন, 'আমি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ঘর দেখতে গেলাম। আমি আমার হাত একটু উপরের দিকে উঠিয়েই ঘরের ছাদ স্পর্শ করতে পারতাম।'[২৪]

যখন মসজিদে নববীর পরিসর আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘর নতুন করে তৈরি করার ব্যাপারে আলোচনা হয়। প্রখ্যাত ইমাম সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিককে বলেন, 'আমার ইচ্ছা, আপনি এ ঘর ধ্বংস করবেন না। মানুষ এটা দেখে শিক্ষা নিতে পারবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে, কী ধরনের জীবন-যাপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন, অথচ তার কাছে পার্থিব সব সম্পদের চাবি ছিল।'[২৫]

ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি খাট, একটি চাটাই, একটি বিছানা, একটি বালিশ, খোরমা-খেজুর রাখার দুটি মটকা, পানির একটি পাত্র এবং পান করার একটি পেয়ালা। ছোট ঘরটিতে বাতি জ্বালানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আয়েশা একবার বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়, আমরা একাধারে চল্লিশ রাত কোনো আলো বা বাতি ছাড়াই পার করে দিতাম।'[২৬]

---

[২৩] বুখারী, *সহীহ*, সালাত, ২১ (৩৭৫)।
[২৪] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ১:৫০৬।
[২৫] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ১:৫০০।
[২৬] তায়ালিসি, *মুসনাদ*, ২০৭ (১৪৭২)।

তখনকার দিনে বাতি জ্বালানো এবং রান্নার জন্য জন্য একই তেল ব্যবহৃত হত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'যদি আমাদের বাতি জ্বালানোর তেল থাকত, তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা রান্নার জন্য ব্যবহার করতে পারতাম।'[২৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে গেলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন বিষণ্নবোধ করতেন, তখন ঘরেই থাকতেন। মহিলাদের জন্য ঘরের মধ্যে থাকাই সঙ্গতিপূর্ণ। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেই বলতেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকতে কখনো তিন দিন এমন যায়নি যখন নবী পরিবারের লোকেরা পেট ভরে খেয়েছেন।'[২৮] বেশিরভাগ তারা না খেয়ে থাকতেন; মাসের পর মাস ঘরে আগুন জ্বলত না। কোনো খাবার-দাবার রান্না হত না।[২৯] কখনো কখনো তিনবার নতুন চাঁদ উঠে যেত এবং এসময়ে তারা শুধু খেজুর আর পনি খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।[৩০]

তারা একসাথে দস্তরখানায় বসে একই পাত্র থেকে খাবার খেতেন। মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন এ খাবারে অংশগ্রহণ করতেন। বাস্তবে কোনো কিছুই এ ঘরের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত করেনি; পরবর্তীতে গনীমতের মাল বা সাহাবীদের বড় রকমের কোনো হাদিয়া - কোনোকিছুই তার এ সাধারণ জীবন-যাপনে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেনি। যখন তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের পর্দা অতিক্রম করেন, তখনো এ রকম পবিত্র এবং বিনয়ী ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, সেদিন সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন ওফাত পান, সেদিন আমার ঘরে অল্প যব ব্যতীত খাওয়ার উপযোগী আর কোনো বস্তুই ছিল না। সেটা আমি ঘরের তাকের উপর রেখেছিলাম এবং সেখান থেকে প্রতিদিন কিছু পরিমাণ

---

[২৭] হারিস ইবনে আবি উসামা, *মুসনাদ'ল হাদীস*, ২:৯৯৬।
[২৮] বুখারী, *সহীহ*, আতঈমা, ৭৩ (৫০৫৯)।
[২৯] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২১৭।
[৩০] বুখারী, রিকাক, ১৭ (৬০৯৪)।

খেতাম। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। তারপর একদিন সেগুলোর সমষ্টি মেপে রাখলাম। অতঃপর তা সাধারণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল।[৩১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন যেমন কঠিন ছিল, বিধবা হিসেবে তার পরবর্তী পঞ্চাশ বছর এ থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি যা কিছু পেতেন সবই দান করে দিতেন। আর নিজে খেজুর এবং পানির উপর সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি বলেন, 'রাসূলের ইন্তেকালের পরেও আমি কখনো পেট ভরে খাবার খাইনি।'[৩২]

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন দেখেছেন এবং তার কাছ যা শুনেছেন তার উপরই আমল করার চেষ্টা করতেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আয়েশা! জাহান্নাম থেকে বাঁচ; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়। এটা একজনের ক্ষুধাকে যেমন নিবারণ করবে, তেমনি তার প্রয়োজনও পূরণ করবে।'[৩৩]

একজন গরিব এবং অসহায় ব্যক্তি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তার কাছে যা ছিল, সবই দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি পরিচিত ব্যক্তিদেরকে ঐ লোককে ডেকে নিয়ে আসতে বললেন যাকে তিনি একটু আগে সাহায্য করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দৃশ্য দেখে তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন, 'দান কর এবং তা হিসেব করো না; তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কোনো হিসেব নেওয়া হবে না।'[৩৪]

আরেকদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে গরিবদের সাথে থাকতে দিন। আমাকে

---

[৩১] বুখারী, খুমস, ৩ (২৯৩০)।
[৩২] আবু নুআইম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ২:৪৬; তাহমায, *আস-সাইয়্যিদাতু*, ৩৮।
[৩৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৭৯ (২৪৫৪৫)।
[৩৪] ইবনে হিব্বান, *সহীহ*, ৮:১৫১; বাইহাকি, *সুনান*, ২:৩৮ (৩৪৩৬)।

গরিব হিসেবেই মৃত্যু দিন এবং কিয়ামতের দিন গরিব হিসেবেই হাশর করুন।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন,

> কারণ গরিবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! গরিব এবং অসহায়দের ভালোবাস, তাদেরকে নিজের কাছে রাখ, তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।[৩৫]

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হাতে একটি রুপার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী, আয়েশা?'
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, 'আমাকে দেখতে আপনার ভালো লাগবে মনে করে আমি এগুলো পরেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলোর জন্য তুমি কি যাকাত দিয়েছ?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতেন সামান্য এ জিনিসের জন্য যাকাত ফরয ছিল না। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। রাসূলের পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের সঙ্গে অন্যদের তুলনা চলে না। তিনি এটা বুঝলেন। গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়ে না সূচক জবাব দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন তার নিকটস্থ সবাই একই রকম অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করুক। এজন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবাব পেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এই সামান্য ঘটনাই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট ছিল।'[৩৬]

---

[৩৫] তিরমিযি, যুহদ, ৩৭ (২৩৫২); বাইহাকি, *সুনান*, ৭:১২ (১২৯৩১)।
[৩৬] আবু দাউদ, যাকাত, ৩ (১৫৬৫); বাইহাকি, *সুনান*, ৪।

রাসূলের এ কথা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনে গভীরভাবে আঘাত করল। তার চেতনাকে যেন বিলুপ্ত করে ফেলল। এরপর তিনি আর কখনো কোনো জিনিস, সেটা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, নিজের কাছে রাখতেন না। দান করে দিতেন। তিনি জানতেন, দুনিয়া এবং আখেরাতে তার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য। এমন বিচক্ষণ নারীর জন্য এ সম্পদ হাতছাড়া করার কথা চিন্তা করা যায় না।

আরেকদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মৃত্যুর পর একটি কাজ করতে বললেন,

> তুমি যদি আমার সাথে আবার মিলিত হতে চাও, তাহলে পৃথিবীতে মুসাফিরের মতো জীবন-যাপন করবে। ধনীদের থেকে দূরে থাকবে। পরিধেয় কাপড় পরার অযোগ্য না হলে নতুন কাপড় কেনার কথা চিন্তাও করবে না।[৩৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেন। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাকে এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, দুনিয়ায় তার কর্তব্য না ভুলে তিনি যেন অনবরত আখেরাতে পুরস্কারের আশা করেন। (২৮:৭৭)। মানুষের চাহিদার শেষ নেই। দুনিয়ার প্রাপ্তিতে মানুষকে অতৃপ্ত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতের সম্বল অর্জন করা। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, যারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার পেছনে ছোটে, তার সব আমলই বিনষ্ট করে দেওয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তার স্ত্রীদের বেলায়ও চাইতেন তারাও একই বোধে উন্নীত হয়ে জীবন-যাপন করবে। তিনি বলেন,

> আদম সন্তানদের মালিকানায় যদি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকা হয়, তাহলে সে তৃতীয়টির লোভ করবে। কেবল মাটিই তার লোভের মুখ ভরতে পারে। মনে রেখ, ধন-সম্পদ তো নামায

---

[৩৭] তিরমিযি, লিবাস, ৩৮ (১৭৮০); হাকিম, *মুসতাদারক*, ১:৫৪৭ (১৪৩৭)।

> কায়েম এবং যাকাত দানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহও তার দিকে ফেরেন।[৩৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ কখনো এ দারিদ্রকে সমস্যা মনে করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি যখন তাদের ঘরে যেতেন, বলতেন, 'ঘরে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি?' যখন তিনি শুনতেন যে, কিছু নেই, তখন তিনি বলতেন, 'আমি রোযা রাখলাম।' এ কথা বলে নিজেকে ইবাদতে মশগুল রাখতেন।[৩৯]

আনসার সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে খাদ্য-সামগ্রী পাঠিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতেন।[৪০] কিন্তু তিনি তো কঠিন জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন। সাহাবীরা যা করতেন, এটা ছিল তাদের অনুগ্রহ যার জন্য তারা অবশ্যই পুরস্কার পাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন; তিনি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্যতম অনুগ্রহও গ্রহণ করতে চাইতেন না। সাদাসিধে একটি চটের বিছানায় ঘুমাতেন। একজন আনসার মহিলা সাহাবী বিষয়টি জেনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে একটি উলের মেট্রেস হাদিয়া দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে এটা দেখেই প্রশ্ন করেন :
'এটা কী, হে আয়েশা?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন :
'হে আল্লাহর রাসূল! আনসারদের এক মহিলা ঘরে এসে আপনার বিছানা দেখে ফিরে গিয়ে এটা পাঠিয়েছে।'

যদিও মদীনার এই মহিলা সাহাবীর হাদিয়াটা ছিল খুব সুন্দর, কিন্তু সাদাসিধে বিছানার প্রতি তার আগ্রহ ছিল আরও বেশি। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ফিরে বললেন : 'এটা ফেরত পাঠিয়ে দাও।

---

[৩৮] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৫৫, ৫:২১৮ (২৪৩২১, ২১৯৫৬)।
[৩৯] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৪৯ (২৪২৬৬); ইবনে হিব্বান, *সহীহ*, ৮, ৩৯৩ (৩৬৩০)।
[৪০] বুখারী, হিবা, ১ (২৪২৮); ইবনে মাযাহ, যুহদ, ১০ (৪১৪৫)।

আল্লাহর শপথ! আমি যদি চাইতাম তাহলে আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে আমার অধীন করে দিতেন এবং সেটাকে স্বর্ণ-রুপায় পরিণত করে দিতেন।'[৪১]

যদিও রেশমি কাপড় এবং স্বর্ণ মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ ছিল, তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন তার নিকটতম মহিলারা এ ব্যাপারে আরও সতর্কতা অবলম্বন করবে। এমনকি তাদের দৈনন্দিন উপহার-উপঢৌকন থেকেও দূরে থাকতে বলতেন। একদিন তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হাতে দু'টি স্বর্ণের ব্রেসলেট দেখে বললেন : 'তুমি কি চাও, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা বলি? তুমি যদি এগুলো ফেলে দুটি রুপার ব্রেসলেট কিনে তাতে সেফরন রঙ করে নাও, তাহলে এর চেয়ে ভালো হবে।'[৪২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বরং এর ফলে চারিদিকের পরিবর্তনও খেয়াল করতেন। নিশ্চিতভাবেই যে অনাড়ম্বর জীবন তিনি কাটাতে চাইতেন, তার নিকটতম সঙ্গীরাও তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠুক, এটাও আশা করতেন। তিনি তাদের দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রাখতে চাইতেন যেন তারা এগুলোর কারণে আখেরাতকে ভুলে না যায়। নবম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধ ছিল তখনকার সুপার পাওয়ার বাইজেন্টাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে। এ সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছবিসহ এক টুকরা কাপড় ক্রয় করেন এবং সেটা দরজার পর্দা হিসেবে ঝুলিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এটা দেখেই বলে ওঠেন, 'এটা খুলে ফেল। এর পরিবর্তে অন্য পর্দা লাগাও। কারণ আমি ঘরে ঢোকার সময় এটা দেখলে দুনিয়ার কথা মনে পড়ে।'[৪৩]

খাইবারের লড়াইয়ের পরে স্ত্রীদের জন্য বার্ষিক আশি ওয়াসক[৪৪] খেজুর এবং বিশ ওয়াসক যবের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

---

[৪১] বাইহাকী, *শুহুবুল ঈমান*, ২:১৭৩ (১৪৬৮)।
[৪২] নাসাঈ, যিনা, ৩৯ (৫১২৪৩)।
[৪৩] ইবনে হিব্বান, *সহীহ*, ২:৪৪৭ (৬৭২); নাসাঈ, *সুনানুল কুবরা*, ৫:৫০২ (৯৭৮১)।
[৪৪] এক ওয়াসক সমান ১৬৫ লিটার।

আনহার দান-সদকা এবং বিরাট সংখ্যক মেহমানদের জন্য এটা যথেষ্ট ছিল না।

যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুউচ্চ মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হন, সেদিন এক বাটি যব ছাড়া ঘরে আর কিছুই ছিল না। সেটাও এক ইহুদীর কাছ থেকে রাসূলের তরবারি বন্ধক রেখে ক্রয় করা হয়েছিল।[৪৫]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে খুবই অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। তার এ সাধারণ জীবন এটাই প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব সংসারে সুখ-শান্তির কোনো নিয়ামক নয় এবং রাসূলের মৃত্যুর পরও এ ধারা অব্যাহত ছিল। ঝরনার পানি যেমন বিভিন্ন নদীতে প্রবাহিত হতেই থাকে, তেমনি তার এ ছোট ঘর যুগ যুগ ধরে মুসলিম জাতিকে উপকৃত করছে। রাসূলের জীবদ্দশার মতোই পরবর্তীতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রধান কাজ ছিল মানুষের হৃদয় এবং অন্তরের খোরাক জোগানো।

---

[৪৫] বুখারী, জিহাদ, ৮৮ (২৭৫৯)।

কঠোর সাধনা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার রাতগুলো সূর্যালোকিত দিনের মতোই উজ্জ্বল ছিল। তিনি রাতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন আর দিনে রোযা রাখতেন। তার অবস্থান ছিল পরিষ্কার, তিনি গভীরভাবে কৃচ্ছ্রতাসাধন এবং ধর্মানুরাগ পর্যবেক্ষণ করতেন। তার একজন প্রিয় ছাত্র (তাবেঈ), যিনি পরবর্তীতে মুসলিম জাতির নেতা হয়েছিলেন, বলেন যে, কেবল ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন ছাড়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সারা বছরই রোযা রাখতেন।[৪৬] আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রতিদিন তওবা-ইস্তেগফার করতেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করতেন, আগের দিনের কাজ-কর্মের জন্য অনুশোচনা করতেন। রাসূলের মতোই তার জীবন ছিল পবিত্র এবং তিনি মনে করতেন, আল্লাহ যে নেয়ামত দিয়েছেন তা দিয়ে প্রতিদিনই আমলে অগ্রসর হওয়া উচিত।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটাও মনে করতেন যে, সব নফল ইবাদত, যা তিনি করতেন, সেসব অনবরত করা তার জন্য ফরয। ঈমানে-আমলে তিনি ছিলেন খুবই দৃঢ় মনোবলের অধিকারী; তাকে টলানোর ক্ষমতা কারও ছিল না। যদি কেউ তার উৎসাহ-উদ্দীপনায় অবাক হত, তিনি বলতেন, 'যদি আমার পিতা কবর থেকে উঠে এসে আমাকে একটি নফল ইবাদতও করতে নিষেধ করেন যা আমি রাসূলের জীবদ্দশা থেকে আমল করা শুরু করেছি, আমি সেটা ছাড়ব না।'[৪৭]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কোনোমতে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারতেন। তারপরেও যা কিছু হাতে আসত, গরিবদের দান করে দিতেন।

---

[৪৬] ইবনে জাউযি, *সিফাতুস সফওয়া*, ২:৩১।
[৪৭] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১৩৮ (২৫১২২)।

একদিন যাবির তাকে দেখতে আসেন। তিনি তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেছিলেন। দায়িত্ব-সচেতন যাবির বললেন, 'আপনি কেন অন্য পোশাক পরিধান করেন না?'

যেহেতু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা যাবিরের মতো চিন্তা করতেন না, এজন্য তিনি বললেন, 'একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি আমার সাথে আবার মিলিত হতে চাও, তাহলে পরিধেয় কাপড় পরার অযোগ্য না হলে তা পরিবর্তন করো না এবং এক মাস আগেও নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে ফিকির করবে না।' এখন বল, তোমরা কি চাও যে, আমাকে তিনি যা করতে আদেশ করে গিয়েছেন, আমি তা করা ছেড়ে দিয়ে তার সাথে আবার মিলন থেকে বঞ্চিত থাকি?'[৪৮]

এটাও যথেষ্ট ছিল না, তিনি যখন গরিব এবং অসহায়দের হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখতেন, তখন নিজের কাছে যা থাকত, তা-ই দিয়ে দিতেন। কখনো মূল্যবান কিছু বিক্রি করে যা পেতেন, তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর যখন তিনি কাউকে কিছু দান করতেন, তখন নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করতেন না। সব সময় অন্যের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করতেন। একবার বাহ্যত তার কাছে যা ছিল, তার সবই তিনি দান করে দিলেন এবং ঐ দিন চলার মতো তার কাছে কোনো অর্থ অবশিষ্ট ছিল না। তারপরেও তিনি দান বন্ধ করলেন না। কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিস বাজারে বিক্রি করে দিলেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই সমুদয় অর্থ দান করে দিলেন। সন্ধ্যায় যখন ইফতার করার সময় হলো, তখন তার কাছে সামান্য একটি শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আশেপাশের মানুষের কাছে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইচ্ছাকৃত দীনতা এক বিরল জীবনযাত্রার চিত্র ফুটিয়ে তুলত এবং রাসূলের মৃত্যুর পরেও তিনি একই রকম জীবন-যাপন করেন। সত্যিকার ইচ্ছাশক্তি ঐ ব্যক্তিরই, যার প্রচণ্ড শক্তিমত্তা রয়েছে এবং তা প্রয়োগের অগণিত সুযোগও রয়েছে, এই ইচ্ছাশক্তিই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সময় থেকে আমৃত্যু

---

[৪৮] তাবরানি, আল-মুযামুল আওসাত, ৭:১১৩ (৭০১০)।

একই ধারায় বহন করেছেন। তিনি আমৃত্যু পরিচ্ছন্ন এবং হিসেবী জীবন-যাপন করেছেন।

আয়েশা যেমন চাইতেন, তেমন জীবনই কাটাতে পারতেন। মূলত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেতে চেয়েছেন। এ আগ্রহ তাকে আরেক প্রাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে; রাসূলের মতোই বিনয়ী জীবন-যাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করা।

নিশ্চিতভাবেই এ আগ্রহ ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের নিকটজনদের মধ্যে নিকটতর ছিলেন, যদিও এ নৈকট্য সবার ক্ষেত্রে একরকম নয়। তার মৃত্যুর পরও তিনি তাকে অনুসরণ করেছেন, যদিও তার বাইরে অনেক কিছু করার সুযোগ ছিল। তারপরেও তিনি কখনো রাসূলের সাথে কাটানো জীবন-পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন করেননি। কঠোর সাধনা এবং বিনয় ছিল তার সবচেয়ে বড় সম্পদ।

মহিলা প্রতিনিধি

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কৃচ্ছ্রতা সাধনকেই জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং সামগ্রিকভাবে খুবই সাধারণ জীবন-যাপন থাকতেন। রাসূলের সাথে বিয়ের পর থেকেই তার দায়িত্বের শুরু। সন্দেহাতীতভাবে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, নানাভাবে এর প্রতিফল উদ্ভাসিত হতে থাকে। রাসূলের ঘরে প্রবেশের পর থেকেই তিনি মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমাজের সকল মহিলাদের মাঝে তিনি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন। তার অবস্থান তাকে সুসংহত করে, বিশেষ করে মহিলা সাহাবীদের জন্য।

আরবের দীর্ঘ কুসংস্কারাছন্ন ঐতিহ্যের কারণে মহিলারা সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা পেত। নিজ বাড়িতে তার সব বান্ধবী ও অন্যান্য মহিলাদের কাছে অর্থবহ তথ্য সরবরাহ এবং তাদের সমস্যা সমাধানে নিবেদিত অন্তঃকরণের কারণে তিনি এ পুরোনো ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে তার এ কাজ দেখে মুগ্ধ হতেন। তিনি যখন ঘরে আসতেন, তখন তার বান্ধবীরা দ্রুত পালাতে চেষ্টা করত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবার ডেকে আনতেন। তিনি বিরক্ত না করে তাদেরকে একসাথে হতে সাহায্য করতেন।[৪৯]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে খেলনা ছিল যেন তিনি শিশুদের মতো খেলায় মত্ত হতে পারেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ডানাওয়ালা একটি ঘোড়া দেখে বললেন, 'এটা কী, হে আয়েশা?'

---

[৪৯] বুখারী, সহীহ, আদব, ৮১ (৫৭৭৯)।

তিনি জবাব দিলেন, 'ঘোড়া।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘোড়ার কি ডানা থাকে?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উত্তর প্রস্তুত ছিল, যা থেকে বোঝা যায় তিনি কুরআনের বাণীকে শিশুদের খেলা ও আনন্দে প্রয়োগ করতেন, 'সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘোড়ার কি ডানা ছিল না?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যথার্থ উত্তরে মুচকি হেসে প্রতিক্রিয়া জানাতেন।[৫০]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেদিন এ অনাড়ম্বর ঘরে পদার্পণ করেন, সেদিন থেকেই তিনি ইসলামের পূর্ব যুগে প্রচলিত সব কুসংস্কার নির্মূলে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। রাসূলের সাথে তার নৈকট্য, কুরআনে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং বিয়ের আগে ও পরে মহিলাদের সমস্যা সমাধানে তার আন্তরিকতা মুসলিম নারী জাতির জন্য এক বিশেষ নেয়ামত ছিল।

জাহেলি যুগে মহিলাদেরকে নিচু দৃষ্টিতে দেখা হত, তাদের মানুষই মনে করা হত না। যদিও অনেকে ইসলামে দাখিল হচ্ছিলেন, তবু সমাজের পুরোনো এ দৃষ্টিকোণ থেকে এক রাতেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না। অনেক মহিলার বাস্তবিক কোনো অধিকার ছিল না, দাসীদের থেকেও তাদের অবস্থান ছিল করুণ।

অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে মহিলারা একজন প্রভাবশালী প্রতিনিধিকে খুঁজে পেল। আয়েশা তাদের জন্য ছিলেন উপদেষ্টার মতো। তারা তার কাছে আসতেন, তাদের গোপন সমস্যার কথা বলতেন এবং সন্তোষজনক জবাব নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যেতেন। তারা ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য বলতে দ্বিধা করতেন না। একবার এক মহিলা প্রচণ্ড দুঃখ নিয়ে এসে বলেন, 'আমার স্বামী আমাকে তালাকও দেয় না, আমার মতো আমাকে ছেড়েও দেয় না, অথবা আমার সাথে স্বামীর মতো আচরণও করে না।'

---

[৫০] আবু দাউদ, *সুনান*, আদব, ৬২ (৪৯৩২); বাইহাকি, *সুনান*, ১০:২১৯ (২০৭৭১)।

মহিলা কাঁদতে লাগলেন। তার মনের বেদনা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে অনেক বছর ধরে সহ্য করা এই হৃদয়বিদারক অবস্থার বর্ণনা দিলেন। তিনি স্বামীর কাছে একটি খেলনা ছাড়া আর কিছুই না। প্রথমে তার স্বামী তাকে তালাক দিল। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে এসে বলে যে, সে তার মন পরিবর্তন করেছে। তারপর থেকে সে তার আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার স্ত্রীকে তালাক দিলেও অন্য কারও সাথে বিয়ের সুযোগ দেবে না।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মহিলার সমস্যার কথা জানালেন। মনে হচ্ছিল, এটা বিয়ের নির্মম ব্যবহার। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা আয়াত নাযিল না হওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা করতে লাগলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন যেখানে বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমানদারকে সতর্ক করা হয়েছে,

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ

> তালাকে-রাজঈ হলো দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। (সূরা আল-বাকারা, ২:২২৯)

এভাবে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দ্বিতীয়বার তালাক বলার সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এটা যেমন ধারণা করা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি মারাত্মক ছিল। এখন থেকে পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর কাছে গমন নিষিদ্ধ যাকে সে ইতিমধ্যে তিন বার তালাক দিয়েছে। এখন যদিও সে অনুতপ্ত হয়, তবু তার সে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। একটিই পথ খোলা ছিল, যদি তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য কারও সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখান থেকে পুনর্বার তালাকপ্রাপ্ত হয় অথবা তার সে স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তখনই কেবল প্রথম স্বামী আবার বিয়ে করতে পারবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তালাক নিয়ে তামাশা বন্ধ হয়ে যায়।[৫১]

---

[৫১] আবু দাউদ, *সুনান*, তালাক, ৯ (২১৯৪); ইবনে মাযাহ, *সুনান*, তালাক, ১৩ (২০৩৯)।

আরেকদিন খাওলা বিনতে সালাবাহ আয়েশার কাছে এলেন। তার অবস্থা ছিল করুণ। তার চেহারায় বছরের পর বছর ধরে নির্যাতনের ছাপ। তিনি এক এক করে তার উপর নির্যাতনের ঘটনা বলতে লাগলেন। জাহেলি যুগের নিয়ম অনুযায়ী তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। তখন তালাক দিতে গেলে স্বামী বলত, 'এখন থেকে তুমি আমার মায়ের পিঠ।' এভাবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হত। এ অবস্থায় একজন মহিলা পুনর্বার বিয়ে করতে পারত না। এ সমস্যার সামাধানের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি। তিনি বাসায় এলে খাওলা তার কাছে গিয়ে বললেন,

> ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমার যৌবন উপভোগ করেছে। আমার যা ছিল, সবই আমি তাকে দিয়েছি। এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং সন্তান ধারণে অক্ষম। সে আমাকে এ কথা বলে তালাক দিয়েছে যে, 'আমার মায়ের পিঠের মতো' হয়ে যাও।

এটা ছিল একটি কঠিন পরিস্থিতি। মহিলা আরও বলল যে, তার সন্তানেরা বড় হয়ে গেছে এবং সে একা তার স্বামীর সাথে থাকে। এজন্য তার স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। এখন একাকী কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই বসবাস করছে। তার স্বামী বলেছে যে, সে তাকে আবার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সে এটা করতে পারছে না। তখন মহিলাটি উপরে হাত তুলে তার অন্তরে যা ছিল বলল, 'হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আমার অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করছি।'

দয়ালু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তঃকরণ কেঁপে উঠল। কিন্তু তার এ ভোগান্তি আজীবনের ছিল না। খাওলা যেমন দুআ করেছে, আল্লাহ কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল করে বিষয়টির ফায়সালা করে দিলেন। জিবরাইল যে আয়াত নিয়ে এলেন, তাতে খাওলার পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং একই সমস্যায় আক্রান্ত সকল নারীর জন্য সমাধান দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতে এ ধরনের হীন কাজকে ইসলাম-পূর্ব যুগের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এটাকে পুরোপুরি বর্জন করতে বলা হয়েছে। এখানে মহিলাদের করণীয়ও বলে দেওয়া হয়েছে এবং যেসব স্বামী এ রকম আচরণ করবে, তাদের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে,

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ ① اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ② وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ③ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۗ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ④

যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শোনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদের জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই : একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা মুযাদালাহ, ৫৮:১-৪)

একবার আরেক ঘটনায় সাবিত ইবনে কায়িস রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হাবিবা বিনতে সাহল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে বললেন

যে, তিনি স্বামীর নিকট থেকে তালাক চান। এ ব্যাপারে তার সাহায্য আশা করলেন। হাবীবা ছিলেন মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সাহলের মেয়ে। তার প্রথম স্বামী হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলে তিনি সাবিত ইবনে কায়িস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি খুবই সুন্দরী এবং ভদ্র মহিলা ছিলেন। তার পরিবারেও তার খুব যত্ন নেওয়া হতো। যদিও সাবিত ইবনে কায়িস বক্তা হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন বেঁটে এবং দেখতে অত সুশ্রী ছিলেন না। সম্ভবত হাবীবা সামাজিক চাপের কারণে তার স্বামীকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসার পর হাবীবা তার ঘটনা খুলে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার স্বামীর ধার্মিকতা অথবা চরিত্রের ব্যাপারে মন্দ বলি না। তারপরেও আমি ঈমান আনার পর বিচ্যুত হওয়ার ভয় করি। আমি আমার স্বামীকে তালাক দিতে চাই।'

হাবীবাকে খুব অনড় মনে হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি তাকে তার বাগান ফেরত দিতে চাচ্ছ?'

কোনো রকমের দ্বিধা ছাড়াই হাবীবা বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'
এ ঘটনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে ডাকলেন এবং তাকে এ বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সাবিতের কাছেও এর কোনো সামাধান ছিল না। বাহ্যিকভাবে অস্থিরতা বেড়েই চলল এবং একপর্যায়ে তা অসহনীয় হয়ে উঠল। এ অবস্থায় এ বিয়ে টিকে থাকার কথা নয়। যদিও তালাক ইসলামে সবচেয়ে ঘৃণিত জায়েয কাজ ছিল, তবুও এর বিকল্প কিছু ভাবা যাচ্ছিল না। সাবিতেরও একই মত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'বাগান বুঝে নিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও।'[৫২]

তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীরা তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে পারত এবং স্বামীকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্তও নিতে পারত।

---

[৫২] ইবনে মাযাহ, *সুনান*, তালাক, ২২ (২০৫৬); *মুয়াত্তা*, তালাক, ১১ (১১৭৪)।

যখন সবাই জানল যে, এ ধরনের বিষয় ইসলামী নিয়মানুসারেই সমাধান করা সম্ভব, তখন অনেকেই রাসূলের কাছে আসা শুরু করল। আর এ সমস্যায় জর্জরিত নারীর সংখ্যাও বেড়ে গেল। উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম যিনি ইসলামের শুরুতে ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন, আয়েশার ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি ছিলেন খুবই বিমর্ষ। খাওলার বিয়ে নিয়ে এর আগেও সমস্যা হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা ভালোভাবেই জানতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে যখন খাওলাকে এই অবস্থায় দেখলেন, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আয়েশা! তার এ অবস্থা কে করেছে? কী হয়েছে তার?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যাখ্যা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তার অবস্থা এমন যেন তার বিয়েই হয়নি! অথচ তিনি একজন বিবাহিতা মহিলা। তার স্বামী দিনে রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদতে মশগুল থাকে। এজন্য সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আপনি তাকে এখন যেমন বিধ্বস্ত দেখছেন!'

উসমান ইবনে মাজউন পুরোপুরিভাবে নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করেছে এবং এভাবে তিনি তার পরিবারের হক নষ্ট করছেন। যদিও তিনি রাখালের মতো তার অধীনস্থদের উপর দায়িত্ববান, তবু তিনি তার স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন। এই চরম দুঃখজনক অবস্থা ওহী নাযিল হওয়ার জন্য উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে মাজউনকে খবর পাঠালেন। খবর পেয়েই তিনি রাসূলের কাছে ছুটে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে উসমান! আমাদেরকে সন্ন্যাসীদের জীবন-যাপন করার জন্য হুকুম করা হয়নি। আমি কি তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নই? অথবা তুমি আমার সুন্নাতকে অতিক্রম করতে চাচ্ছ?'

উসমান ইবনে মাজউন দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তার এত বেশি ধর্মীয় ইবাদতের মূল লক্ষ্যই ছিল আখিরাতের সাফল্য। উসমান ইবনে মাজউন জবাবে বললেন, 'না, হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি আপনার সুন্নাতকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছি।'

সন্দেহাতীতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন আসলে সুন্নাত বলতে কী বোঝায়। উসমানের এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত উপদেশ দেন,

> আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আমলকারী। তারপরেও আমি ইবাদত করি এবং ঘুমাই, রোযা রাখি এবং ইফতার করি এবং একই সময় আমি বিবাহিত। আল্লাহকে ভয় কর, হে উসমান! কারণ তোমার প্রতি তোমার পরিবারের হক রয়েছে, তোমার মেহমানদের হক রয়েছে। তোমার শরীরেরও হক রয়েছে। এজন্য কিছুদিন রোযা রাখবে, কিছুদিন রোযা রাখবে না এবং রাতের কিছু অংশ ইবাদত করবে, আবার কিছু অংশ ঘুমাবে।[৫৩]

অনেক মহিলা সাহাবীও ছিলেন, যারা সারা রাত ঘুমাতেন না। তারা এ ব্যাপারে অন্যকেও আহবান করতেন এবং নিজেরা পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। খাওলা ছিলেন তাদের একজন। খাওলা আয়েশার কাছে এসে তা বললে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা শুনে খুশি হননি। এ রকম ইবাদত অনবরত করা সম্ভব নয়। এর চেয়ে সামান্য ইবাদত যা প্রতিদিন নিয়মিত করা হয়, সেটা আল্লাহর কাছে বেশি দামি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, মনে হলো তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, 'কি, সারারাত ঘুমায় না?' তারপর বললেন,

> আহা কেন তুমি নিজের উপর এমন বোঝা চাপাচ্ছ যা তুমি বহন করতে পারবে না? ভুলে যেও না, এতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং একসময় বিরক্তও হবে। কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।[৫৪]

---

[৫৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ* ৬:২২৬ (২৫৯৩৫); ইবনে হিব্বান, *সহীহ*, ১:১৮৫, ২:১৯।
[৫৪] বুখারী, *সহীহ*, তাহাজ্জুদ, ১৮ (১১০০)।

একদিন এক যুবতী মহিলা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে হাজির হলো। সে বলে যে, তার পিতা তাকে তার মতের বিরুদ্ধে চাচাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে চান।

ঐ সময় আরবের মহিলারা বিয়ের ব্যাপারে কোনো পছন্দ-অপছন্দের কথা বলতে পারত না। তাদের আগ্রহের কোনো মূল্য দেওয়া হতো না। বিয়ের ব্যাপারে পিতাই সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি যা বলতেন, তা-ই হয়ে যেত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ত এ কুসংস্কারকেও পরিবর্তন করবেন, এমনটিই আশা করেছিল এই যুবতী।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শুনলেন। তিনি যেমন অনেককেই বলেছেন, তাকেও বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টা জানাতে চাচ্ছেন যাতে জাহিলিয়্যাতের যুগের এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফিরে এলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব দ্রুত যুবতী মহিলার সমস্যার কথা তুলে ধরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে যুবতীর বাবাকে ডেকে পাঠান। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে আসতে বলেন, তখন সেটাতে না করার কারও কোনো অবকাশ ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। যুবতী যা বলেছে, তা সত্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পিতাকে উপদেশ দিলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি পুরো সমাজকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে পিতা বুঝতে পারলেন যে, তিনি যা করতে চাচ্ছিলেন তা ভুল এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তার মেয়ের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না। বিষয়টি চমৎকারভাবে সমাধান হয়ে যায়। এই প্রথম একজন যুবতী মহিলার ইচ্ছাকে সত্যিকারভাবে মূল্যায়ন করা হলো। এ দুজনের বিয়ে হবে না - এটাই সবাই আশা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি ভিন্নভাবে শেষ হয়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েকে লক্ষ্য করে

বললেন যে, এখন সিদ্ধান্ত তোমার, তখন সে যা বলল তা ছিল ধারণাতীত,

> হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা যে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন, আমি তাতে রাজি আছি। আমি আপনাকে এজন্যই বিষয়টি জানিয়েছে যেন সব পিতারা জেনে নেয় যে, মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।[৫৫]

উপরের কয়েকজন মহিলাই কেবল আয়েশার মাধ্যমে রাসূলের কাছে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা বলেছেন, তা নয়। এ রকম অনেকেই তার কাছে আসতেন। রাসূলের কাছ থেকে তাদের সমস্যার সমাধান জেনে নিয়েছেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে বাড়িতে ফিরে গেছেন।[৫৬]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বুঝে-শুনেই এসব মহিলাদের কথায় কর্ণপাত করতেন। অকারণে বা অন্ধভাবে তাদের প্রশ্রয় দিতেন না। তারা সঠিক ছিলেন বলেই আয়েশা তাদের পক্ষে কাজ করেছেন। আর যারা ভুল ছিলেন, ধর্মের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করতেন, তাদের সাবধান করে দিতেন। তার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সুবিচার এবং সমতা ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যখন প্রয়োজন হত, তিনি মহিলাদের তিরস্কার করতেন এবং সতর্ক করতে দ্বিধা করতেন না। তাদের ভুলগুলো দেখিয়ে দিতেন এবং শোধরানোর চেষ্টা করতেন।

অনেক বছর পর, নতুন নতুন এলাকা বিজয় করার পর মুসলমানরা বিভিন্ন সভ্যতা এবং মতবাদের লোকদের সান্নিধ্যে এল। অনেক মহিলারাও নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ হলো। বিশেষ করে, কিছু মহিলারা পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা কমিয়ে দিল এবং ভিন্ন আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এ অবস্থা দেখে আয়েশা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বলেন,

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এ যুগের নারীদের চাল-চলন দেখতেন, তবে তাদের বনী ইসরাঈলী নারীদের ন্যায় মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।[৫৭]

---

[৫৫] ইবনে মাযাহ, *সুনান*, নিকাহ ১২ (১৮৭৪); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১৩৬ (২৫০৮৭)।
[৫৬] বুখারী, *সহীহ*, লিবাস, ২৩ (৫৮২৫)।
[৫৭] বুখারী, *সহীহ*, সিফাতুস সালাত, ৭৯ (৮৩১); মুসলিম, *সহীহ*, সালাত, ১৪৪ (৪৪৫)।

তার এ কথায় বোঝা যায় যে, তিনি কত গভীরভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতেন। তার কথা একইভাবে প্রমাণ করে যে, সময়ের পালাবদলে অনেক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হতে পারে, রাসূলের যুগে মহিলাদের অবস্থা মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী ছিল এবং তখন তাদের জন্য এর অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পর্দার ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। যেসব মহিলা এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখাত, তিনি তাদের সতর্ক করতেন। তিনি চাইতেন সবাই যেন ধর্মীয় ব্যাপারগুলোতে একই যত্ন ও সচেতনতা প্রদর্শন করে এবং প্রায়ই জোর দিয়ে বলতেন, শরীয়তের দৈনন্দিন আমলে সামান্যতম ঢিলেমি দেওয়া উচিত নয়।

একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে তার ভাইয়ের মেয়ে হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান দেখা করতে আসে। তার মাথার স্কার্ফ খুবই পাতলা এবং স্বচ্ছ ছিল। আয়েশা সেটা দেখেই হাতে নিয়ে দুভাজ করলেন। তারপর তাকে সতর্ক করে বললেন, 'তুমি কি জান সূরা নূরে আল্লাহ কি আয়াত নাযিল করেছেন?'

পরিচিত কারও কাছ থেকে একটি ভারী স্কার্ফ নিয়ে সেটা কীভাবে পরতে হবে দেখিয়ে দিলেন। এভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করলেন।[৫৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের যুগে কীভাবে মাথা ঢাকতেন, সেটা বোঝানোর জন্য নিজের একটি ঘটনা বললেন,

> হজের সময় যদি কোনো আগন্তুক আমাদের কাছাকাছি চলে আসত, আমরা তখনই আমাদের চেহারা ঢেকে ফেলতাম। তারপর আগন্তুক চলে গেলে আবার চেহারা উন্মুক্ত করতাম।

হজের মৌসুমে মহিলাদের চেহারা ঢাকার ব্যাপারে বিখ্যাত ফকীহগণ, যেমন আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হজের ইহরাম

[৫৮] *মুয়াত্তা*, লিবাস, ৪; বাইহাকি, *সুনান*, ২:২৩৫, ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৭২।

অবস্থায় মহিলারা তাদের চেহারা খোলা রাখতে পারবে। কারণ তারা ইবাদতের জায়গায় অবস্থান করছে এবং এসময় অন্যান্য সময়ের তুলনায় কুদৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তারপরেও আয়েশা ছিলেন খুবই সতর্ক। ইহরাম অবস্থায়ও পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে ফেলতেন। তিনি এ ব্যাপারে সতর্কতা করতে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। হজের সময় যখন তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং পরবর্তীতে তার ভাইয়ের সাথে তানইমে গেলে অনেক কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ সতর্কতায় অবহেলা করেননি। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা-ই বলতেন এবং বাস্তবে আমল করতেন - এখানে কোনো লৌকিকতা ছিল না।[৫৯] তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার জন্য ছিল একটি শিক্ষা। তার কাছে যারা আসতেন, সবার জন্যই কিছু করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কিন্তু যদি কোনো পুরুষ আসত, তখন তিনি নিজেকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ফেলতেন, যদিও কুরআন মাজীদে তাকে 'উম্মুল মুমিনীন' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৬০]

যখন সামাজিকভাবে মহিলাদের আচরণে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন তিনি মহিলা সাথীদের রাসূলের সময় তাদের বিশ্বাস ও আমল নিয়ে কথা বলতেন। তিনি আধুনিক মহিলাদের কর্মকাণ্ডে লজ্জিত হয়ে বলতেন,

> আল্লাহ তাআলা আগের যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন! আল্লাহ যখন আদেশ নাযিল করলেন, তখন তারা একে অন্যের সাথে নিজের শরীরকে আবৃত করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতেন।[৬১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কানে এল যে, কিছু মহিলারা নতুন বিজিত এলাকাসমূহে আগের তুলনায় অনেক স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে এবং বাড়ির বাইরে পর্দার ব্যাপারে তাদের আচরণে অনেক শিথিলতা প্রদর্শন করছে। তিনি খুব দুঃখিত হলেন। একদিন 'হিম' এলাকা থেকে একদল মহিলা তার নিকট এলে তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলেন, 'তোমরা কি সেই মহিলারা যারা পাবলিক বাথরুমে যায়? ভুলে

---

[৫৯] বুখারী, *সহীহ*, হাইদ, ১৫ (৩১০, ৩১১, ৩১৩)।
[৬০] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২১৯ (২৫৮৮৩)।
[৬১] বুখারী, *সহীহ*, তাফসীর, ৩১ (৪৪৮০)।

যেও না, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যেসব মহিলারা তাদের স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও নিজের পরিধানের কাপড় খোলে, তারা তাদের সাথে আল্লাহর পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলে।'[৬২]

তিনি এসব নারীদের পরিবর্তিত পোশাক এবং শরীরের অনেকাংশ উন্মুক্ত দেখে সতর্ক করে বললেন,

> যে নারী সূরা নূরে এই আয়াত বিশ্বাস করে, তারা এভাবে শরীরকে উন্মুক্ত রাখতে পারে না। তুমি যদি ঈমানদার হও, তাহলে মনে রেখ, তোমার এই পোশাক কোনো বিশ্বাসী মহিলার পোশাক নয়।[৬৩]

যখন কোনো মহিলা তার সাথে দেখা করতে আসত, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের পোশাক এবং আচরণ দেখে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন। তারা কোনো প্রশ্ন করার আগেই তিনি বুঝে যেতেন তাদের উদ্দেশ্য এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের কথার জবাব দিতেন। হেনা সম্পর্কে রাসূলের মতামত জানতে এক মহিলা প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটার রঙ পছন্দ করতেন কিন্তু গন্ধ অপছন্দ করতেন।'[৬৪]

মহিলাদের সাথে তার কথোপকথনে এ রকম বিস্তারিত বর্ণনাই শুধু থাকত না; তিনি তাদের আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির পথের দিকে আহবান করতেন এবং নিজ ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঘরের শান্তির সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। তিনি বলতেন, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে এবং পরস্পরের বিষয়াদিতে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যারা রাসূলের নিকটবর্তী ছিলেন, তিনি তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্র

---

[৬২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৪১, ১৭৩ (২৪১৮৬); তিরমিযি, *সুনান*, ৪৩ (২৮০৩)।
[৬৩] কুরতুবি, *আল-জামী*, ১৪:৫৭।
[৬৪] আবু দাউদ, *সুনান*, তারাজ্জুল, ৪, (৪১৬৪); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১১৭ (২৪৯০৫)

দিয়ে সাহায্য করতেন। যদিও তিনি সবাইকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন, একইভাবে তিনি এটাও আশা করতেন, সবাই তার মতো একই আচরণ করবে—সবাই তাদের স্বামীর প্রতি এমন নিবেদিত থাকবে যেমন তিনি রাসূলের প্রতি ছিলেন। একবার এক মহিলা উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, 'যদি তোমার এ সুযোগ থাকে যে, তোমার ভুলগুলো তুমি ভালো কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে তোমার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে, তাহলে কোনো দ্বিধা ছাড়া সেটাই কর।'[৬৫]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে পরিবারে শান্তি ছিল সবকিছু থেকে মূল্যবান এবং তিনি মনে করতেন, এজন্য স্ত্রীর ভূমিকাই বেশি। একজন স্ত্রী পরিবারের শান্তির উৎস এবং এ কারণে তাকে অনেক সতর্কতার সাথে স্বামীর প্রতি দায়িত্ববান থাকতে হয়। এ বিষয়ে এক মহিলা প্রশ্ন করলে আয়েশা তার ধারণার বাইরে অনেক দীর্ঘ এবং অনেক বিজ্ঞ জবাব প্রদান করেন। তিনি কোনো প্রশ্ন করলে, প্রশ্নের জবাবের পাশাপাশি তিনি অন্যান্য উপদেশও দিতেন। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'আমার চেহারায় কিছু লোম আছে। স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য আমি কি এগুলো উপড়ে ফেলব?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, 'তুমি যে রকম অন্যের সাথে দেখা করার সময় গহনা এবং রূপচর্চা কর, তেমনি তোমাকে যা কষ্ট দিচ্ছে, স্বামীর কাছে আকর্ষণীয়া হওয়ার জন্য তা পরিষ্কার করে ফেল। তিনি যখন কোনো কিছু করতে বলে, তা কর; তিনি যদি কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে সেটা উপেক্ষা করো না। তোমার স্বামী যাকে পছন্দ করেন না, তাকে নিজ ঘরে আসতে দিও না।'[৬৬]

---

[৬৫] ইবনে সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা*, ৮:৭০-৭১; যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, ১:৫৩৭।
[৬৬] আব্দুররাজ্জাক, *মুসান্নাফ*, ৩:১৪৬ (৫১০৪)।

রাসূলের প্রতি আয়েশা রা.-এর ভালোবাসা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। আল্লাহ সব বান্দাদের তার বিশ্বস্ত রাসূলকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

> আপনি ঘোষণা করে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ করে চল। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, বড় করুণাময়। (সূরা আলে-ইমরান, ৩:৩১)

অন্যদের উপস্থিতিতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সাথে সময় কাটাতে চাইতেন না, বরং তিনি রাসূলের সাথে সবসময় একাকী কাটাতে চাইতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সবার জন্যই রাসূল। তিনি চাইতেন সবার কাছে পৌঁছতে এবং সেটা যত কঠিনই হোক। যে দরজা দিয়ে দীর্ঘকাল কেউ প্রবেশ করেনি, তিনি সেখানেও পৌঁছতে চাইতেন। পরবর্তীতে তার বিয়েসমূহ সম্ভবত এ কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। মানুষ রাসূলের মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য মৃত্যুর জন্য লাইন ধরত। তারা তার জন্য ছিল নিবেদিত। তাদের এই নিবেদিত প্রাণের জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উৎকণ্ঠা বেড়ে যেত। নিচের এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত তার উৎকণ্ঠা বাড়তেই থাকে,

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোনো দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা আহযাব, ৩৩:৫১)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আমি দেখছি আপনি যা চান, আপনার রব তাই আপনাকে দান করেন!'

এখানে ভালোবাসার এবং আন্তরিকতার ছাপ রয়েছে। তিনি সারাক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থাকতে চাইতেন, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তা পারতেন না। আর তিনিই এ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রী তার কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন করে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুটিন তৈরি করে নিজের সময়কে সবার জন্য সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি প্রায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা পেতেন, সেখানে এখন নয় দিন পর মিলিত হতে পারেন।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আচরণ পরিবর্তন করেননি। যদি কখনো তার পছন্দের কারণে রুটিনে কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে, তিনি অবশ্যই নির্দিষ্ট স্ত্রীর কাছ

থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। তিনি রাসূলের এই আচরণের দিকেই ইশারা করেই বার বার বলতেন,

> সূরা আহযাবের এই আয়াত (৩৩:৫১) নাযিল হওয়ার পরও রাসূল স্ত্রীদের ব্যাপারে তার রুটিন পরিবর্তন করতে চাইলে আমাদের অনুমতি নিতেন : 'আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার যেদিন পালা আসত, সেদিন তিনি সারাক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থাকতে চাইতেন এবং কোনো কারণে তা না পারলে কষ্ট পেতেন। একরাতে তিনি জেগে ওঠেন এবং বুঝতে পারেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশে নেই। যেহেতু ঘরে কোনো বাতি ছিল না, এজন্য আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি ভাবলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গেছেন। খুব অভিমান নিয়ে চারিদিক হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকারে তার হাত রাসূলের পা স্পর্শ করল। তখন তিনি শান্ত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদারত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে যাননি। তিনি ঘরের এক কোণে রবের কাছে কান্নাকাটি করছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শুনলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করছেন,

> হে আমার প্রভু! আমি আপনার গোস্বার পরিবর্তে সন্তুষ্টি চাই, শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা চাই; আমি আপনার কাছেই আশ্রয় চাই। আপনি আপনার যেরকম প্রশংসা করেছেন আমি তা করতে অক্ষম।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজের কাজের জন্য লজ্জিত হলেন। রাসূলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আমি কোন ধারণায় আছি, আর আপনি আছেন কোন অবস্থায়!'[৬৭]

---

[৬৭] মুসলিম, *সহীহ*, সালাত, ২২১ (৪৮৫, ৪৮৬, ৫১২); তিরমিযি, *সুনান*, দাওয়াত, ৭৬ (৩৪৯৩); আবু দাউদ, *সুনান*, সালাত, ১৫২ (৮৭৯)।

আরেকদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একই অবস্থার মুখোমুখি হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ঘুমানোর জন্য ঘরে এলেন। তিনি পায়ের জুতা খুলে খাটের নিচে রাখলেন এবং কাপড়টাও কাছাকাছি ঝুলিয়ে রাখলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি একটু পরেই উঠে আবার বাইরে কোথায়ও যাবেন। সাধারণত তিনি রাতে ইবাদতের জন্যও স্ত্রীদের কাছে অনুমতি নিতেন। কারণ তিনি তার উপর অন্যের হক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন।[৬৮] যাই হোক, ঐ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন আচরণ করছিলেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার তা বোধগম্য হচ্ছিল না। এজন্য তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন। একটু পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে গেলেন।

তারপর একসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তর্পণে বিছানা থেকে উঠলেন। তিনি পা টিপে টিপে হাঁটছিলেন যেন আয়েশা সজাগ না হয়ে যান। কিন্তু আয়েশা ঘুমিয়ে ছিলেন না। সজাগ ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই সতর্কতার সাথে জুতা পড়লেন, গায়ে কাপড় জড়ালেন এবং দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আয়েশা বিচলিত হয়ে গেলেন।

তিনি তখনই উঠে পড়লেন এবং নিজের চেহারা ওড়নায় ঢেকে রাসূলের খোঁজে বের হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ করছিলেন। যখন তার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন হাত নামালেন। একটু পরেই আবার হাত তুলে দুআয় নিমগ্ন হলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একসময় জান্নাতুল বাকি থেকে ঘরে ফিরতে উদ্যত হলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেকে লুকাতে হাঁটতে শুরু করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত হাঁটছিলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার চেয়ে দ্রুত হাঁটছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আরও দ্রুত হাঁটতে লাগলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন না পেরে দৌড় শুরু করলেন।

---

[৬৮] বাইহাকি, *সুনান*, শুআবুল ঈমান, ৩:৩৮৩ (৩৮৩৭)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের আগেই ঘরে পৌঁছলেন, কিন্তু তিনি হাঁপাতে লাগলেন। তিনি দ্রুত বিছানায় শুয়ে পড়লেন যেন তিনি ঘর থেকেই বের হননি!

একটু পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ঢুকে আয়েশার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আয়েশা! তোমার কী হয়েছে?’

তিনি জবাব দিলেন, ‘কিছু না।’

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবেই জানতেন কী ঘটেছে, এজন্য তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি আমাকে বলবে, না তুমি চাও আল্লাহ আমাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিক?’

আয়েশার অন্তর কেঁপে উঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরে তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক।’

এটা ছিল নিজেকে লুকানোর একটি পন্থা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার সামনে দিয়ে কোনো একটি অপরিচিত মূর্তির চলার শব্দ আমি পেয়েছি। তাহলে কি সেটা তুমিই ছিলে?’
‘হ্যাঁ।’ আয়েশা স্বীকার করলেন।[৬৯]

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ-কর্মে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না এবং তার ভয়েরও কোনো কারণ ছিল না।

তার ভালোবাসা মনের মধ্যে এত বেশি প্রোথিত ছিল যে, তিনি রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো অবমাননাকর কথা সহ্য করতেন না। একদিন একজন

[৬৯] মুসলিম, *সহীহ*, জানায়েয, ১০২ (৯৭৪), নাসাঈ, *সুনান*, জানায়েয, ১০৩ (২০৩৭)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে বলল, 'আল্লাহ আপনার মৃত্যু দান করুক।'[৭০]

এ কথা শোনার সাথে সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'তুমি কে যে রাসূলের মৃত্যু কামনা করছ? বরং আল্লাহ তোমার উপর মৃত্যু এবং অভিশাপ বর্ষণ করুক।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশার অনুভূতি বুঝলেন এবং তার কথার মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্যেরও প্রশংসা করলেন, কিন্তু নবী হিসেবে প্রত্যেককেই একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজন ছিল। আর একজন খাঁটি ঈমানদারকে কখনো তার মন্দ কথার জবাবে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করতে নেই। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে লক্ষ্য করে বললেন,

> হে আয়েশা, শান্ত হও! আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে পরম বন্ধু এবং তিনি সব বিষয়ে আমাদের উপর রহম করতে ভালোবাসেন। তবে যারা মন্দ আচরণ করে, তাদের উপর তিনি কোনো রহমত বর্ষণ করেন না।[৭১]

কেউ কিছু চাইলে আয়েশা না করতে পারতেন না। যদিও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা হলেই মনে মনে ছটফট করতেন, কিন্তু এ থেকে ব্যতিক্রম আচরণও করতে পারতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে গেলে স্ত্রীদের কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একবার এক সফরে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গিনী ছিলেন। সারাদিন তারা সফরে অনেক পথ অতিক্রম

---

[৭০] 'আসসালামু আলাইকুম' (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলার পরিবর্তে ইসলামের কিছু দুশমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'সামাইকুম' (আপনার উপর 'সাম' মানে মৃত্যু আপতিত হোক) বলত (নাউযুবিল্লাহ)।

[৭১] বুখারী, সহীহ, আদব, ৩৮ (৫৬৮৩)।

করলেন। রাতে তারা এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে বসে কথা বলতে লাগলেন। হাফসা জানতেন, প্রথম রাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাবেন না। এটা নিশ্চিতভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য বরাদ্দ।

কিছুদিন পর হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে প্রস্তাব করলেন, 'আপনি আমার উটের উপর আরোহন করুন এবং আমি আপনার উটে চড়ি। দেখি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করেন।'

এটা একটি নির্দোষ আনন্দের বিষয় মনে হচ্ছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিশ্চিত ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উটের উপরই আরোহণ করবেন এবং তার এ দৃঢ় বিশ্বাসের পরও তিনি রাজি হলেন।

যখন সৈন্যবাহিনী চলা শুরু করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উটের দিকেই গেলেন, যদিও ভেতরে আয়েশার পরিবর্তে হাফসা বসেছিলেন। এভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, যিনি রাসূলের কাছে তার যোগ্যতার সাক্ষ্য পেয়েছিলেন, সত্যিকার অর্থে তিনি রাসূলের সাথে সফর করা থেকে বঞ্চিত হলেন।

যদিও তিনি এখানে হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে এর ফলাফল মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার সাথে ছিলেন না। এজন্য তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। ঘাসের মধ্যে নিজের পা ডুবিয়ে তিনি এজন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে নিজের বোঝা হালকা করতে চাইলেন,

> হে আমার প্রভু! আপনি একটি সাপ অথবা বিচ্ছু পাঠিয়ে দেন, সেটা আমাকে দংশন করুক। আপনার রাসূল যাচ্ছেন, আমি তাকে কিছুই বলতে পারিনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সংসারজীবন ছিল সব সময় পরম ভালোবাসা এবং মমতায় পরিপূর্ণ। সেখানে এমন কোনো ছোট থেকে ছোট সমস্যা হয়নি যা তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। প্রতিদিনই এ ভালোবাসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেত এবং প্রতিটি ঘটনাই তাদের আরও নিকটবর্তী করত। রাসূলের জন্য আয়েশার ভালোবাসায় কোনো খাঁদ ছিল না এবং এজন্য তাকে কোনো বিশেষ ব্যবস্থাও নিতে হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক আচরণই ছিল এ রকম। অন্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও তার একই রকম ভালোবাসা ছিল। তিনি বলার আগেই তাদের আকাঙ্ক্ষা বুঝে যেতেন এবং তা পূরণ করে দিতেন। আয়েশা বলেন, 'রাসূল কখনো কোনো মহিলাকে অথবা কোনো দাসীকে অথবা অন্য কাউকে নিজের হাত দিয়ে আঘাত করেননি।'[৭২]

রাসূলের প্রতি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এই ভালোবাসা রাসূলের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। রাসূলের জীবদ্দশায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে সাধারণ এবং বিনয়ী জীবনযাপন করতেন, বাকি জীবনেও তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরবর্তীতে যদি কেউ দামি হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসত তিনি খুব গোস্বা হতেন এবং নিজেকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন। আর যারা তাকে উম্মুল মুমিনীন হিসেবে জানত, তারাও নিজেরা নেক কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করত। এজন্য তিনি যা কিছু পেতেন, তা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। প্রথমে তিনি হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে চাইতেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখত এবং তিনি হাদিয়া গ্রহণে সম্মত হতেন।

একদিন দূত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির তার জন্য কিছু কাপড় এবং খাদ্য হাদিয়া নিয়ে আসেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আমার বৎস! আমি কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি না।'

---

[৭২] মুসলিম, *সহীহ*, ফাযায়েল, ৭৯।

তিনি তাকে তার হাদিয়া ফেরত দেন। যদিও তিনি একজন দূত ছিলেন, তবু ব্যথিত হলেন। তাদের নিয়ত ছিল শুধু ভালো কিছু করার। কারণ তারা যখন কোনো কিছু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দিতেন, মনে মনে ভাবতেন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই দিয়েছেন। তারা তাকে মা হিসেবেই দেখতেন এবং তার প্রয়োজন মেটাতে চাইতেন। কিন্তু তার পছন্দকেও মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। আব্দুল্লাহ খুবই বিমর্ষ মনে বাড়ি ফিরছিলেন। ঘটনার ব্যাপারে কী বলবেন, এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন।

একই সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও মনে মনে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত কিছু করেছেন কি না। হঠাৎ করে তিনি কাছাকাছি যারা ছিল, তাদের বললেন, 'তাকে ডাক!'

যখন তারা তাকে পেল, তখন দূত খুব অবাক হলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে উদ্বিগ্নের সাথে ফিরে এলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে আবার কী বলবেন!
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পূর্বের রাগ প্রশমিত হয়ে গেছে। মনে হয় কোনো সমুদ্রের বাতাস সেটা এক ঝাপটায় সরিয়ে দিয়েছে। খুব বিনয়ের সাথে তিনি বললেন,

> আমার মনে পড়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ ব্যাপারে একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে আয়েশা! তোমার চাওয়া ব্যতীত যদি কেউ তোমাকে কিছু হাদিয়া দেয়, তাহলে সেটা কখনো ফিরিয়ে দিও না। সব সময় সেটা গ্রহণ করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য করুণা।'[৭৩]

এ হাদীসের অর্থ খুব পরিষ্কার এবং দূত খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেলেন।

---

[৭৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬:৭৭ (২৪৫২৪)।

আয়েশা রা.-এর প্রতি রাসূলের ভালোবাসা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একতরফা ভালোবাসতেন না; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সব বিষয়ে সব মানুষের জন্য আদর্শ, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকেও গভীরভাবে ভালোবাসতেন। জীবনের অন্যান্য দিকের মতো সংসারজীবনেও তিনি এক অপূর্ব জীবন কাটিয়েছেন। তিনি বলেন,

> তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সাথে সর্বোত্তম আচরণ ব্যবহার করে। আর আমি হচ্ছি এ দলের নেতা।[৭৪]

পারিবারিক শান্তির মূল জিনিস হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ভালোবাসেন, এটা তিনি তাকে অবগত করেছেন এবং অন্যের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন, কিন্তু ভালোবাসা মানুষের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আয়েশার প্রতি ভালোবাসা ছিল একজন মানুষ হিসেবে তার স্বভাবজাত বহিঃপ্রকাশ। তিনি কখনো কোনো স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করেননি, সবাইকে সমানভাবে দেখ-ভাল করতেন এবং সবার সাথেই ভালো আচরণ করতেন। তারপরেও তিনি নিজের অনুভূতির উপর শক্তিমান ছিলেন না। এজন্য কোনো স্ত্রীর সাথে একদিন অতিবাহিত করার পর তার মনে অনুভূতির পার্থক্যের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন :

---

[৭৪] তিরমিযি, মানাকিব, ৬৪ (৩৮৯৫), ইবনে মাযাহ, নিকাহ, ৫০ (১৯৭৭)।

> হে আমার প্রভু, এটুকু সমতাই আমি করতে পারি। আপনি আপনার ক্ষমতায় যে সমতা করতে পারেন, সেটা দিয়ে আমার বিচার করবেন না।[৭৫]

এ দুআ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সংশ্লিষ্ট। তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য স্ত্রীদের তুলনায় গভীর ভালোবাসা ছিল। মানুষের অধিকার নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি সচেতন। তিনি সব স্ত্রীদের সঙ্গে সমান আচরণ করতে চাইতেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রম কিছু মনে হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۭ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

> আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন-নিসা, ৪:১২৯)

অনেক সাহাবীরা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে 'রাসূলের প্রিয়তমা' বলে ডাকা শুরু করলেন। যখন আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে কেউ একজন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছে, তখন তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে যান এবং চিৎকার করে বলেন, 'তোমরা কীভাবে রাসূলের প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে এ রকম অশোভন কথা বলতে পার এবং তাকে কষ্ট দিতে পার?'[৭৬] যে ব্যক্তি এ মন্দ কথা বলেছে, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সামনে থেকে দূরে সরে যেতে

---

[৭৫] তিরমিযি, *সুনান*, নিকাহ, ৪১ (১১৪০); আবু দাউদ, *সুনান*, নিকাহ, ৩৯ (২১৩৪)।
[৭৬] তিরমিযি, *সুনান*, মানাকিব, ৬৩ (৩৮৮৮); হাকীম, *মুসতাদারক*, ৩:৪৪৪ (৫৬৮৪)।

বললেন। তাদের পরস্পরের ভালোবাসা এত প্রগাঢ় ছিল যে, যেদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পালা আসত, সেদিন রাসূলের সাহাবীরা হাদিয়া-তোহফা পাঠাতে পছন্দ করতেন। কারণ ঐ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসিতে অন্যরকম আনন্দ অনুভব হত।[৭৭]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ ভালোবাসার কথা সবাই জানতেন। এ কারণে যে কোনো সমস্যা এড়ানোর জন্য রাসূলের স্ত্রীগণ খুব সাবধান থাকতেন এবং একে অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। একদিন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়ে হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

> হে আমার কন্যা! আশা করি তোমার একজন সঙ্গিনীর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ ভালোবাসা ও মহব্বত তোমাকে বিপথগামী করবে না।[৭৮]

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়ের কাছে আসলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিশেষ মর্যাদার কথা বলতে চেয়েছেন এবং আশা করেছিলেন যে, তার মেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আয়েশার সাথে প্রতিযোগিতা করবে না।

একজন পার্সিয়ান প্রতিবেশী সাহাবী বাসায় খুব ভালো স্যুপ রান্না করতেন। একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দেন। সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা দাওয়াত কবুল করতেন না এবং তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সঙ্গে নিতে চাইতেন, যিনি প্রচণ্ডভাবে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ইশারা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি তাকেও দাওয়াত দিচ্ছ?'

সাহাবী না বোধক জবাব দিলেন। সম্ভবত তার কাছে স্যুপের পরিমাণ খুব কম ছিল যা কেবল একজনই খেতে পারবে অথবা তিনি বুঝতে পারেননি

---

[৭৭] বুখারী, *সহীহ*, হিবা, ৬, ৭ (২৪৩৫-২৪৪১)।
[৭৮] মুসলিম, *সহীহ*, তালাক, ৩০ (১৪৭৯); তিরমিযি, *সুনান*, তাফসিরুল কুরআন, ৩৮৭ (৪৬২৯)।

যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যেন দাওয়াত দেওয়া হয়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত গ্রহণ করলেন না।

কিছুক্ষণ পর সাহাবী আবার ফিরে এলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একইভাবে দাওয়াত দিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ইশারা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি তাকেও দাওয়াত দিচ্ছ?'

আবার সাহাবী বললেন, 'না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও তার দাওয়াত কবুল করলেন না।

ঐ সাহাবী তৃতীয়বার এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা কে ছাড়া দাওয়াতে যাবেন না। এবার তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকেও দাওয়াত দিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পার্সিয়ান সাহাবীর বাসায় একসাথে দাওয়াত খেতে গেলেন।[৭৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে ভালোবাসা এত প্রকাশ্য ছিল যে, লোকজন রাসূলের সাথে মনোমালিন্য দূর করে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলের কাছে পাঠাত। একবার সাফিয়্যা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কাছে ডেকে বলেন, 'হে আয়েশা! তুমি কি রাসূলকে আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট করতে পারবে? যদি পার, তাহলে আমি আমার দিন তোমাকে দিয়ে দেব।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্মত হলেন। তারপর তিনি রাসূলের পাশে গিয়ে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন আজকের দিন আয়েশার জন্য নয় এবং তিনি কখনো রুটিন পরিবর্তন করতেন না।

---

[৭৯] মুসলিম, আশরিবা, ১৩৯ (২০৩৭); আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৩:১২৩ (১২২৬৫)।

এজন্য তিনি আয়েশার আগমনে অবাক হলেন এবং তাকে তার ঘরে ফিরে যেতে বললেন। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলা শুরু করেছেন, এজন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যাকে খুশি তাকে রহমত দান করেন।'

তিনি রাসূলের সম্পূর্ণ দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হলেন। তিনি রাসূলের কাছে সাফিয়্যার পুরো ঘটনা তুলে ধরলেন। সাফিয়্যার অনুতপ্ত হওয়ার কথাও বললেন। এটা সুখকর সময়ে একটি চেষ্টা ছিল এবং আয়েশার বুদ্ধিমত্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট করে। রাসূলের সন্তুষ্টির অভিব্যক্তি তার চেহারায় ফুটে ওঠে।[৮০]

একবার এক সফরে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উটটি পথ হারিয়ে ফেলে এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জায়গাটার নাম ছিল খাররা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব চিন্তিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার সবাই তাকে খোঁজা আরম্ভ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়জনকে হারিয়ে বলে উঠলেন, 'ওয়া আরুসাহ (হায়! আমার বধূ)' - এটা দুঃখকে ব্যক্ত করার একটি উক্তি যা কেউ তার স্ত্রীর বিয়োগব্যথায় উচ্চারণ করত।

আরেকসময় একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?'

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজের অবস্থান জানার আগ্রহে ছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম বলবেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো রকমের দ্বিধা ছাড়াই বললেন, 'আয়েশা।' আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের নাম শোনার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এজন্য আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরুষদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে

---

[৮০] বুখারী, সহীহ, হিবা, ১৪; শাহাদাত, ৩০ (২৫৮২)।

বেশি ভালোবাসেন?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, ‘তার পিতা।’

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝলেন যে তার নাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়দের তালিকায় নেই এবং তারপর আর কোনো প্রশ্ন করা বিপদের কারণ হতে পারে। নিজেকে তালিকার সবচেয়ে নিচে মনে করে তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলেন।[৮১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত কোনো ঘটনা কেউ দেখলে তা তার অন্তরে গেঁথে যেত; আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ভালোবাসতেন, তার প্রতি সবার ভালোবাসাও বেড়ে যেত। যখন তিনি কোনো যুদ্ধে যেতেন এবং স্ত্রীদের কাছ থেকে এক মাসেরও বেশি সময় দূরে থাকতেন, তখন তিনি ফিরে আয়েশার ঘরে আগে যেতেন।[৮২]

একইভাবে রাসূলের থাকা না থাকার ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীনদের এখতিয়ার দেওয়ার ঘটনায় (তাখঈরের ঘটনা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অভিমত জিজ্ঞেস করেন :[৮৩] যখন মদীনার মুসলমানরা দীর্ঘদিন যাবৎ দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছিলেন, তখন তার কয়েকজন স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আমরা কি অন্য মুসলমানদের মতো একটু ভালো জীবন-যাপন করতে পারি না?’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। তিনি নিজেকে নিজে কৈফিয়ত দিলেন, ‘তারা যা চায় আমি তা দেওয়ার সামর্থ্য রাখি না।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুসলমান নারীদের জন্য আদর্শ হিসেবে

---

[৮১] বুখারী, সহীহ, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৫ (৩৪৬২)।
[৮২] বুখারী, সহীহ, নিকাহ, ৮৩ (৪৮৯৫)।
[৮৩] বুখারী, সহীহ, মাযালিম, ২৬ (২৩৩৬)।

গড়ে তুলছিলেন। তিনি এ আশঙ্কা করছিলেন, সম্ভবত তারা তাদের নেক আমলের বদলা এ দুনিয়ায় ভোগ করে ফেলবে এবং এজন্য কুরআনের এই আয়াত পড়লেন,

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۝۲۰

> যেদিন কাফেরদের জাহান্নামের নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদের বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ। সুতরাং আজ তোমাদের দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। (সূরা আহকফ, ৪৬:২০)

এভাবে এসব বিশেষ শ্রেণির মহিলারা বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তার গরিবী ঘর অথবা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ—এ দুটোর যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বললেন। তারা যদি দুনিয়াকে বেছে নেয়, তাহলে তিনি তার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পারেন দিয়ে দেবেন এবং তাদের তালাক দিয়ে দেবেন। আর যদি তারা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পছন্দ করে, তাহলে বর্তমান অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের ব্যতিক্রম। যেহেতু এ পরিবার দুনিয়ার বুকে অদ্বিতীয়, এজন্য পরিবারের সদস্যরাও ছিল অনন্য। পরিবারের কর্তাকে পছন্দ করে নেওয়া হয়েছিল, একইভাবে তার পরিবার এবং সন্তানদেরও। এজন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'আমি তোমার সাথে কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।'

'ভালো হয় যদি তুমি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তোমার পিতা-মাতার সাথে আলাপ করে নাও।' তারপর তিনি নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝٢٨ وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٢٩

> হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলেন, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই। আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ, তার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আহযাব, ৩৩:২৮-২৯)

সত্যবাদী পিতার সত্যবাদী কন্যা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে যে জবাব আশা করার ছিল, তিনি তা-ই বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, পিতা-মাতার সাথে আমার আলোচনার কি দরকার? আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পছন্দ করি।'[৮৪]

তারপরের ঘটনা আয়েশা নিজেই বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সব স্ত্রীদের কাছ থেকে একই উত্তর পেলেন। কেউ ভিন্ন জবাব দেননি। আমি যা বলেছি, সবাই তা-ই বলেছেন।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে এসব ঘটনা পুরো সমাজকে তার ব্যাপারে আরও যত্নবান করে তুলত। আয়েশার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিশেষ ভালোবাসা তার ইন্তেকাল পর্যন্ত বহাল

---

[৮৪] বুখারী, সহীহ, মাযালিম, ২৬ (২৩৩৬); মুসলিম, সহীহ, তালাক, ২২ (১৪৭৫)।

থাকে। যেদিন তিনি অন্তিম অসুস্থতায় শয্যাশায়ী হন, সেদিন জিজ্ঞেস করেন, 'আমি এখন কোথায় আছি? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব?' তিনি তার অসুস্থতার সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গভীর ভালোবাসার শেষ অভিব্যক্তি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা এভাবে বর্ণনা করেন,

> তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন আমার পালা ছিল। আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৮৫]

এসব ঘটনা সামনে রেখেই আনাস ইবনে মালিক বলেন যে, ইসলামের প্রথম গভীর ভালোবাসা ছিল আয়েশার প্রতি রাসূলের ভালোবাসা। ইমাম মাসরূক যখন আয়েশার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন,

> আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তমা, সপ্তম আকাশের উপর থেকে পবিত্রতার ঘোষণাপ্রাপ্ত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা।[৮৬]

আয়েশা রা.-এর প্রতি রাসূলের ভালোবাসার প্রকৃত কারণ

অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি রাসূলের এই অফুরন্ত ভালোবাসায় একজন অবাক না হয়ে পারেন না। প্রথমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই অন্যদের মনে করিয়ে দিতেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে।[৮৭] সন্দেহাতীতভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একজন আকর্ষণীয় নারী ছিলেন। একবার তার মা তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে,

---

[৮৫] বুখারী, *সহীহ*, জনাইয, ৯৪ (১৩২৩)।
[৮৬] বাইহাকী, *সুনান*, ২:৪৫৮; ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮ (৬৬)।
[৮৭] মুসলিম, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৮৩ (২৪৪২); নাসাঈ, *সুনান*, ইশারাতুন নিসা, ৩ (৩৯৪৪); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৮৮ (২৪৬১৯); বাইহাকি, *সুনান*, ৭:২৯৯ (১৪৫২৬)।

কিছুদিন অপেক্ষা কর! আল্লাহ তোমাকে পরম শান্তি দেবেন। আমি কসম করে বলছি, তোমার মতো সুন্দরী এ ধরাধামে নেই, স্বামীর কাছে তোমার মতো এত ভালোবাসাও কেউ পাবে না, অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও তোমার ভালো সম্পর্ক এবং যাকে কেউ দুর্নাম করার ইচ্ছাও করবে না। তবে এ রকম নারীকে কখনো কখনো অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়।[৮৮]

একইভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়ে হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি তাকে আয়েশার মতো নারীর সাথে প্রতিযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন অথবা দুঃখিত হতে নিষেধ করেছেন যা কিনা রাসূলের মনে বিশেষ আসনের অধিকারিণী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি একই আবেগের বহিঃপ্রকাশ।[৮৯]

সব বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি রাসূলের গভীর ভালোবাসার অন্যতম কারণ ছিল তার ধার্মিকতা। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পরিবারকে চমৎকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে আগলে রেখেছেন, এবং তিনি ছিলেন রাসূলের পরিবারে একজন বিচক্ষণ এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষিকা।

অনেকে রাসূলের বাহ্যিক আচরণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু আয়েশা তার বাহ্যিক এবং ব্যক্তিগত গোপন আমলও দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এভাবে তিনি কুরআনের একজন গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরবিদ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন এবং হাদীসের প্রধান শিক্ষিকার ভূমিকায় ঔজ্জ্বল্য ছড়াতে থাকেন। আর এ কারণেই তিনি ইসলামের জ্ঞানের বিকাশে বিশাল ভূমিকা রাখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের ইসলামের বিস্তারিত আহকাম-আরকান সম্পর্কে তার কাছে জানার আদেশ দেন। আয়েশা বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[৮৮] বুখারী, সহীহ, শাহাদাত, ১৫।
[৮৯] বুখারী, সহীহ, মাযালিম, ২৫ (২৩৩৬)।

> বিয়ের জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করা উচিত - সম্পদ, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারি। তবে তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দিবে যেন তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।[৯০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আগে আমল করেছেন এবং তারপর অন্যকে তা পরিস্থিতি সাপেক্ষে করতে বলেছেন।

রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত ছিলেন। এজন্য আয়েশার প্রতি রাসূলের বিশেষ আকর্ষণকে কেবলমাত্র সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অন্য স্ত্রীদের রূপ-লাবণ্যের কথা আয়েশা নিজেই বর্ণনা করেছেন। যেমন জুওয়াইরিয়াকে বনু মুসতালিকের যুদ্ধে যখন প্রথম দেখেন, তখন তার সৌন্দর্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মুগ্ধ হয়ে যান এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> তিনি ছিলেন এক লাবণ্যময়ী মহিলা। যে কেউ তাকে দেখলে মনে দাগ কাটত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মুক্তিপণ পরিশোধে তার সাহায্য কামনা করেন। আল্লাহর কসম! তাকে প্রথম দেখেই আমার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ তৈরি হয়। এজন্য তিনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাঁটা শুরু করলেন, আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।[৯১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন প্রথম সাফিয়্যাকে দেখেন, তখনো তার মনে একই রকম চিন্তার উদয় হয়েছিল। খাইবারের যুদ্ধে বিজয়ের পর সাফিয়্যা মদীনায় আগমন করেন এবং তিনি হারিসা ইবনে আন-নুমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে অতিথি হিসেবে ছিলেন। তিনি দ্রুত আনসার মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সবাই তাকে দেখার জন্য ভীড় করা শুরু করে। নিজের চেহারাকে ওড়নায় আবৃত করে এসব মহিলাদের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। কিছু সময় পর তিনি যখন সে বাড়ি

---

[৯০] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১৫২ (২৫২৩২)।
[৯১] হাকিম, *মুসতাদারক*, ৪:২৮ (৬৭৮১); ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:১১৬, ১১৭।

ত্যাগ করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে এক বিরাট গোত্রকে খুশি করা সম্ভব হবে যাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন। তবে তিনি তার স্ত্রীদের মনে কষ্ট দিতে চাননি। এজন্য প্রথমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এবং নেতিবাচক সাড়া পান।

এসব সমস্যা ভবিষ্যতে এড়ানোর জন্য এ বিষয়ে পুনঃচিন্তার প্রয়োজন ছিল এবং ভিন্নভাবে অগ্রসর হওয়া জরুরি ছিল। একটি গোত্রের আচরণ দিয়ে কোনো একক ব্যক্তিত্বকে বিচার করা ঠিক নয়। সমাজে যেমন ভালো লোক থাকে, তেমনি খারাপ লোকও থাকে। তারপরেও তারা একই আদমের সন্তান। এ ধারাকে পরিবর্তন করে পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন দেখা দিল। ভালো থেকেই ভালো হয় এবং ভালো কিছু কঠিন হৃদয়কে নরম করে দেয় যেমন করে পানির স্রোতে পাথরও ক্ষয় হয়ে যায়। প্রতিটি ঘটনাই সাহাবীদের নতুন করে উজ্জীবিত করত এবং ঈমানদার মায়েদের জন্য শিক্ষা হয়ে উঠত। আয়েশার দিকে ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব নমনীয়ভাবে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, 'হে আয়েশা, সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং তার এ পরিবর্তন খুব চমৎকার।'[৯২]

সব দিক থেকেই আয়েশা ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি যেন রাসূলের সব কাজে আঞ্জাম দেওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি দুবার জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সালাম আদান-প্রদান করেছেন। আয়েশার ঘরে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী ছিলেন অথবা তার সাথে ছিলেন, তখন ওহী নাযিল হয়েছে।[৯৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কথা এবং আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিন্তা করে তিনি ধরে নিলেন, এটা নিশ্চয়ই ঐশী ভালোবাসা। আমরা

---

[৯২] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:১২৬; যাহাবি, *সিয়ার*, ২:২২৭।
[৯৩] বুখারী, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৩০।

অবশ্যই তার অবদানকে রাসূলের জীবদ্দশায় বা পরে অস্বীকার করতে পারি না। আয়েশা রাসূলের দৃষ্টিতে এত সম্মানিত ছিলেন যে, একবার তিনি বললেন,

> পুরুষদের মধ্যে অনেকে কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জন করেছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। তবে গোটা নারী জাতির উপর আয়েশার মর্যাদা যাবতীয় খাদ্য সামগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদার মতো।[৯৪]

---

[৯৪] বুখারী, *সহীহ*, হাদীসুল আম্বিয়া, ৩৩ (৩২৩০)। 'সারীদ' রুটি-গোশতের একটি বিশেষ ধরনের খাবার যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব পছন্দ করতেন।

দাম্পত্যজীবন

পরম সুখের বাড়িটি ছিল শান্তি এবং পারস্পরিক ভালোবাসায় পূর্ণ। এ বাড়িতে আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করে গভীর ভালোবাসার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। এ বন্ধন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং তা আখেরাতের অনন্ত পথের দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

নিজের ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আয়েশা নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। আয়েশা ছিলেন পুরোপুরি অনুগত; তার ইচ্ছাকে পূরণ করেই নিজে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং একইসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন, তখন গভীরভাবে তার অভিব্যক্তিও খেয়াল করতেন। এটা তিনি রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তার নিজের মৃত্যু পর্যন্তও। প্রতি পদক্ষেপেই তিনি চিন্তা করতেন এবং যতটুকু তাকে বুঝতে পারতেন, তার উপর সিদ্ধান্ত নিতেন।

একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার জন্য একটি গদি কিনে আনেন। গদির উপর সুন্দর ছবি আঁকা ছিল। ছবির ব্যাপারে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিমত জানতেন না অথবা তিনি অঙ্কিত ছবি খেয়াল করেননি। প্রতিটি ঘটনা ঘটার একটি সঙ্গত কারণ ছিল। এর মধ্য দিয়ে একটি অজানা জিনিস জানা হবে এবং ছবির ব্যাপারে তার মতামতও পরিষ্কার হয়ে যাবে। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে এলেন, তিনি দরজার সামনে দাঁড়ালেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। উম্মুল মুমিনীন বিস্মিত হলেন এবং তখনই জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি কি গুনাহের কাজ করেছি?'

তার কথার আর্দ্রতায় অন্তরের দহনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল! তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন, সম্ভবত তিনি আল্লাহ এবং তার রাসূলের অপছন্দনীয় কোনো কাজ করেছেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন যে, তার কেনা এ নতুন গদি তিনি পছন্দ করেননি এবং এর কারণও ব্যাখ্যা করলেন,

> এসব ছবির চিত্রকরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তারা যেসব প্রাণীর ছবি এঁকেছে, তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে। এ ধরনের ছবিওয়ালা ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না (যে কোনো প্রাণীর ছবি)।

যখন আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিমত জানলেন, তখন তিনি ছবিযুক্ত গদিটি সরিয়ে ফেললেন যা তার ঘরে ফেরেশতাদের আগমনে বাধা হয়ে ছিল।[৯৫]

আয়েশা নিজেই তার ঘরের কাজ-কর্ম করতেন। কষ্ট করে নিজের হাতেই আটা পিষতেন এবং নিজেদের খাবার রান্না করতেন। ঘরের বিছানা-পত্র গোছাতেন এবং রাসূলের জন্য অযুর পানির ব্যবস্থা করতেন। কুরবানীর পশুর জন্য রশি পাকাতেন, কাপড় ধৌত করতেন, রাসূলের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন এবং কখনো কখনো মাথায় তেল দিয়ে দিতেন। তিনি রাসূলের মিসওয়াক দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে দিতেন এবং সব সময় সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন।

তিনি মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন, তাদের প্রয়োজন পূরণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহাবে সুফফার কয়েকজনকে এই পরম সুখের ঘরে নিয়ে আসেন।

তারপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আয়েশা! আমাদের কিছু খেতে দাও।'

---

[৯৫] মুসলিম, *সহীহ*, লিবাস, ৮৭ (২১০৭)।

ঘরে শুধু 'হাসিসাহ' সবজি রান্না করা ছিল এবং তিনি তা-ই মেহমানদের সামনে পেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবার বললেন, 'হে আয়েশা! আরও কিছু নিয়ে আস।'

মেহমানদের খুশি করা মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুশি করা এবং তাকে খুশি করা মানে আল্লাহকে খুশি করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা চান, তা কেমন করে তিনি না দিয়ে পারেন? কিন্তু বিষয়টি ছিল এমন, যেন হাওয়া থেকে খাবার প্রস্তুত করা। শেষ পর্যন্ত তিনি চিজ, খেজুর এবং তেল দিয়ে একটি খাবার প্রস্তুত করলেন। যখন আসহাবে সুফফার সাহাবীরা নিজেদের কিছুটা তৃপ্ত করতে পেরেছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আয়েশা! আমাদের কিছু পান করতে দাও।'

আয়েশা একটি বড় বাটিতে দুধ নিয়ে এলেন। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও দুধ চাইলেন। ঘরে সামান্য একটু দুধ অবশিষ্ট ছিল। এত বড় বাটিতে সেটা দেওয়া ঠিক হবে না। এজন্য আয়েশা ছোট একটি বাটিতে সেই সামান্য দুধটুকুও পরিবেশন করলেন।[৯৬] আয়েশা এমন এক পরিবার থেকে এসেছেন, তিনি ভালো করেই জানতেন যে, সামান্য কিছু যদি কাউকে দেওয়া হয়, সেটা আখেরাতে অনেক বেশি নেকীর কারণ হতে পারে এবং তিনি সেভাবেই মেহমানদের আপ্যায়ন করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আদর্শ জীবন-যাপন করতেন এবং তাদের নির্মল আনন্দদায়ক কর্ম-কাণ্ড উপভোগ করতেন। তিনি তাদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন আদর্শ স্বামী এবং পিতা ছিলেন। একদিন আয়েশা রাসূলের কাছে কিছু একটি বর্ণনা করছিলেন এবং তিনি কথার মাঝখানে হুরাফা শব্দটি ব্যবহার

[৯৬] আবু দাউদ, *সুনান*, আদাব, ১০৩ (৫০৪০); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৫:৪২৬ (৩৬৬৬)।

করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি জান হুরাফা মানে কী?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, আয়েশা এ ব্যাপারে জানেন না, এজন্য তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'হুরাফা একজন ব্যক্তির নাম। সে ছিল উযরা গোত্রের। ইসলামের আগে অন্ধকার যুগে অশুভ দেবতা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সে তাদের সাথে অনেক দিন অবস্থান করে এবং একদিন সে ছাড়া পায়। সে লোকদের অশুভ দেবতাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, যা সে সেখানে দেখেছে, বলতে থাকে। আর যারা তার এ গল্প শুনত, তারা এসব কথাকে 'হুরাফার কথা' বলে অভিহিত করত।'[৯৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তিম অসুস্থতার সময় প্রচণ্ড মাথাব্যথা অনুভব করতেন। তিনি জানতেন যে, খুব শীঘ্রই এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তিনি সবার জন্য মাগফেরাতের দুআ শুরু করলেন, শুধু যারা বেঁচে ছিলেন তাদের জন্যই নয়, বরং যারা কবরে চলে গিয়েছেন তাদের জন্যও। তাদের কবর যিয়ারত করে এসে তিনি আশা করতেন, হয়তো কালই তাদের সাথে দেখা হবে! একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাথাব্যথা শুরু হয় এবং তিনি বলে ওঠেন, 'হায় আমার মাথা!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি এভাবে আহাজারি করছ কেন?' মানে আমার ব্যথার তুলনায় তোমার ব্যথা কতটুকু!

তার কথাই সত্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর বললেন, 'তুমি যদি আমার সামনে মারা যেতে তাহলে আমি তোমাকে নিজ হাতে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতাম। তোমার জন্য মাগফেরাতের দুআ করতাম।'

এ রকম অপ্রত্যাশিত কথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চোখ বিস্ফারিত হলো। তিনি কি ঠাট্টা করছেন নাকি সত্যি সত্যিই বলছেন?

---

[৯৭] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১৫৭ (২৫২৮৩)।

তিনি দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব শান্ত এবং চোখে-মুখে দয়ার ছাপ। তিনি বুঝলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে ঠাট্টা করছেন। সুতরাং তিনিও রাসূলের সাথে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মরে যাই, তারপর আমাকে কবর দিয়ে আপনি এ ঘরে একজন নতুন স্ত্রী এনে ওঠাবেন!'[৯৮]

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হাসলেন। এটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি তার গভীর ভালোবাসারই প্রকাশ ছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাঝে মাঝে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়তেন। এ রকম একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরে আসেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটু উঁচু গলায় কথা বলছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যদিও তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ের পর থেকেই উম্মুল মুমিনীন হিসেবেই দেখতেন, তবু তিনি ছিলেন তার পিতা। তার মেয়ের কোনো আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পাবেন এটা ছিল তার সহ্যের বাইরে। এজন্য যখন তাকে এই অবস্থায় দেখলেন, তখন তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, 'হে অমুকের কন্যা! তুমি রাসূলের সামনে এত উচ্চ আওয়াযে কীভাবে কথা বলছ?'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কথা বলার সময় হাত উঁচু করে তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। মেয়ে হিসেবে তাকে শাসন করার অধিকার ছিল। নিজের মেয়ে রাসূলের কষ্টের কারণ হবে, তার জন্য এটা ছিল চরম বেদনাদায়ক। তারপর যখন বোধদয় হলো—তার এ আচরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন এবং তিনি স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ফেলেছেন—তখন লজ্জিত হলেন। বুঝতে পারলেন তিনি ভুল করছেন। কিন্তু একইসাথে তিনি মন্দ কাজকে প্রতিহত করার চেষ্টা ত্যাগ করতে পারছিলেন না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ আচরণ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তার মেয়ে কীভাবে রাসূলের সামনে এভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলে? তিনি রেগেই ছিলেন। কিন্তু

---

[৯৮] বুখারী, *সহীহ*,মারদা, ১৬ (৫৩৪২)।

রাসূলের উপস্থিতিতে আর কিছু বলতে পারেননি। তিনি রাসূলের আচরণ দেখে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চলে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন। তার পিতা ঠিকই বলেছেন, কারও জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উঁচু স্বরে কথা বলা ঠিক না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে লজ্জিত হয়ে তাকিয়েছিলেন।

এখন এই অবস্থা স্বাভাবিকভাবে শেষ হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদানবিধূর পরিস্থিতিকে আনন্দে পরিণত করতে চাইলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে যে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেদিকে ইশারা করে তিনি বললেন, 'দেখলে তো, আমি তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম?'[৯৯]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন খুব বিমর্ষ হয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। কয়েকদিন পর আবার যখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে আসেন, তখন তিনি পুরোপুরি বিপরীত দৃশ্য দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাচ্ছেন। আগের অস্বস্তিকর পরিবেশের পরিবর্তে সহসাই এত আনন্দঘন পরিবেশ তাকে বিস্মিত করল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মানুষের অভিব্যক্তি দেখে মনের ভাব বুঝতে পারতেন এবং এখানেও তিনি খুব দ্রুত এ পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকেই এ রহস্য সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। এজন্য হাসিমুখে বললেন, 'আপনাদের আনন্দে আমাকে শরীক করুন যেমন করে সমস্যার সময় শরীক করেছিলেন।'[১০০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের মান-অভিমান হাসি-ঠাট্টা করে স্বাভাবিক করে তুলতেন। কিন্তু কখনো কখনো মৌখিক বাক-বিতণ্ডা

---

[৯৯] আবু দাউদ, *সুনান*, আদব, ৯২ (৪৯৯৯), নাসাঈ, *সুনানুল কুবরা*, ৫:১৩৯ (৮৪৯৫)।
[১০০] প্রাগুক্ত।

অনেক দূর গড়াত। একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আটা এবং দুধ দিয়ে একটি খাবার তৈরি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিবেশন করেন। ঐ সময় সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা পাশে বসা ছিলেন। সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা খাবার খেতে অস্বীকার করলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে সাবধান করে বলেন, 'হয় আপনি খাবেন, না হয় আমি এগুলো আপনার চেহারায় লাগিয়ে দেব।'

সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা তারপরেও খেতে চাইলেন না। তাদের একই সময়ে বিয়ে হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আন্তরিকতাও বেশি ছিল। সম্ভবত এ কারণে সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন আচরণ করছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার সতর্কতাকে এবার ঠাট্টাতে পরিণত করলেন। তিনি সত্যি সত্যি কিছু খাবার সওদার চেহারায় মেখে দিলেন।

এ দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন যিনি সব সময় এসব জটিল পরিস্থিতিকে শান্ত করে তুলতেন। তিনিও কিছু খাবার হাতে নিয়ে সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমিও কেন একই কাজ করছ না?'
তখন সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহাও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চেহারায় কিছু খাবার মেখে দেন। এতে সবাই হেসে দিলেন।

তখন ঘরের বাইরে তারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গলার আওয়ায পেলেন। তিনি তার ছেলেকে ডাকছেন, 'হে আব্দুল্লাহ! হে আব্দুল্লাহ!'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি কাছাকাছি ছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা না করে কখনো ফিরবেন না। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মনে করলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশ করতে পারেন, তখন বললেন, 'চল, আমরা উঠি। তোমরা দুজন চেহারা ধুয়ে আস।'

এটা একটি হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ছিল এবং পরিবারের একান্ত পরিবেশে তা সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনা কাউকে বলারও প্রয়োজন ছিল না, এমনকি

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও, রাসূলের অন্তরে যার বিশেষ অবস্থান ছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ ঘটনার ব্যাপারে নিচের মন্তব্য করেন, 'উমরের প্রতি রাসূলের এ আচরণ দেখে আমি তখন থেকে উমর এলে সম্ভ্রম রক্ষা করে চলি।'[১০১]

কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রাগান্বিত হতেন। আর মাঝে মাঝে এ রাগের কারণ হতেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। একদিন তিনি এক বন্দী গোলামকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে রেখে চলে যান। অনেক মহিলাই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে দেখা করতে আসতেন এবং কথা বলতেন। তাদের সাথে কথা বলতে বলতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বন্দীর কথা ভুলে যান। আর এ সুযোগে লোকটি পালিয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সময় পরে আবার ঘরে ফিরে আসেন। এসে দেখেন যে, বন্দী গোলামটি নেই। তিনি খুব রাগ করলেন। গোলামদের আযাদ করে দেওয়া ছিল তার স্বভাবজাত অভ্যাস। সম্ভবত তিনি এই গোলামকেও আযাদ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। তবে এজন্য সময় নির্ধারিত ছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'হে আয়েশা! বন্দীর কী হলো? সে কোথায়?'

রাসূলের কথার জবাব দেওয়ার মতো শব্দ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ছিল না। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আমি অন্য মহিলাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

বন্দীকে ধরার কোনো পথ ছিল না। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আফসোস, তোমার হাত যদি ভেঙ্গে যেত!'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিপর্যস্ত করার জন্য রাসূলের রাগই যথেষ্ট ছিল। তিনি জানতেন, তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল। এজন্য পরিস্থিতি দায়ী নয়। তারপর

---

[১০১] আবু ইয়া'লা, *মুসনাদ*, ৭/৪৪৯।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হয়ে লোকজনকে ঐ বন্দীকে ধরে আনার জন্য বললেন। তাকে পাওয়া গেল এবং রাসূলের সামনে হাজির করা হলো। সমস্যা মিটে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরে এলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন তার নিজের হাত টান টান করে হাতের মুষ্ঠি একবার খুলছেন, আবার বন্ধ করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? তোমার কি অযু করতে হবে?'

'আপনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন। আমি অপেক্ষায় আছি, আমার কোনো হাত আগে ভাঙ্গে!'

এটা যেন শিশুকে বকা দিয়ে আবার মায়ের কোলে তুলে নেওয়া! তিনি রাসূলের অভিশাপের ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, আবার একই সময় এ অভিশাপকে তার জন্য দুআয় পরিণত করার আশায় ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর অনেক প্রশংসা করে দুআ করলেন,

> হে আমার প্রভু! আমি একজন মানুষ এবং আমি সাধারণ মানুষের মতোই রাগ করি। মহিলা অথবা পুরুষ, আমি যাকেই কোনো অভিশাপ দেই, আপনি সেটাকে তার জন্য দৈহিক এবং আত্মিক গুনাহ মোচনের কারণ বানিয়ে দিন।[১০২]

যে কোনো পারিবারিক সম্পর্কের মতো কখনো আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উত্তেজিত হতেন, আবার কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অসন্তুষ্টির কথা টের পেলেই তা চমৎকারভাবে মিটিয়ে ফেলতেন। একদিন তিনি বললেন, 'আমি কখন খুশি বা অখুশি থাকি তা তুমি যেমন বুঝতে পার, তেমনি তুমি কখন খুশি বা অখুশি থাক আমিও তা বুঝতে পারি।'

---

[১০২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৫২ (২৪২৫১)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কীভাবে সেটা জানেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন,

> তুমি অখুশি থাকলে কসম খাও 'ইবরাহীমের আল্লাহর কসম' বলে, আর খুশি থাকলে বল, 'মুহাম্মাদের আল্লাহর কসম'।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'সত্য। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি সত্য বলেছেন। তবে আমি কেবল মুখে আপনার নাম বর্জন করি (অন্তরে ঠিকই থাকেন)।'[১০৩]

একদিন এগারোজন মহিলা একত্রে বসে পরস্পর ওয়াদা করল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করবে তাতে কোনো কিছু গোপন রাখবে না। প্রত্যেকে তার স্বামীর সবচেয়ে পরিচিত গুণের কথা বলল। এগারোজনের মধ্যে কেউ কেউ তাদের স্বামীর প্রশংসা করল, আবার অনেকে তাদের স্বামীর খারাপ আচরণের তালিকা বলল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব সতর্কতার সাথে শুনলেন; মাঝে মাঝে তিনি হাসতেন, আবার কখনো কষ্ট পাচ্ছিলেন। সবশেষে যখন উম্মে জরা এর পালা এল, তখন তিনি বললেন যে, তিনি এক মেষপালকের মেয়ে ছিলেন। তারপর আবু জরা তাকে বিয়ে করেন। আবু জরা তার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছে এবং সব রকমের আনন্দই তারা উপভোগ করেছে। সে তার শাশুড়ি, দাসী এবং আগের ঘরের এক ছেলেরও অনেক প্রশংসা করল। কিন্তু তার এই প্রিয় স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে এবং পরে তিনি আরেক পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তার নতুন স্বামী ভালো এবং বিনয়ী, কিন্তু আগের স্বামীর তুলনায় নতুন স্বামীর গুণাগুণ সমান না। যদিও আবু জরা তাকে তালাক দিয়েছে, তবু তাকে তিনি ভুলতে পারছেন না। নতুন স্বামীর ভালো আচরণের কারণে আবু জরাকে হারানোর বেদনা তাকে ম্রিয়মাণ করতে পারেনি।

---

[১০৩] বুখারী, সহীহ, নিকাহ, ১০৭ (৪৯৩০)।

যদিও অন্যান্য মহিলারাও তাদের স্বামীর বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছিল, কিন্তু উম্মে জরার কথা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং পরবর্তীতে তিনি সেটা রাসূলের সাথে বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আবু জরা এবং উম্মে জরার মধ্যে যেমন সম্পর্ক, তোমার আমার মধ্যেও একই সম্পর্ক। কেবল একটি পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে, আবু জরা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল, কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেব না।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি আমার জন্য আবু জরা থেকে উত্তম।'[১০৪]

আনন্দ-উৎসব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দোষ আনন্দ-উৎসবের অনুমতি দিতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন তার ঘরে আসেন, তখন কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান হয়নি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আয়েশা! তোমাদের নিকট আমোদ-আনন্দের কিছু ব্যবস্থা কি ছিল না? মদীনাবাসী আমোদপ্রিয়।'[১০৫]

কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের সদস্যদের খেলাধুলা উপভোগ করার সুযোগ দিতেন। পরবর্তীতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালে আমি হাবশী লোকদের পালোয়ানির কসরত দেখছিলাম। আমি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত তা দেখতেই থাকি।'[১০৬]

একবার ঈদে এক দল তীর-ধনুক নিয়ে লোকজনকে আনন্দ দিতে এল। লোকেরা সবাই জমা হয়ে তাদের ঘিরে রেখেছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

---

[১০৪] বুখারী, সহীহ,নিকাহ, ৮২ (৪৮৯৩)।
[১০৫] বুখারী, সহীহ,নিকাহ, ৬৩ (৪৮৬৮)।
[১০৬] বুখারী, সহীহ,আঈদাইন, ২ (৯০৭)।

আনহা কাছাকাছি গিয়ে তা দেখতে চাইলেন। তিনি যেহেতু সবার পেছনে ছিলেন, এজন্য কি হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি রাসূলের দিকে ফিরে বললেন যে, তিনি তা দেখতে চাচ্ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সত্যিই তা দেখতে চাচ্ছ?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাথা নাড়ালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে নিজের পিঠে ওঠালেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার গাল রাসূলের গালের সাথে লেগেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন, 'হে বনু আরফিদি! আস!'

কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি দেখা হয়েছে?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সম্মতিতে মাথা নাড়ালেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি এখন ফিরে যেতে পার।'[১০৭]

এটা সত্য যে, যখন এ ধরনের নির্মল আনন্দের সীমা অতিক্রম করত, তখন তিনি বাধা দিতেন। তিনি সব সময় এটাকে একটি শোভনীয় পর্যায়ের মধ্যে রাখতেন। একদিন এক মহিলা বাদক আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য বাজনা বাজাতে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! তুমি কি তাকে চেন?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অপরিচিত মেয়ের দিকে তাকিয়ে না বললেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, সে কোনো এক গোত্রের বাদক। তারপর বললেন, 'তুমি কি তার গান শুনতে চাও?' স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু কেউ কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাবকে না করে না, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও বললেন, 'হ্যাঁ।'

নিজের বাদ্য বের করে মেয়েটি তা বাজাতে থাকল। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায়

---

[১০৭] প্রাগুক্ত।

অসন্তোষের ছাপ লক্ষ্য করলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর আগেও একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিরক্তির চেহারা দেখেছেন যখন দুজন কম বয়সী মেয়ে তার ঘরে নাচছিল। যখন কেউ সীমা অতিক্রম করে, তখন স্বভাবতই সাবধানবাণী আসে। এখন এই বাদকের গান এবং আচরণ কোনোটাই দৃঢ় বিশ্বাসীদের সাথে খাপ খাচ্ছিল না। একটু পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শয়তান তার নাকের ছিদ্রে বাদ্য বাজায়।'[১০৮]

প্রতিযোগিতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চারিদিকের লোকজনের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করতেন এবং সেভাবেই পদক্ষেপও নিতেন। এটা ছিল তার সাধারণ একটি নিয়ম এবং তিনি লোকজনকে তা করতে বলতেন, 'সমাজের দুর্বলদের খোঁজখবর নাও।'[১০৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন এবং কোন পরিস্থিতিতে কী কাজ করতে হবে, তা জানতেন। তিনি নবুওয়তের সবচেয়ে সংবেদনশীল কাজের দায়িত্বে ছিলেন এবং তা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তার পরিবারকে নিজের মতো উচ্চ সতর্কতার মধ্যে ফেলেননি। সাধারণ মানুষ হিসেবে এটা তাদের জন্য বহন করাও সম্ভব ছিল না। তিনি তাদের জীবনকে সহজ করারও চেষ্টা করতেন।

একবার এক অভিযানে রাসূলের সাথে সফরসঙ্গিনী হিসেবে লটারিতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নাম ওঠে। সফরের একপর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে আগে চলার নির্দেশ দিয়ে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে পেছনে থেকে যান। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এস, আমরা দৌড়াই। দেখি কে আগে যেতে পারে।'

---

[১০৮] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৩:৪৪৯ (১৫৭৫৮)।
[১০৯] আযলুনি, *কাশফ আল-খাফা*, ২:৫০৩।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন হালকা পাতলা এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি জিতে গেলেন। কয়েক বছর পর, তারা আবার কোনো এক সফরে একসাথে যাচ্ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে আগের প্রতিযোগিতার কথা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোলেননি এবং আবার তার সাথীদের আগে চলার নির্দেশ দিয়ে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে পেছনে থেকে যান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এস, আমরা দৌড়াই। দেখি কে আগে যেতে পারে।'

আগের মতোই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করলেন। তারা আবার দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলেন। কিন্তু এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিতে গেলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ওজন বেড়ে গিয়েছিল এবং দৌড়ের গতিও কমে গিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে হেসে বললেন, 'এ হচ্ছে ঐ দিনের বদলা!'[১১০]

---

[১১০] আবু দাউদ, জিহাদ, ৬৮ (২৫৭৮); আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬:৩৯ (২৪১৬৪)।

উপনামের প্রস্তাব

একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের কাছে তার একটি উপনাম রাখার জন্য আবেদন করলেন। জন্মের পরে যে নাম রাখা হতো আরবে প্রাপ্তবয়স্করা সে নামে পরিচিত হতো না, বরং তাদের কারও সাথে সম্পর্ক করে ডাকা হতো। এটা ছিল একটি সাধারণ নিয়ম এবং সমাজে প্রতিপত্তি ও গৌরবের বিষয়। উপনামের কারণে লোকজনের মধ্যে সৎগুণের প্রতিযোগিতা হতো। অনেকে উপনামে এত বেশি পরিচিত ছিল যে, লোকেরা তাদের আসল নামই ভুলে যেত।

সাধারণত তাদের ঘরে প্রথম সন্তানের নামানুসারে উপনামগুলো দেওয়া হতো; একজন পিতাকে বলা আবু (অমুক) এবং মায়ের ক্ষেত্রে বলা হত উম্মে (অমুক)। আর যাদের ছেলে-মেয়ে ছিল না, তাদের বলা হতো ইবনে (অমুক) অথবা বিনতে (অমুক)।

বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে অনেক নাম ধরেই ডাকতেন। যেমন : হুমাইরা, উওয়াইশ, আইশ, বিনতে সিদ্দীক, মুওয়াফফিকা এবং বিনতা আবু বকর। কিন্তু এর কোনোটাই তার স্থায়ী ডাকনাম ছিল না। তিনি যাদের চিনতেন সবারই যেহেতু ডাকনাম ছিল, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও নিজের একটি ডাকনামের আশা করলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কষ্টে বিলাপের মতো উচ্চারণ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সব বান্ধবীদের একটি উপনাম আছে!'

যদিও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি, তবু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নীরব অনুরোধ বুঝলেন, তিনি একটি উপনাম চাচ্ছেন। সম্ভবত কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই

সবচেয়ে বিনয়ী পদ্ধতি। সম্ভবত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একটি সন্তান আশা করছিলেন, তাহলে এমনিতেই তিনি উপনাম পেয়ে যাবেন। এবং এই সন্তানের মাধ্যমে রাসূলের বংশধারা অব্যাহত থাকবে।

সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মর্মভেদী অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সন্তান তার ভাগ্যে নেই। তার তিনটি ছেলে সন্তানই শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেছেন এবং চার মেয়ের তিন মেয়েই তাদের অনুসরণ করেছে। রুকাইয়া বদরের যুদ্ধের দিন ইন্তেকাল করেছে এবং উম্মে কুলসুম ও যায়নাব—দুজনের কেউই আর বেঁচে নেই।

রাসূলের মতো একজন প্রচণ্ড বোধশক্তিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী মানুষ সহজেই এসব ঘটনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সম্ভবত আল্লাহর ফায়সালা এমনই - মৃত্যুর পরে তার কোনো সন্তান বেঁচে থাকবে না।

এটা খুব দয়া এবং কোমলভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলা প্রয়োজন ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যেন তার উত্তর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দুঃখিত না করে, এজন্য বললেন, 'তাহলে তুমি তোমার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহর উপনাম গ্রহণ করতে পার।'

রাসূলের কথায় এটা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, তোমার জন্য পথ বন্ধ। প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সহজেই তা বুঝলেন এবং পরবর্তীতে আর এমন অনুরোধ করেননি। তখন থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের উপনামে ডাকা হতো এবং তার নাম হয়ে গেল উম্মে আব্দুল্লাহ।[১১১]

---

[১১১] আবু দাউদ, *সুনান*, আদাব, ৭৮ (৪৯৭০); আহমাদত ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২৬০ (২৬২৮৫)।

সূক্ষ্মদর্শিতা

মানবতাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছিলেন। তার আদর্শে তার স্ত্রীগণ সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার সব নির্দেশ ও উপদেশ এবং কাজ ও আচরণ দেখে তারা উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং তা অন্যদের কাছে বর্ণনাও করতেন। তারা আত্মিক চরিত্রের হিকমত বুঝতে পেরেছিলেন এবং দৃঢ় মনোবল অর্জনের নতুন পথ পেয়েছিলেন। যারাই তাদের পরম সুখের ঘরে আসতেন, যা কিছু হাদিয়া নিয়ে আসতেন অথবা এখানকার প্রতিটি ঘটনাতেই একজন আদর্শ নবীর উন্নত বিবেক ও চরিত্রের প্রকাশ ঘটত, কুরআনে বর্ণিত মানবিক আচরণের সর্বোত্তম আদর্শ প্রতিফলিত হতো।

এক রাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজ হাতে আটা পিষে রাসূলের জন্য সামান্য কিছু রুটি তৈরি করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বুঝলেন আল্লাহর রাসূল এখন বিশ্রাম নেবেন। ঘুমানোর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় পানির পাত্র ঢেকে রাখতেন, বাটিতে খাবার থাকলে তাও ঢেকে রাখতেন এবং আলো জ্বললে তা নিভিয়ে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুয়ে পড়লে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ঘুম অনুভব করেন এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমের মধ্যেই শীত অনুভব করলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোলে মাথা রাখেন এবং আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

এর মধ্যে পাশের বাড়ির একটি ছাগল এসে রুটি খেয়ে ফেলে। আয়েশা যেখানে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে ছাগলটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তার নড়াচড়ায় রাসূলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এজন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠে ছাগল ধরার জন্য দৌড় দিতে উদ্যত হন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিৎকার করে বলেন, 'রুটির জন্য ছাগলকে কষ্ট দিয়ে তুমি পড়শিকে কষ্ট দিও না।'[১১২]

তখনকার দিনে গুইসাপের গোশত খাওয়ার প্রচলন ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা খেতে পছন্দ করতেন না। তবে এ গোশত খাওয়া হালাল ছিল এবং রাসূল সাহাবীদের তা জানিয়েও দিয়েছিলেন।[১১৩] একদিন গুইসাপের গোশত হাদিয়া এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেলেন না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'এটা কি আমি দরিদ্রদের দিয়ে দেব?'

তার নিয়ত খুব পরিষ্কার ছিল; নিজেরা না খেলে তা অন্যকে দিয়ে দিলেই তো ভালো, যেহেতু তা খাওয়াও জায়েয। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে অনুমতি দিলেন না। তিনি এমন একটি বিষয় চিন্তা করছিলেন যা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাথায় ছিল না। তিনি মানুষের মধ্যে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চাননি। যে খাবার তিনি নিজেই পছন্দ করছেন না, অন্যরা তা পছন্দ নাও করতে পারে। তিনি যা পছন্দ করেন না তা অন্যদের দিতে পারেন না। এজন্য তিনি আয়েশাকে বললেন, 'না। যা তুমি নিজে খেতে পার না তা অন্যকে কখনো হাদিয়া দিও না।'[১১৪]

ইবাদত–বন্দেগী

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আদর্শ জীবন কাটিয়েছেন। তিনি একজন অতি উচ্চ মর্যাদার ইবাদতগুজার ছিলেন। রাসূলের জীবদ্দশায় এবং তার ইন্তেকালের পরেও তার ইবাদত-বন্দেগী একই রকম

---

[১১২] বুখারী, *সহীহ*, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১:৫৪ (১২০)।
[১১৩] বুখারী, *সহীহ*, তামান্নি, ১৫; মুসলিম, *সহীহ*, সাঈদ, ৪২।
[১১৪] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১২৩ (২৪৯৬১)।

ছিল। একজন মানুষ হিসেবে আল্লাহর প্রতি ইবাদত-বন্দেগীতে রাসূলের মহব্বত দেখেছেন এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় আশেক হিসেবেই তার মধ্যে যাবতীয় আচরণ ফুটে উঠত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন যিনি ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে নিকটের, আল্লাহর ব্যাপারে যার জ্ঞান ছিল সবচেয়ে বেশি এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ও রাসূল। রাতে ইবাদত করতে করতে তার পা ফুলে যেত। এক রাকাত নামাযে তিনি কুরআনের শত শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। নামাযে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, একই সময় তিনি রুকু-সেজদায় কাটাতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলতে পারব না যে, তার নামায কত সুন্দর ছিল!'[১১৫]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শত শত মোজেজার সাক্ষী; এমনকি তিনি ওহী নাযিল হওয়ার ঘটনা দেখেছেন যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে রাসূলের কাছে এসেছেন। তিনি জীবনকে একটি গাছের নিচে পথিকের সামান্য সময় বিশ্রামের মতোই দেখতেন। তিনি দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতমুখী করেছিলেন। দুনিয়ার কোনো কিছুই তাকে আকর্ষণ করত না, তার কাছে এসবের কোনো মূল্যও ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আখেরাতের জীবনকেই দামী মনে করতে শিখিয়েছিলেন। যে নয় বছর তিনি রাসূলের সাথে কাটিয়েছিলেন, প্রতি পদক্ষেপে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেছেন এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের এশার নামায পড়ে ঘরে এলেন। মিসওয়াক করলেন। শুয়ে পড়লেন। মধ্যরাত্রির দিকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়লেন। এ নামায কেবল তার জন্যই ফরয ছিল। রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে

---

[১১৫] বুখারী, সহীহ, তাহাজ্জুদ, ১৬; মানাকিব, ২১।

ডেকে তুললেন এবং নামায পড়তে বললেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জেগে বেতের নামাযসহ তাহাজ্জুদ পড়লেন।[১১৬]

মাঝে মাঝে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সাথে সারারাত ধরে ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। এ রকম এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকাতে সূরা আল-বাকারা, সূরা আল-ইমরান এবং আন-নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি আল্লাহর শাস্তির আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। আবার যখন কোনো সুসংবাদের আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন আল্লাহর কাছে রহমত চাইতেন।[১১৭]

ফজরের নামাযের আগে তিনি দুরাকাত নামায পড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন অথবা আযান হওয়া পর্যন্ত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে গল্প করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরে থেকেই মসজিদের জামাতে শরীক হতেন যেহেতু মসজিদের দেয়াল ঘেঁষেই তার ঘর ছিল। মূলত তার রাত সকাল থেকে বেশি উজ্জ্বল ছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সাথে রোযাও রাখতেন। রমযানের শেষ দশ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ইতেকাফ করতেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘরে থেকে নামাযে শরীক হতেন। মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে একটু জায়গায় চাদর দিয়ে ঘেরাও করে নিতেন এবং জামাতে নামায পড়িয়ে সেখানে ইতেকাফে মশগুল থাকতেন।[১১৮]

বিদায় হজের সময় তিনি রাসূলের সাথে ছিলেন। তিনি দেখেছেন কত বিরাটসংখ্যক সাহাবীদের উপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বিদায় জানিয়েছেন। এ হজের সময় তিনি হায়েয অবস্থায় ছিলেন এবং এ উম্মত জানতে পেরেছে কীভাবে এ অবস্থায় হজের আহকামগুলো পালন করতে হয়।[১১৯]

---

[১১৬] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৫৫ (২৪৩২০)।
[১১৭] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৯২ (২৪৬৫৩)।
[১১৮] বুখারী, *সহীহ*, ইতেকাফ, ১৮ (১৯৪০)।
[১১৯] বুখারী, *সহীহ*, হজ, ৭৬ (১৫৫৭)।

সরাসরি রাসূলের কাছ থেকে ইবাদতের পদ্ধতি শিখে তা পরবর্তীতে অন্যকে শেখানো, বিস্তারিতভাবে তা উপস্থাপন করাসহ নিজে এর উপর আমল করেছেন।

একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে কায়িসকে বললেন, 'রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে অবহেলা করো না। রাসূল জীবনে কোনোদিন তাহাজ্জদু নামায ছেড়ে দেননি। যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন অথবা খুব ক্লান্ত ছিলেন, তখন বসে হলেও তা আদায় করেছেন। কিন্তু কখনই তা থেকে বিরত হননি।'[১২০]

নফল নামাযের বেলায়ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব সচেতন থাকতেন। যদি কখনো তা ছুটে গেছে, পরে তা আদায় করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখে তিনি তা নিজের জন্য জরুরি করে নেন এবং তা বাদ দিতেন না।[১২১]

একদিন খুব সকালে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তার কাছে আসেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তখন ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ছিল না এবং রাতের নামাযের সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কাসিম জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোন নামায পড়ছেন?'

নেক কাজ লুকানোর ভঙ্গিতে তিনি জবাব দিলেন, 'আমি গত রাতে নিয়মিত নফল নামায পড়তে পারিনি। এখন সেটা কাযা আদায় করছি।'

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মূসা একবার তাকে ইসলামের মৌলিক কিছু বিষয়ে জানতে আসেন। তিনি যখন আসেন, তখনো আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চাশতের নামাযে ছিলেন। তিনি খুব জোরে বলে উঠলেন, 'আমি আপনার নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকব।' আশেপাশের লোকজন তার কথা শুনল। তারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দীর্ঘ নামাযের কথা জানতেন। তারা বললেন, 'হায়! পাগল।'[১২২]

---

[১২০] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১২৫ (২৪৯৮৯)।
[১২১] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১৩৮ (২৫১১২)।
[১২২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১২৫ (২৪৯৮৯)।

যিনি অপেক্ষায় ছিলেন, স্বভাবতই তাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন নামাযের দাঁড়াতেন, তখন তিনি আল্লাহর ধ্যানে এত বেশি মগ্ন হয়ে যেতেন যেন দুনিয়ার সাথে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কঠোর তপস্বী জীবন-যাপন করতেন। তিনি সকাল হওয়া পর্যন্ত সারারাত ইবাদত করতেন এবং দিনে রোযা রাখতেন। তিনি যখন কোনো শাস্তির আয়াত পড়তেন, তখন থেমে যেতেন। আবার শুরু থেকে পড়তেন যেন মনে আরও বেশি ভয় অনুভব করেন। তার কাছাকাছি লোকজন দেখত যে, তার স্কার্ফ চোখের পানিতে ভিজে যেত।

একদিন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন,

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۝٢٧

> অতঃপর আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (সূরা তুর, ৫২:২৭)

এই আয়াত পড়ার সময় তিনি তার কান্নাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না এবং একপর্যায়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। এখানে যারা নেক আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তিতে রেখেছেন, তাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আখেরাতে তার জীবন নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন এবং এ ধরনের রহমত পাওয়ার ব্যাপারে একদম নিশ্চিত ছিলেন না। এ আয়াত পড়ার সময় তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে রহম করুন এবং আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেন।'[১২৩]

তার ভাগ্নে এবং ছাত্র উরওয়া তাকে এ অবস্থায় দেখলেন এবং তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বাজারে জরুরি কাজে চলে যান। তিনি বলেন, 'আল্লাহর

---

[১২৩] ইবনে আবি শাইবা, *মুসান্নাফ*, ২:২৫ (৬০৩৬)।

কসম! বাজারে আমার কাজ শেষ করে ফিরে এসে দেখি. তিনি ঐ একই আয়াত কান্নারত অবস্থায় তিলাওয়াত করছেন।'[১২৪]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সব সময় ঘরে থেকে জামাতের নামাযে শরীক হতেন অথবা অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে পড়তেন।

রোযা রাখার ব্যাপারে তার পছন্দ একইরকম ছিল। তিনি প্রায় প্রতিদিনই রোযা রাখতেন।[১২৫] একবার আরাফার দিনে (ঈদুল আযহার আগের দিন) প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। তার ভাই আব্দুর রহমান তাকে দেখতে এলেন। যখন আব্দুর রহমান এই গরমের মধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার রোযা রাখার কথা শুনলেন এবং তাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও কাহিল অবস্থায় দেখলেন, তখন বলে উঠলেন, 'তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল না কেন?'

কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পদে পদে অনুসরণ করতে চাইতেন, বললেন, 'আমি কেমন করে রোযা ভাঙ্গব যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আরাফার দিনের রোযা গত বছরের গুনাহের কাফফারা।'' [১২৬]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মিনার দিনগুলোতেও রোযা রাখতেন; যদিও ঐ সময় খাওয়া এবং পানাহার জায়েয ছিল,[১২৭] তিনি কখনই রোযা ছাড়তেন না, এমনকি সফরে থাকলেও যখন রোযা ভাঙ্গার অনুমতি রয়েছে।[১২৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সাথে বিদায় হজে ছিলেন। তার মৃত্যুর পরও তিনি বেশ কয়েকবার মক্কা শরীফে হজের সফরে গিয়েছেন। তখন তিনি অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

---

[১২৪] প্রাগুক্ত।
[১২৫] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৬৮।
[১২৬] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১২৮।
[১২৭] বুখারী, *সহীহ*, সওম, ৬৭ (১৮৯৩)।
[১২৮] আব্দুররাজ্জাক, *মুসান্নাফ*, ২:৫৬০-৫৬১ (৪৪৫৯-৪৪৬১); বাইহাকী, *সুনান*, ৪:৩০১ (৮২৬৬)।

ইসলামের শুরুর দিকে হজে কাবায় বেশি লোকের সমাগম হতো না। পরবর্তীতে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কাবার একটু দূর দিয়ে বড় সার্কেল করে খুব সতর্কতার সাথে তাওয়াফ করতেন যেন পুরুষের সাথে ধাক্কা না লাগে। এটা করতে সময় বেশি লাগত এবং তার কষ্টও বেশি হতো। কিন্তু এরপরেও তিনি একাকী তাওয়াফের চেষ্টা করতেন। আর যখন তিনি দেখতেন যে, লোকের সমাগম বেড়ে গেছে, তখন তিনি চক্কর বড় করতে করতে একবারে সাবির পর্বতের মাঝামাঝি চলে যেতেন।[১২৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতি পদে পদে অনুসরণ করা তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দিকে তিনি মিনায় 'নিমারা' এলাকায় তাঁবু গাড়তেন। পরবর্তীতে লোকজন বেড়ে গেলে তিনি দূরে 'আরাক' এলাকায় তাঁবু সরিয়ে নিয়েছিলেন। কখনো কখনো তিনি সাবির পাহাড়ের মধ্যে তাঁবু গাড়তেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উমরার ব্যাপারেও খুব গুরুত্ব দিতেন। মুহাররমের চাঁদ দেখার আগেই তিনি জুহফায় চলে যেতেন এবং সেখানে চাঁদ ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। চাঁদ দেখা গেলে নিয়ত করে তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওনা হয়ে যেতেন।[১৩০]

সংযম ও বিনয়

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ধর্মীয় কাজ-কর্ম ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে নিজেকে জড়িত করতেন না এবং কারও ভুলের জন্য তার পেছনে লেগে থাকতেন না। রাসূলের হাজার হাজার হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোথাও কোনো বিকৃত বা নেতিবাচক অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি অন্যকে হেয় করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন এবং মানুষের পরিষ্কার ভুলকে ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। যখন হাসান ইবনে সাবিতকে কোনো এক কারণে ইসলামী আইনে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো

---

[১২৯] মালিক, *মুয়াত্তা*, হজ, ১৩ (৭৫০)।
[১৩০] প্রাগুক্ত।

এবং তিনি নিজেকে খুব অপরাধী ভাবতে লাগলেন, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই বৃদ্ধ সাহাবীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আপনি এত মন্দ নন যা আপনি ভাবছেন।'[১৩১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হাসানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, যদিও কয়েক বছর আগে হাসান তাকেই একই ধরনের কথা বলে কষ্ট দিয়েছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে অপমান করেননি কিংবা তার অমঙ্গল চেয়েছেন। যারা তার বিরুদ্ধে কাজ করেছে, আমৃত্যু তিনি তাদের জন্য ছিলেন উত্তম ক্ষমার আদর্শ। একদিন তার ভাতিজা এবং ছাত্র উরওয়া জনসম্মুখে হাসান ইবনে সাবিতকে অভিযুক্ত করেন। এতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব রেগে যান এবং বলেন, 'তাকে দোষী বলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।'[১৩২]

যখন তার কাছে লোকজন এসে মৃত কারও সম্পর্কে গল্প শুরু করত অথবা গীবত করত, তখন তিনি দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করতেন এবং যার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তার জন্য মাগফেরাতের দুআ করতেন। তিনি বলতেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃতদের সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ বলবে না।'

তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। এক দিন তিনি পথ চলার সময় ঘণ্টা বাজার শব্দ পেলেন এবং সেখানেই থেমে গেলেন। ঘণ্টার শব্দ অপ্রীতিকর এবং তিনি তা শোনা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ শব্দ অপছন্দ করতেন। একটু পর তিনি পেছন দিক থেকে একই শব্দ পেলেন, তখন নিজেকে শব্দের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলেন।[১৩৩]

তার কাছে আশ্রিত এক এতিম একদিন ব্যাকগেমন (Backgammon) খেলার মতো একটি খেলনা নিয়ে আসে। ব্যাকগেমন হচ্ছে বিশেষভাবে

---

[১৩১] বুখারী, *সহীহ*, মাগাযি (যুদ্ধাভিযান), ৩২ (৩৯১৫)।
[১৩২] মুসলিম, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবা, ১৫৫ (২৪৮৮)।
[১৩৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১৫২ (২৫২২৯)।

প্রস্তুত পট্টিকার অক্ষ ও ঘুঁটি নিয়ে দুজন খেলোয়ারের জন্য ক্রীড়াবিশেষ। তিনি এতে খুব রাগ করলেন এবং তাকে এই বলে সংবাদ পাঠালেন, 'হয় তুমি এটা ফেলে দেবে, আর না হয় আমি এসে তোমাকে বের করে দেব।'[১৩৪]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্ন দেখে অনেক সময় বিব্রত হতেন। তিনি স্বপ্নকে একেবারে অর্থহীন মনে করতেন না, বরং তিনি চিন্তা করতেন যে, হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এতে নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রয়েছে। একটি স্বপ্ন দেখে পরদিন তিনি কখনো সাদাকা করতেন অথবা কোনো গোলামকে আযাদ করে দিতেন।[১৩৫]

তিনি সাধারণত খুবই সামান্য উসিলায় গোলাম আযাদ করে দিতেন। একবার তিনি কারও সাথে কোনো কাজের ওয়াদা ভঙ্গ করেছিলেন। এর বদলা হিসেবে তিনি চল্লিশজন গোলাম আযাদ করে দেন। তারপরেও তিনি নিজেকে মাফ করতে পারছিলেন না এবং সারাজীবন এজন্য আক্ষেপ করেছেন। তার অধীনে তামীম গোত্রের এক দাসী ছিল। এ গোত্রের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, তারা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর। এটা মনে হতেই তাকে আযাদ করে দেন।[১৩৬]

তার এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ত্যাগের কথা সবাই জানত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সর্বমোট ৬৭ জন দাস-দাসী আযাদ করেছিলেন।[১৩৭]

তিনি সবার সাথেই কথা বলতেন এবং কাউকে ছোট করে দেখতেন না। একদিন এক ব্যক্তি খাবার চাইলে তিনি তাকে একটি ছোট ব্যাগে রুটি দেন। লোকটি চলে যাবার পর আরেকজন আসে। পরেরজন দেখতে ছিলেন বিধ্বস্ত এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

---

[১৩৪] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:৪৩৫ (১২৭৪)।
[১৩৫] হিশামী, *মাযমুআতুয যাওয়াইদ*, ১:৪৮৪ (৪১৯)।
[১৩৬] বুখারী, *সহীহ*, ইতক, ১৩ (২৪০৫)।
[১৩৭] সানানি, *সুবুলুস সালাম*, ৪:১৩৯।

তাকে কাছে ডাকলেন এবং তার নিজের খাবারটুকু তাকে খেতে দিলেন। লোকটি চলে যাবার পর কেউ তাকে এ রকম করার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, 'আমি কেমন করে এর ব্যতিক্রম করব যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অবস্থা অনুযায়ী লোকদের সাথে ব্যবহার কর।''[১৩৮]

যত কষ্টই হোক, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মিতব্যয়ী জীবন কাটাতেন এবং কখনো কাউকে সাহায্যের বিনিময়ে কোনো অনুগ্রহের আশা করতেন না। তিনি যে কোনো কিছু নষ্ট করতে চাইতেন না। তিনি আশা করতেন, তার আশেপাশে পরিচিতরা তার একই জীবন-যাপন করুক। তিনি কখনই তার এ অনাড়ম্বর জীবনের জন্য আফসোস করতেন না। তিনি নিজেই আখেরাতের জন্য দুনিয়ার এ সব কষ্টকে বেছে নিয়েছিলেন।

এ পছন্দের পেছনে দরিদ্রতা কারণ ছিল না, কারণ যখন প্রাচুর্য ছিল, তখনো তিনি একই জীবন-যাপন করতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যাগ ভর্তি স্বর্ণ পাঠালে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নিকটস্থ লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তারপরেও তিনি তার কাজকে যথেষ্ট মনে করতেন না, তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন এমন নেয়ামতের মুখোমুখি যেন তাকে আর না হতে হয়।[১৩৯]

তার একজন বিশিষ্ট ছাত্রী, আয়েশা বিনতে তালহা, বলেন, 'আমরা যারা তার কাছাকাছি ছিলাম, বৃদ্ধ এবং যুবক, বিভিন্ন এলাকা থেকে তার কাছে আসতাম, চিঠি লিখতাম এবং সামর্থ্য অনুযায়ী হাদিয়া নিয়ে আসতাম। আমি এগুলো তার কাছে পেশ করে বলতাম, এ চিঠি অমুক পাঠিয়েছে এবং এটা তার হাদিয়া।' তিনি তখন আমাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় কন্যা, হাদিয়াসহ তার চিঠির জবাব দাও। যদি তোমার কাছে হাদিয়া দেওয়ার মতো কিছু না থাকে, তাহলে আমি তোমাকে তা দেব।' তারপর তিনি পাঠাবার জন্য আমাকে হাদিয়া দিতেন।'[১৪০]

---

[১৩৮] আবু দাউদ, *সুনান*, আদব, ২৩ (৪৮৪২)।
[১৩৯] হাকিম, *মুসতাদারক*, ৪:৯ (৬৭২৫)।
[১৪০] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:৩৮২ (১১১৮)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইচ্ছাশক্তি ছিল বিস্ময়কর। প্রিয় মানুষেরা অথবা পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি - কোনো কিছুই তার এ ইচ্ছাশক্তিকে পরিবর্তন করতে পারত না। তিনি কখনই অন্যের সাথে ভালো আচরণ করা পরিত্যাগ করেননি। এমনকি যারা তার সাথে মন্দ আচরণ করত, মানুষকে কষ্ট দিত অথবা তার গীবত করত, তাদের ক্ষেত্রেও তিনি ভালো আচরণ করতেন। কারও মন্দ আচরণের উপর ভিত্তি করে তিনি কখনো আমল করেননি।[১৪১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাত্র এক জোড়া পরিধানের কাপড় ছিল। যখন এটা ময়লা হয়ে যেত, তিনি সেটা পরিষ্কার করে শুকিয়ে আবার পরিধান করতেন। এটাই রাসূলের স্ত্রীদের সাধারণ আমল ছিল।[১৪২] কিন্তু মদীনায় তার জীবনের প্রথম বছর, যখন তিনি রাসূলের সুখ-শান্তির ঘরে থাকা শুরু করেছিলেন, তখন তার পরিধানে দামি (পাঁচ দিরহাম মূল্যের) কাপড় ছিল। তিনি সেটা আনসার মহিলাদের যে কোনো বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ধার দিয়ে তাদের খুশি করতেন।[১৪৩]

তিনি পরিধেয় কাপড় সম্পূর্ণ ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নতুন কাপড় ক্রয় করতেন না। তার ভাতিজা উরওয়া বলেন, 'আয়েশা নতুন পরিধেয় কাপড় পরতেন না যতক্ষণ না পুরোনোটা ছেঁড়া এবং তালিযুক্ত হয়ে যেত।'

তখন অনেকেই তার কাছে এসে বলত, 'আপনাকে আল্লাহ অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। সেগুলো আপনি কেন ব্যবহার করেন না?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি উত্তর দিতেন, 'তার জন্য নতুন শোভা পায় না যাকে নতুনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।'[১৪৪]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলতেন যে, তিনি তার অভ্যাস পরিবর্তন করতেন না। তার কাছে কোনো হাদিয়া আসলেই তিনি রাসূলের

---

[১৪১] মুসলিম, *সহীহ*, ইমারা, ১৯ (১৮২৮)।
[১৪২] বুখারী, *সহীহ*, হাইদ, ১১ (৩০৬)|
[১৪৩] বুখারী, *সহীহ*, হিবা, ৩২ (২৪৮৫)।
[১৪৪] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:১৬৬।

সাদাসিধে জীবনের কথা চিন্তা করতেন। এ বিষয়ে তার কথাগুলো নিয়ে ভাবতেন। আর তখনই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন এবং হাদিয়াগুলো গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফতকালে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য কাপড়, রৌপ্যমুদ্রা এবং আরও অনেক কিছু হাদিয়া পাঠান যেন তিনি সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এগুলো দেখেই কাঁদতে থাকেন এবং বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোর কোনো কিছুই ক্রয় করার সামর্থ্য রাখতেন না।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাতেই সেগুলো খণ্ড খণ্ড করে গরিবদের মধ্যে দান করে দেন এবং তার কাছে কিছুই অবিশষ্ট ছিল না।[১৪৫]

একদিন কেউ একজন তার কাছে ঝুড়িভর্তি আঙ্গুর হাদিয়া নিয়ে আসেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গরিবদের মধ্যে বিতরণ শুরু করলেন। তার বাড়ির দাসী তাকে এ কাজে সহায়তা করছিল। সন্ধ্যা হওয়ার পর দাসী কিছু আঙ্গুর নিয়ে তার সামনে আসে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা দেখে খুব অবাক হন। তিনি ভেবেছিলেন যে, সব আঙ্গুর ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো কী?'

দাসী বুঝে উঠতে পারেনি তার কী বলা উচিত। সে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অগোচরে কিছু আঙ্গুর রেখে দিয়েছিল যেন রাতে তার সামনে পেশ করতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আহ! একগুচ্ছ আঙ্গুর?'

দাসী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আচরণে ঘাবড়ে যায় এবং তার মনিবের মহত্ত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তারপর বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এর একটিও স্পর্শ করব না অথবা খাব না।' তারপর দাসীটি চলে যায়।[১৪৬]

---

[১৪৫] আবু নুআইম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ২:৪৮।
[১৪৬] প্রাগুক্ত।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সারাজীবনই যা হাদিয়া পেতেন, সব দান করে দিতেন। সব সময় গরিবদের সাহায্য করতেন। তিনি জানতেন, সামান্য জিনিসও আল্লাহর রাস্তায় দান করলে আখেরাতে এর বিনিময়ে অনেক বেশি পাবেন। আল্লাহর খাযানায় কোনো কমতি নেই। কখনো নিজের উপকারের কথা চিন্তা করেননি। গরিব-অসহায়দের কথা চিন্তা করে তিনি তাদেরকেই সহযোগিতা করতে চাইতেন। তার কাছে তাদের মুখের হাসির চেয়ে আর কিছু এত প্রিয় ছিল না।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে যখন কোনো কিছুই দেওয়ার মতো থাকত না, তিনি তার নিজের ব্যবহৃত জিনিস বিক্রি করে দান করে দেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, 'আল্লাহর কসম! হয় উম্মুল মুমিনীন তার আচরণ থেকে সরে আসবেন অথবা আমি তাকে বাধ্য করব।'

এ কথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আশেপাশের লোকদের বলেন, 'সে কি সত্যি এ কথা বলেছে?'
তারপর বলেন, 'আমি কসম করছি দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে আমি আর তার সাথে কথা বলব না।'

এজন্য তিনি আর কথা বলেননি। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের খুব কষ্ট পেলেন এবং এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি অনেকবার আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন। প্রতিবারই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, 'আমি এ বিষয়ে আর কথা বলতে চাই না এবং আমি আমার প্রতিজ্ঞা থেকেও সরে আসতে চাই না।'

তারপর থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় ছিল কঠিন। তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবদ-আল-আসওয়াদকে তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করলেন। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার দায়িত্ব সবার জন্যই প্রযোজ্য। তারা চিন্তা-ভাবনা করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলেন এবং বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম। আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?'

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও তাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু তারা তার নাম উচ্চারণ করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

তারা খুশি হয়ে বলল, 'আমরা সবাই?'
'হ্যাঁ, সবাই।'

তাদের পরিকল্পনা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে ভেতরে নেওয়া। আর তিনি ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েই পর্দার এপাশ থেকে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন। মিসওয়ার ইবনে মাহরামা এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবদ-আল-আসওয়াদ তার পক্ষে সুপারিশ করলেন এবং তাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তাদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে মাফ করলেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।
দুজন সুপারিশকারী তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি রাগ করে থাকা উচিত নয়।''

তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কাঁদতে লাগলেন এবং রাসূলের এ কথা তার মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'আমি কসম করেছি এবং তোমরা জান কসম ভঙ্গ করা কঠিন অপরাধ।'

তার অন্তর নরম হয়ে এসেছে। কারণ রাসূলের কথার বাইরে কাজ করার কোনো অবকাশ ছিল না। তিনি সুপারিশকারীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মাফ চাওয়াকে গ্রহণ করেছেন। তখন থেকে তিনি তার সাথে কথা বলা শুরু করেন। কিন্তু এ ঘটনায় তাকে চল্লিশটি গোলাম আযাদ করতে হয়, কারণ তিনি তার কসম ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি যখনই এ কসমের কথা মনে করতেন, কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। প্রিয়জনেরা দেখেছে যে, এতে তার হিজাব চোখের পানিতে ভিজে যেত।[১৪৭]

---

[১৪৭] বুখারী, সহীহ, আদব, ৬২ (৫৭২৫)।

রাসূলের জীবদ্দশায় এক মহিলা তার দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার কাছে আসে। তাদের দেখেই মনে হচ্ছিল যে, তারা খুব গরিব এবং তাদের জীবন চরম কষ্টে জর্জরিত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে দেওয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু তার কাছে যা ছিল, এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যা ছিল না, তার জন্য কখনো দুঃশ্চিন্তা করেননি। তিনি ঘর থেকে তিনটি খেজুর তাদের দান করলেন। ঐ মা তার দুই সন্তানকে সেখান থেকে দুটি খেজুর দিলেন। দীর্ঘ অভুক্ত সন্তানেরা খেজুর দুটি খুব তৃপ্তি সহকারে খেতে থাকে। তাদের মা যেমন আগ্রহভরে তাদের খাওয়া দেখছিলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও দেখেছেন। তারা খাওয়া শেষ করে মায়ের কাছে থাকা তৃতীয় খেজুরটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মা তখন সেটাকে দুভাগ করে দুসন্তানকে দিয়ে দেন। তারা সেটাও পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ফেলে। মায়ের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মা তার সন্তানদের আনন্দেই সন্তুষ্ট হন। খুশিতে তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাসায় এলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে এ ঘটনা বলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব আবেগাপ্লুত হয়ে সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো ঘটনা শুনে সুসংবাদ দিলেন,

> সে যা করেছে, এজন্য আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।[১৪৮]

বেশিরভাগ সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হৃদয় বিগলিত থাকত এবং চোখ অশ্রুসিক্ত থাকত। তিনি চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কান্না থামাতে পারতেন না। তিনি যখনই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে পারতেন না অথবা কোনো কথা রাখতে ব্যর্থ হতেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। সব সময় এর কাফফারা আদায় করতেন। যখন তার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করা হতো, তখন তিনি দিন-রাত শোকাতুর থাকতেন।

---

[১৪৮] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৯২ (২৪৬৫৫)।

তিনি কেবল নিজের জন্যই কান্না করতেন, এমন নয়। মুসলিম জাতির দুর্দশা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। একবার তিনি দাজ্জালের কথা স্মরণ করে তখনকার মুসলমানদের সমস্যা ও প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে কান্না শুরু করে দিলেন। তিনি এত জোড়ে কান্না করছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তা টের পাননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন কাঁদছ?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের দিকে ফিরে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! দাজ্জালের কথা স্মরণ হয়েছে!'[১৪৯]
তিনি গরিব কাউকে দেখলেই নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে যেতেন এবং যা থাকত, দিয়ে দিতেন। তিনি রাসূলের এই হাদীস ভালো করেই আত্মস্থ করেছিলেন :

> একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[১৫০]

রাসূলের পরে সবচেয়ে মহানুভব ব্যক্তি আবু বকর। তিনি ছিলেন তার কন্যা। মহানুভব হওয়া এ পরিবারের স্বাভাবিক চরিত্র। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার মা, আসমা এবং খালা, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চরিত্রপ্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলতেন যে, তারা দান করার ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন।[১৫১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে কিছু দান করার মতো না থাকলে অনেক সময় তিনি অন্যের কাছ থেকে ধার নিতেন এবং সেটা গরিবদের মধ্যে দান করে দিতেন। এটাতে মানুষ বেশ অবাক হতো। একজন জিজ্ঞেস করেই বসল, 'কর্জ করে দান করার ধারণা আপনি কোথেকে পেয়েছেন?'

---

[১৪৯] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬৭:৭৫ (২৪৫১১)।
[১৫০] বুখারী, *সহীহ*, যাকাত, ৮-৯ (১৩৪৭, ১৩৫১)।
[১৫১] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:১০৬ (২৮০)।

তিনি এর জবাবে রাসূলের একটি হাদীস শোনাতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন।'[১৫২]

তার ভাগ্নে উরওয়া বলতেন, 'তালি দেওয়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমি তাকে সাত হাজার দিরহাম দান করতে দেখেছি।'[১৫৩]
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মুআবিয়ার কাছে তার বাড়ি বিক্রি করে দেন। বিক্রিত টাকার পরিমাণ ছিল এক লাখ আশি হাজার অথবা দুই লাখ দিরহাম। তিনি যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে ওঠার আগেই সব অর্থ দান করে দিলেন। তার কাছে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

একদিন এক দরিদ্র ব্যক্তি তার কাছে খাবারের জন্য হাত পাতে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে কিছু আঙ্গুর ছিল। তিনি নিকটস্থ এক মহিলাকে সেগুলো দান করে দিতে বললেন। মহিলাটি এতে খুব অবাক হয়। সে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কারণ তার নিজের খাওয়ার মতো ঘরে আর কিছু ছিল না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সামান্য জিনিসের বিনিময়েও আখেরাতে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাবে : 'তুমি কেন দ্বিধা করছ? তুমি কি জান, আঙ্গুরগুলোতে কতগুলো কণা আছে?'[১৫৪] তিনি এ আয়াতের দিকে ইশারা করেছিলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

> যে কিনা অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিলযিলাহ, ৯৯:৭)

এক মহিলা তার দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার কাছে কিছু খাবার চায়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। তিনি ঘরে একটি খেজুর ছাড়া আরি কিছুই খুঁজে পেলেন না। তিনি খুব

---

[১৫২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৯৯ (২৪৭২৩)।
[১৫৩] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৬৭।
[১৫৪] মালিক, *মুয়াত্তা*, ২:৯৯৭ (১৮১১)।

বিনয়ের সাথে খেজুরটি তাকে দিলেন। মহিলাটি তখন সেটাকে দুভাগ করে তার দুসন্তানকে দিয়ে দেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই মায়ের কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন!

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ দৃশ্য দেখে খুব আপ্লুত হয়েছিলেন। মহিলাটি চলে গেলেও তিনি এ নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাসায় এলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে এ ঘটনা বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুব বিস্মিত হলেন এবং বললেন, 'এ রকম শিশুদের এভাবে যত্ন নিলে তারা আখেরাতে জাহান্নামে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'[১৫৫]

আরেকদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে একজন অসহায় মহিলা আসে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কেবল একটি শুকনা রুটি পেলেন। এই রুটিটি তার ইফতারের জন্য রাখা ছিল। কিন্তু কোনো রকমের দ্বিধা ছাড়াই এই রুটিটি তিনি মহিলাকে দিয়ে দিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পরিচারিকা রুটিটি দেওয়ার আগে তাকে বার বার মনে করিয়ে দিল, 'আপনার ইফতারের জন্য আর কিছুই ঘরে নেই।' তারপরেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে বললেন, 'রুটিটি তাকে দিয়ে দাও।'

রুটিটি না দিয়ে পরিচারিকার আর কোনো উপায় ছিল না। সূর্যাস্তের আগে কিছু রুটি এবং গোশত হাদিয়া আসে। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন যারা কেবল তার সন্তুষ্টির জন্যই দান করেন। যখন ইফতারের সময় হলো, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন পরিচারিকার সাথে রসিকতা করলেন, 'এই নাও, খাও। এটা শুকনা রুটির চেয়ে অনেক সুস্বাদু।'[১৫৬]

আরেকবার তার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হাদিয়া নিয়ে এলে একই রকম ঘটনা ঘটে। এ হাদিয়ার মূল্য ছিল এক লাখ দিরহাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের দেখেন যে, তিনি সবই দান করে দিচ্ছেন। ঐ দিনও তিনি

---

[১৫৫] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:৫৯ (১৩২)।
[১৫৬] মালিক, *মুয়াত্তা*, ২:৯৯৭ (১৮১০)।

রোযা ছিলেন। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। যখন ইফতারের সময় হয়ে এল, তখন তিনি তার পরিচারিকা উম্মে যরকে বললেন, 'তুমি ইফতারের জন্য কিছু নিয়ে আস না?'

উম্মে যর কিছু যয়তুন তেল এবং রুটি পেশ করে বললেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি এক দিরহাম হলেও রেখে দিতে পারতেন। আমরা সেটা দিয়ে কিছু গোশত কিনতে পারতাম।' ভালো কোনো খাবার পেশ করতে না পেরে পরিচারিকার মনে কষ্ট হচ্ছিল। তদুপরি এত সব হাদিয়া থেকে সে নিজেও কোনোভাবে উপকৃত হতে পারেনি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তা উপলব্ধি করতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমাকে বাধ্য করো না। আমার যদি তখন মনে থাকত, তাহলে আমি তা করতাম।'[১৫৭]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতেন যে, তিনি যা দান করেন, তা থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং এজন্যই তিনি তা অকাতরে দান করে দেন। এটা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শিখেছেন।

একদিন তারা কুরবানির পশু জবাই করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সব গোশত দান করে দেন। শুধু কিছু গোশত অবশিষ্ট ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরবানির পশুর গোশত কী করেছ? আমাদের জন্য কী আছে?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, 'আমি সব দান করে দিয়েছি। শুধু সম্মুখ রানের কিছু অংশ আছে।'

এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তার জন্য দানকৃত সবকিছুর বিনিময়ে তিনি অনেক বেশি নেকী দেবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু দান করলে সেটা কখনই শেষ হয়ে যায় না, বরং সেটাই চিরস্থায়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, 'না, হে আমার প্রিয়া! সম্মুখ রানের অংশটুকু ছাড়া সবকিছুই আছে (আখেরাতের পুরস্কারের জন্য)।'

---

[১৫৭] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৬৭; যাহাবি, *সিয়ার*, ২:১৮৭।

পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যকে পর্দার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। রাসূলের স্ত্রী হিসেবে তিনি অন্য মুসলমানের কাছে উম্মুল মুমিনীন। এতদসত্ত্বেও তিনি পরপুরুষের সাথে অত্যন্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন।

এমনকি তিনি অন্ধ ব্যক্তির সাথেও পর্দা করতেন। একদিন তাবিউন গোত্রের সর্দার ইসহাক আয়েশার কাছে এলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন সঙ্গে সঙ্গে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। অন্ধ ব্যক্তি হিসেবে ইসহাক এ আচরণে খুব বিস্মিত হলেন এবং বললেন, 'আপনি কি আমার থেকে পর্দা করছেন? আমি তো অন্ধ।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে বললেন, 'এটা সত্য যে, আপনি আমাকে দেখতে পারছেন না। কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।'[১৫৮]

যখন তার দুধ-মাতার স্বামীর ভাই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দেখতে আসতেন, তখনো তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন, যদিও তিনি সম্পর্কে তার চাচা ছিলেন এবং তার সামনে পর্দা জরুরি ছিল না। যারা তার আচরণে অবাক হতো, তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন, 'তার স্ত্রী আমাকে দুধ খাইয়েছে, তিনি নন।'

সম্ভবত বিষয়টি তখনো ফায়সালা হয়নি। এজন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, 'তিনি তোমার চাচা। তাকে দেখা দিতে অসুবিধা নেই।'[১৫৯]

---

[১৫৮] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৬৯।

রাসূলের দুই নাতি হাসান এবং হুসাইন এলেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাথায় কাপড় দিতেন। তার এই সকতর্কতার জন্য হাসান এবং হুসাইন রাসূলের স্ত্রীদের কাছে বেশি আসতেন না এবং তারাও সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[১৬০]

হজের সময় তিনি ভিড় এড়িয়ে চলতেন এবং প্রয়োজনে কাবা শরীফের অনেক দূর দিয়ে তাওয়াফ করতেন। একবার তাওয়াফ করার সময় এক মহিলা তাকে হজরে আসওয়াদের নিকটে যেতে বলে, 'হে উম্মুল মুমিনীন! চলুন, আমরা হজরে আসওয়াদ চুমু দিতে যাই।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে বলেন এবং মহিলাদের জন্য ভিড়ের মধ্যে যাওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন।[১৬১]

তাওয়াফের ক্ষেত্রে তার এই সতর্কতার কথা অনেকেই জানতেন। এজন্য তারা কাবার চারিদিকে তার তাওয়াফের পথে লোকজনকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন যেন তিনি সহজে তাওয়াফ করতে পারেন। তাওয়াফরত অবস্থায়ও তিনি তার চেহারাকে ঢেকে নিতেন যেন কেউ তার চেহারা দেখতে না পায়।[১৬২]

তিনি রাসূলের কবর যিয়ারত করার সময়ও খুব সতর্ক থাকতেন। উমর শহীদ হওয়ার পর যখন তাকে দাফন করা হয়, তখন তিনি পর্দার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পিতার কবর যিয়ারত করতে যেতেন।[১৬৩]

তার বক্তব্যেও পর্দার ব্যাপারে সতর্কতা ফুটে উঠত। তিনি সবাইকে তার কাছে আসার অনুমতি দিতেন এবং তাদের কাছে ইলম বিতরণ করতেন। আরবের প্রত্যেক এলাকায় তার ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে

---

[১৫৯] বুখারী, *সহীহ*, শাহাদাত, ৭ (২৫৪০১)।
[১৬০] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৫৮।
[১৬১] বুখারী, *সহীহ*, হজ, ৬৩ (১৫৩৯)।
[১৬২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৮৫ (২৪৫৯২)।
[১৬৩] হাকীম, *মুসতাদারক*, ৪:৮ (৬৭২১)।

অগ্রগামী ছিল তার ভাগ্নেরা এবং নিকটাত্মীয়রা। তাদের জন্য তার সাথে দেখা করা সহজ ছিল। কিন্তু দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন এবং অপরিচিতদের জন্য তিনি ঘরের মাঝখানে পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের তিনি পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা দিতেন। যদি তাকে কোথাও ভুল ধরিয়ে দিতে হতো, তাহলে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করতেন। তার ছাত্র ইমাম মাসরুক বলেন, 'আমি পর্দার আড়াল থেকে তার হাতের তালির শব্দ পেতাম।'[১৬৪]

পূর্ণ সতর্কতার সাথেই তিনি ঘরে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। যারা তার কাছে প্রায়ই পাঠ নিতে আসত, তিনি সব সময় খেয়াল রাখতেন যেন তাদের মধ্যে তার নিকটাত্মীয় কারও দুধ পান করেছে, এমন কেউ থাকে। প্রয়োজনে তিনি দেখা দিতে পারেন। তিনি জানতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও আবু হুযাইফার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইলকে এ রকম করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও সালিম বয়স্ক ছিলেন, তাকে তিনি দুধ খাইয়েছিলেন বলে দেখা দিতে পারতেন।[১৬৫]

তিনি যা জানতেন তা বাস্তবে আমল করেই তিনি তার নিকটাত্মীয়দের শিক্ষা দিতেন। তার এক নিকটাত্মীয়ের একজন গোলাম ছিল। তার নাম সালিম। সে অযু শিখতে চেয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজে অযু করে তাকে অযু করার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। সালিম যেহেতু তার একজন নিকটাত্মীয়ের গোলাম ছিল, এজন তিনি তার সাথে নিকটাত্মীয়ের মতোই আচরণ করেছেন।

কিছু দিন পর আবার একই ব্যক্তি তার কাছে এসে বলে, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আমার জন্য দুআ করুন।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর কারণ জানতে চাইলেন। তখন লোকটি খুশিতে বলে উঠল, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে মুক্ত জীবন দান করেছেন।' আয়েশা জবাবে বললেন, 'আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন।'

এ সংক্ষিপ্ত দুআ করেই তিনি নিজেকে পর্দার আড়াল করে ফেললেন। তখন থেকে লোকটি আর তার নিকটাত্মীয়ের মর্যাদা পায়নি। এজন্য পরবর্তীতে তার সাথে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতেন।

---

[১৬৪] বুখারী, *সহীহ*, আযাহি, ১৫ (৫২৪৬)।
[১৬৫] মালিক, *মুয়াত্তা*, রাদা, ২ (১২৬৫), আবু দাউদ, *সুনান*, নিকাহ, ১০ (২০৬১)।

ইসলামের বাণী–বাহক এবং পথপ্রদর্শক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ইসলামের বাণী প্রচার-প্রসার এবং মানুষকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তিনি ওতপ্রোতভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে সংশ্লিষ্ট হতেন এবং সমাধান দিতেন। সবক্ষেত্রেই তিনি ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতেন। মানুষকে হেদায়েতের পথে আহবান করার জন্য যা কিছু সম্ভব, তিনি তার সবই করতেন। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা বাস্তবায়ন করার অদম্য ইচ্ছাই এ কাজের চালিকাশক্তি ছিল।

একবার সাঈ করার সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক মহিলাকে ছবিযুক্ত হিযাব পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মহিলাকে সতর্ক করে বললেন, 'এ ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান ত্যাগ কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কাপড় দেখলে গোস্বা হতেন।'[১৬৬]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যা জানতেন, তা অন্যদের জানাতে চাইতেন। ইলম বিতরণে কোনো কার্পণ্য করতেন না। যদি কখনো কোনো বিষয় জানতেন অথচ বলতে পারছেন না, তখন খুব অস্থির হয়ে যেতেন। পারিবারিক এ রকম কিছু বিষয় ছিল যা তিনি তার বিনয় ও লজ্জার জন্য বলতে পারতেন না। এজন্য তিনি তা স্ত্রীদের বলতেন যেন তারা তা তাদের স্বামীকে বলতে পারে। একদিন তিনি বললেন, 'যেহেতু বিষয়টি

---

[১৬৬] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২২৫।

লজ্জার, এজন্য তোমরা তোমাদের স্বামীকে বলবে তারা যেন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার পর পবিত্র হওয়ার জন্য পানি ব্যবহার করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা-ই করতেন।'[১৬৭]

মহিলারা, এমনকি শিশুরা, যখন তার কাছে হাতে-পায়ে গহনা পরে দেখা করতে আসত, তখন তিনি তাদের সতর্ক করে বলতেন যে, অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা শয়তানকে আহবান করে এবং ঘর-বাড়ি রহমতের ফেরেশতা থেকে বঞ্চিত থাকে।'[১৬৮]

যখনই তিনি কোনো ভুল দেখতেন, তখনই তা সংশোধন করার চেষ্টা করতেন। একদিন তিনি দেখলেন যে, তার ভাই আব্দুর রহমান সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য খুব দ্রুত অযু করছেন। তখন তাকে সতর্ক করে বললেন, 'আব্দুর রহমান, অযু করার সময় পা ধোয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন কর। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য কী সুন্দর ব্যবস্থা!''[১৬৯]

রণক্ষেত্রে আয়েশা রা.–এর ভূমিকা

অসীম সাহসিকতার অধিকারিণী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যুদ্ধের ময়দানে সামনের সারিতে অবস্থান করতে লজ্জাবোধ করতেন না। অন্যরা ফিরে আসলেও তিনি অবিচল থাকতেন। নারী হয়েও তিনি বেশ কয়েকবার রাসূলের সাথে যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি কখনো ভয় পেতেন না, এমনকি তুমুল লড়াইয়ের সময়েও।

উহুদের যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের সময় তিনি রাসূলের পাশে ছিলেন। এ ছাড়া খন্দক, বনু কুরাইযা, বনু মুসতালিক, হুদাইবিয়া এবং মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের পাশে ছিলেন।[১৭০] যুদ্ধাহতদের তিনি সাহায্য করতেন এবং একই সময় তিনি রাসূলের সেবাও করতেন। আনাস ইবনে মালিক

---

[১৬৭] তিরমিযি, *সুনান*, তাহারা, ১৫ (১৯); নাসাঈ, *সুনান*, তাহারা, ৪১ (৪৬)।
[১৬৮] আবু দাউদ, *সুনান*, হাতাম, ৬ (৪২৩১)।
[১৬৯] মালিক, *মুয়াত্তা*, তাহারা, ৩৫।
[১৭০] সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, *সিরাতুস সাইয়্যিদাতি আয়েশা*, ১৭০।

বলেন, 'উহুদের যুদ্ধে আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মে সুলাইমাকে যুদ্ধাহতদের জন্য পানি বহন করতে দেখেছি, তারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছিলেন। তারা পানি আনার জন্য উহুদ থেকে মদীনা আসা-যাওয়া করতেন।'[১৭১] খন্দকের লড়াইতে মক্কার কাফেররা যখন মদীনা অবরোধ করেছিল, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। তিনি রাসূলের সেবা করেছেন এবং অন্য মহিলাদের সাথে মুসলমানদের জন্য পানি বহন করেছেন।

মক্কা বিজয়ের কাছাকাছি সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে আয়েশা! খুযাআ গোত্রে গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেছে।'

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় খুযাআ গোত্র মুসলমানদের মিত্র ছিল। রাসূলের কথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারেন যে, সম্ভবত কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছে। তিনি যদিও জানতেন যে, মক্কাবাসীদের এত ক্ষমতা ছিল না তা করার। আর যদি তারা তা করে থাকে এটা তাদের বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কুরাইশরা সন্ধিভঙ্গের কোনো দুঃসাহস দেখিয়েছে কি না। এটা সত্য ছিল। মক্কার লোকেরা রাতের অন্ধকারে খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করেছে এবং নাবালক শিশুসহ ২৩ জনকে হত্যা করেছে। এটা ছিল হুদাইবিয়া সন্ধির ভয়াবহ লঙ্ঘন। তারপরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনায় অনেক ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা যদি ভিন্ন কিছু থাকে, তবে তার ফলাফল ভালো হবে। তারপরেও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এর ফলাফল কি ভালো হবে?' রাসূল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো।'

এর কিছুক্ষণ পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সফরের জন্য তৈরি হতে বললেন এবং বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন। অন্যান্য সফর থেকে এ সফর হবে আলাদা। কারণ এটা হবে তাদের জন্মস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তনের সফর, যে

---

[১৭১] বুখারী, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৪৮ (৩৬০০)।

জায়গার উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সফরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তার ব্যস্ততা দেখে আবু বকর এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিষয়টি গোপন রাখতে বলেছেন, এজন্য তিনি এটা কাউকে বলেননি, এমনকি তার পিতাকেও না।

প্রয়োজনে ইসলামের জন্য ফান্ড সংগ্রহে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান মহিলারা তাদের অলংকার - কানের দুল, নাকের নোলক, গলার হার, হাতের চুড়ি এবং স্বর্ণ - আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিতেন।[১৭২] তাবুক অভিযানের আগে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার ঘরে একটি কম্বল বিছিয়ে দেন এবং মুসলমান মহিলারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের গহনা দান করে তা ভরতে থাকে।

তায়াম্মুমের আয়াত নাযিলের ঘটনা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে উপলক্ষ করেই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে। বনু মুস্তালিক অভিযান থেকে ফেরার পথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বুঝতে পারেন যে, তার গলার হারটি কোথাও হারিয়ে গেছে। এ হারটির মালিক ছিল তার বোন, আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি চিন্তা করেন, এটা যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটা তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি অন্ধকারে সেটা অনেক খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। তিনি রাসূলের কাছে গেলেন এবং দুজনে মিলে সেটা খোঁজা শুরু করলেন। যখন অন্যান্য সাহাবীরা এটা দেখলেন, তখন তারাও হারটি খোঁজা শুরু করলেন।

কিন্তু হারটি পাওয়া গেল না। যখন সবাই বুঝল যে, এটা পাওয়া সম্ভব না, তখন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

---

[১৭২] ওয়াকিদি, মাগাযী, ১:৯৯২।

লোকেরা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বলল, 'দেখলেন, আপনার মেয়ে কী কাণ্ড করল? তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সবাইকে এমন জায়গায় আটকে রাখলেন যেখানে এক ফোঁটা পানিও নেই।'

বাস্তবে কারও সাথে পানি ছিল না এবং আশেপাশে কোথাও কোনো পানির কূপও দেখা যাচ্ছিল না। তারা সকালে ফজরের নামাযের সময় পানি ছাড়া কীভাবে অযু করবে? তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেল এবং কোনো সমাধান খুঁজে পেল না।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব রেগে গেলেন। যদি তার মেয়ের গলার হারটি না হারাত, তাহলে তাদের সেখানে অবস্থান করতে হতো না। সম্ভবত তখন কোনো পানির কুয়ার কাছে অবস্থান করতে পারতেন। তিনি মনে রাগ নিয়েই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার তাঁবুতে প্রবেশ করেন। তাকে কিছু কড়া কথা শোনাবেন বলে মনস্থির করলেন। তিনি এসে দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশার কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। তিনি থেমে গেলেন। তবে রাগ কমল না। রাগ নিয়েই নরম গলায় তিনি বললেন, 'তুমি রাসূলসহ সব লোকদের এমন জায়গায় এনে আটকে রেখেছ যে, না তাদের কাছে কোনো পানি আছে, না তারা পানির কোনো সন্ধান পাবে।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব কঠিন অবস্থায় ছিলেন। তার কাছে কোনো জবাব ছিল না। আবার নড়াচড়াও করতে পারছিলেন না যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো ঘুমাচ্ছেন। হঠাৎ করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠলেন এবং বুঝতে পারলেন কাফেলার সাথে কোনো পানি অবশিষ্ট নেই। তিনি তার লোকদের কষ্টের কথা বুঝতে পারলেন এবং তাদের নামায পড়তে হবে, অথচ অযু করার কোনো পানি নেই। তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো। জিবরাইল আলাইহিস সালাম কুরআন মাজীদের আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন যেখানে পানি ছাড়া অযুর বিধান বর্ণিত হয়েছে,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

আর তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী-গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানি না পায়, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। তাতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। (সূরা আন-নিসা, ৪:৪৩)

এ আয়াত তাদের সমস্যার সমাধান করে দিল। এখন থেকে পানি না পাওয়া গেলে আর চিন্তিত হতে হবে না। তারা জেনে গেলেন যে, পানি না পেলে পরিষ্কার মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে পবিত্র হওয়া যায় এবং পানি না পাওয়া পর্যন্ত এ পবিত্রতা দিয়েই নামায পড়া যায়।

আবু বকর দেখলেন যে, কীভাবে আল্লাহ তাদের উপর রহম করেছেন। তিনি যেখানে রেগে গিয়েছিলেন, এখন তার চেহারায় গভীর ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। এটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার একটি ভুল ছিল যা নতুন আয়াত নাযিলের পরিপ্রক্ষিত হয়ে ওঠে। আবু বকর বললেন, 'হে আমার কন্যা! তুমি কত বরকতময় মেয়ে! তুমি যদিও সবার জন্য সফরকে বিলম্বিত করেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমার উসিলায় সব মুসলমানের পবিত্রতার জন্য সহজ এবং বরকতময় পদ্ধতি নাযিল করেছেন।'[১৭৩]

অন্যান্য সাহাবীরাও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ উচ্চ মর্যাদার কথা বুঝতে পারলেন। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই উসাইদ ইবনে খুযাইর আবু বকরের কাছে এসে বললেন, 'হে আবু বকরের পরিবার! এটাই তোমাদের প্রথম বরকত নয়।'[১৭৪]

---

[১৭৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ২:২৭২ (২৬৩৮৪)।
[১৭৪] বুখারী, *সহীহ*, তায়াম্মুম, ১ (৩২৭, ৩২৯)।

নামায পড়ার পর তাদের সফর আবার শুরু হলো। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উট যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তিনি দেখলেন একটি উজ্জ্বল বস্তু নিচে পড়ে আছে। তিনি নুয়ে তা দেখার চেষ্টা করলেন এবং আনন্দের সাথে তিনি দেখলেন যে, এটাই সেই হার যা তিনি আসমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন।[১৭৫]

---

[১৭৫] বুখারী, সহীহ, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৫ (৩৪৬৯)।
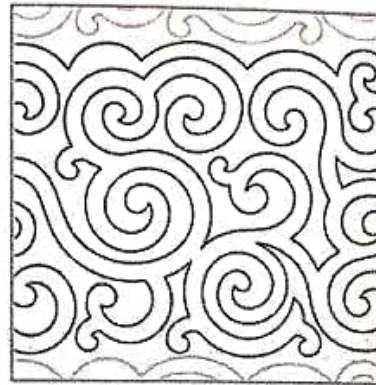
তৃতীয় অধ্যায়

আয়েশা রা.-এর নিষ্কলুষ চরিত্র

অপবাদের ঘটনা

বনু মুস্তালিক অভিযানে তিনি তার জীবনের সবচেয়ে বড় অপবাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। মুনাফিকদের সর্দার ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। মুসলমানরা মদীনায় হিজরতের পর থেকেই তার ক্ষমতা ও আধিপত্য সংকুচিত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই সে তার হারানো আধিপত্য ফিরে পাওয়ার জন্য একটি মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে। সে বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারায় সে সফল হতে পারেনি। মক্কার কাফেররা তার কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক অনেক চিঠি পাঠিয়েছে। সেও তাদের পক্ষে কাজ করার ব্যাপারে সায় দিয়েছে। তাদের ক্রীড়নক হয়ে যেভাবে সম্ভব, সৈনিক বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য সে প্রস্তুত। সে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে ফেলার অপচেষ্টা করেছে। যুদ্ধের ময়দান থেকে ছল-চাতুরী করে সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সরে পড়েছে যা ছিল মুসলিম বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সে মক্কার কাফেরদের সাথে বিভিন্নভাবে মদীনার ইহুদীদের (যেমন, বনু কুরাইযা) মিলিয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এ অলিখিত চুক্তিকে গোপনে লালন করেছে। তার অনেক অপকৌশলই বাস্তাবায়িত হয়েছে। তবু সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। প্রতিটি দিনই তার এবং তার অনুসারীদের মর্মপীড়ার কারণ হতো। তার মিত্ররা যেমন, বনু নাযির, বনু কাইনুকা এবং বনু কুরাইযা, 'মদীনা চুক্তি' লঙ্ঘন করে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। মোটকথা, দিন দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল এবং সে দেখছিল যে, তার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

এ অবস্থায় মুনাফিকরা খুব ভেঙ্গে পড়ে এবং শত্রুদের সফলতায় তারা ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে তারা বিশ্বাসঘাতকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ভেতরে ভেতরে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মূল লক্ষ্য ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে দুর্বল করা এবং মানুষকে তার থেকে দূরে রাখা। এ লক্ষ্যে রাসূলের সবচেয়ে নিকটবর্তী সঙ্গী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার প্রথম টার্গেট। মুরাইসি ঝরনার এলাকায় ইবনে সালুল তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীরা স্বেচ্ছায় বুন মুস্তালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যদিও এর আগের যুদ্ধগুলোতে তারা বিভিন্ন অজুহাতে না যাওয়ার পাঁয়তারা করেছে। মুরাইসি ঝরনা এলাকায় সামান্য একটি বিপত্তিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মুনাফিকরা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির দুরভিসন্ধি আঁটে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অপমানিত করার জন্য সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মুহাজির এবং আনসাররা, যারা একে অন্যের জন্য বিনা দ্বিধায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, এ চক্রান্তে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায় মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীমাংসা না করে দিতেন, তাহলে এ দ্বন্দ্ব চিরকালের জন্য অবধারিত হয়ে যেত।

ইবনে সালুলের এই প্রথম চেষ্টা বিফলে গেলেও চক্রান্ত করতেই থাকে। সে এ কথাও বলে যে, মুহাজিররা, যার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন, যাদের খাবার খেয়েছে, তাদের হাত কামড়ে দিয়েছে।[১৭৬] সে প্রকাশ্যে এবং গোপনে হুমকি দিয়ে বেড়াত, 'আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথাকার সম্মানিতরা হীন তুচ্ছদের অবশ্যই বহিষ্কার করবে।'

এখানে 'সম্মানিতরা' বলে সে নিজেকে এবং 'হীন' বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝিয়েছে।

কিছু অভিজ্ঞ সাহাবী এ চক্রান্তের খবর জেনে গেলে তার পক্ষে এ হীন চক্রান্ত অব্যাহত রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। তখন সে তার আচরণ পরিবর্তন করে। সে এমন ব্যবহার শুরু করে যেন সে বরফের মতোই

---

[১৭৬] ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ২:২৯০।

পবিত্র! পরিস্থিতি এত জটিল আকার ধারণ করে যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সরাসরি হত্যা করার প্রস্তাব দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন,

> হে উমর! এটা কেমন করে হতে পারে? লোকে বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করা শুরু করেছে। এটা ঠিক নয়।

এজন্য তখন সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করাই সমুচিত ছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আদেশই দিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ সত্ত্বেও কোনো বিশ্রাম ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুনাফিকরা যা করেছে, তা একের পর এক, সব ঘটনা খুলে বললেন। তারপর সূরা মুনাফিকুন নাযিল হলো।

ইবনে সালুল ভেবেছিল যে, সে তার এতসব চক্রান্তের পরেও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করবে। কিন্তু তার গোত্রের লোকেরাই তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করল। আর যখন সূরা মুনাফিকুন নাযিল হলো, সে তখন তার সব আশা ত্যাগ করল। তার গোত্রের সচেতন লোকেরা, যাদের সে তাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বশে এনেছিল, তারা তাকে ভর্ৎসনা করে ছেড়ে চলে গেল। তার নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ তাদের মধ্যে একজন। তার পিতার কর্মকাণ্ডে তিনি খুবই লজ্জিত হলেন। কিন্তু যখন একজন তাকে জানাল যে, তার পিতাকে হত্যা করা হবে, তখন তিনি খুব ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন এবং একসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললেন,

> ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার পিতা) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, এজন্য আপনি তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন। যদি তা-ই হয়, তবে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন, আমি আপনার সম্মুখে তার মস্তক হাযির করব। আল্লাহর কসম! খাযরায গোত্র (ভালো করেই) জানে যে, তাদের মধ্যে পিতার প্রতি আমার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল কোনো

ব্যক্তি নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে এবং সে যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে হয়তো আমার পিতার হত্যাকারীকে জমিনের বুকে চলাফেরা করতে দেখে আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। আর এভাবে একজন কাফেরের বদলায় একজন মুমিনকে হত্যা করে আমি জাহান্নামী হব - অন্তত আমার এমন অবস্থা হতে আপনি দেবেন না।

কারও ধমনীতে রক্ত প্রবাহকে থমকে দেওয়ার মতোই ছিল এই পরামর্শ। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার পিতা, তবু তিনি তাকে হত্যা করতে চেয়েছেন কারণ সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর। তিনি বললেন, 'না বরং আমরা তার সঙ্গে কোমল আচরণ করব এবং সে যতদিন আমাদের সঙ্গে অবস্থান করে আমরা তার সঙ্গে সদাচরণ করব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়েও তার মন শান্ত হলো না। তিনি তার পিতার অপেক্ষায় থাকলেন। প্রথমে পিতার উটকে শায়িত অবস্থায় দেখলেন এবং তারপর পিতাকে দেখে তার জামার কলার ধরে বললেন, 'আমি আপনাকে এখানে থেকে যেতে দেব না যতক্ষণ না আপনি উচ্চারণ করবেন, 'রাসূল সম্মানিত এবং আমি ঘৃণিত'।'[১৭৭]

এসব অঘটনের পরেও তারা তীব্র গরমের মধ্যে কোনো বিশ্রাম ছাড়াই তাদের সফর অব্যাহত রাখেন। একসময় যাত্রা বিরতি করেন। কিন্তু এ বিরতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। একটু পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার সফর শুরু করতে বলেন। তারা দ্রুত মদীনার দিকে ফিরতে থাকেন। কোনো কিছুই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদের সফরকে ব্যাঘাত ঘটায়নি। কিন্তু যখন তারা তাদের পেছনে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে[১৭৮] উটরে উপর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

---

[১৭৭] বুখারী, *সহীহ*, মানাকিব, ৯ (৩৩৩০)।

[১৭৮] সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূল এই বলে প্রশংসা করেছেন, 'তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই আমার জানা নাই' এবং 'জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে কাপড়ের উপর কাপড় দিয়ে আবৃত করে নিয়েছেন।'।

আনহাকে বসিয়ে নিয়ে আসতে দেখল, তখন বিপত্তি ঘটল। তারা যেখানে বিশ্রামের জন্য থেমেছিল, সেখানে সবাই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথা ভুলে গিয়েছিল। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে খেয়াল করেন, তার গলায় হার নেই। তখন তিনি সেটি খুঁজতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তার বাহনের নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বাহন প্রস্তুত করে হাওদা তুলে নেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব হালকা-পাতলা ছিলেন। তার জন্য হাওদার ওজনের তারতম্য বোঝা যেত না। এজন্য বাহনের নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ভেবেছিল যে, তিনি হাওদার মধ্যেই আছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফিরে এসে তার মুসলিম সেনাদের কাউকে পেলেন না। তিনি প্রথমে ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু সেখানে কোনো আহবানকারী অথবা সাড়াদানকারী কেউই ছিল না। তার কিছু করার ছিল না। তিনি একটি চাদর মুড়ি দিয়ে স্ব-স্থানে শুয়ে পড়েন এবং ধারণা করেন, তাকে না পেয়ে নিশ্চয়ই কেউ খুঁজতে আসবে। বেশি সময় পার হয়নি, সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সেখানে পৌঁছলেন। তিনি নিজের কোনো প্রয়োজনে কাফেলার পেছনে ছিলেন। সাফওয়ান যখন একটি মানুষের মতো অবয়ব দেখলেন, তখন কাছে এলেন এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দেখে খুব অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'এ যে রাসূলের সহধর্মিণী!'

এ কথায় বিচলিত হয়ে তিনি দ্রুত তার চেহারা ঢেকে ফেললেন। কিন্তু তিনি এতে খুশিই হলেন। শেষ পর্যন্ত কেউ একজন তাকে মূল বাহিনীর কাছে নেওয়ার জন্য এসেছে।

সাফওয়ান কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে, কীভাবে রাসূলের স্ত্রী পেছনে রয়ে গেলেন। এজন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, কী করে আপনি পেছনে রয়ে গেলেন?'

এ প্রশ্ন করেই তিনি তার উটকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছাকাছি নিয়ে এলেন। ঈমানদারদের কাছে উম্মুল মুমিনীনরা নিজেদের মা থেকে বেশি সম্মানের ছিলেন। তাকে উটে উঠতে সহজ করার জন্য তিনি নিজে উট থেকে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে উটকে বসালেন, নিজে এক পাশে সরে বললেন, 'দয়া করে উটে আরোহণ করুন।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উটে আরোহণের পর উটের লাগাম ধরে সাফওয়ান রওনা হন। এভাবে তারা মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছেন।

সাফওয়ানের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এ আগমন ইবনে সালুল দেখল; এটা এমন এক দৃশ্য যা দেখে যে কেউ ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। আরও কয়েকজনের সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হয় এবং তারপর একসাথে সবাই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নামে অপবাদ দেওয়া শুরু করে। ইতিহাসে সতীত্বের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম অপবাদ নয়; এখন তিনি যেন কুমারী মারইয়াম।

মুনাফিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরোক্ষভাবে নাযেহাল করার পাঁয়তারায় মেতে উঠল। গোপনে কানাকানি করে তারা এ অপবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগল। তারা আশা করল, এতে মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হবে। ইবনে সালুলের অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে তার অন্তর প্রকম্পিত ছিল, কিন্তু এখন তার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল। এটা ছিল রাসূলের বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধ নেওয়ার এবং মানুষকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অপবাদে ব্যস্ত রেখে নিজের অপরাধ ঢাকার একটি মোক্ষম সুযোগ! সে এটাও আশা করেছিল যে, এর মাধ্যমে লোকদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং সম্ভবত তারা তার উপর ঈমান পরিত্যাগ করবে। এক মুহূর্তে সে অতীতের সব নির্লজ্জ অপকর্ম ভুলে বেহায়ারা মতো আচরণ শুরু করে এবং তার আসল চরিত্র ফুটে ওঠে।

এটা একটি পরিকল্পিত অপবাদ। মদীনায় পৌঁছার আগেই এ ঘটনা সবার মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়। একই মিথ্যা যখন সব জায়গায় প্রচারিত হয়, তখন লোকজন দ্বিধায় পড়ে যায়। তারা আসল সত্য বুঝতে পারল না। এভাবে মুনাফিকরা বছরের পর বছর যে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল, তা বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এবং হাতের মুঠোয় এমন একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যতে তাদের কর্তৃত্বের হাতছানিতে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

আয়েশা রা.-এর অসুস্থতা

বনু মুসতালিকের অভিযানে বের হওয়ার পর আটাশ দিন চলে গেছে। যখন তারা মদীনায় ফিরেছে, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার শরীর এ দীর্ঘ ক্লান্তিতে কাহিল হয়ে গেল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার বিরুদ্ধে যেসব প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছিল, এসব ব্যাপারেও তিনি কিছু জানতেন না। কিন্তু মুনাফিকরা খুব দ্রুত কাজ করে যাচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার এ ঘটনা শুনে খুব মর্মাহত হলেন। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা আবু বকরের পরিবার কেউই এ ঘটনা বিশ্বাস করেননি, এজন্য তারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেননি। তবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলেন। আগে অসুস্থ হলে তিনি যে রকম দয়া আর কোমলতা প্রদর্শন করতেন, এবার তেমন করছেন না। একদিন তার মা উম্মে রুমানের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকাভাবে তার অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে চান।

এতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দান করলে আমি আমার মায়ের নিকট চলে যাই। তিনি আমার সেবা-যত্ন করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'অসুবিধা নেই।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বুঝে আসছিল না কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে এ রকম নিরুত্তাপ আচরণ করছেন। এ অনুভূতি নিয়েই তিনি তার পরিবারের কাছে গেলেন। তিনি তার মায়ের সাথে থাকতেন। বিশ দিন পর একটু সুস্থবোধ করলে বিছানা ছাড়লেন। কিন্তু তার সম্পর্কে রটানো কোনো কিছুই তখনো জানতেন না।

তার অসুস্থতার সময় অনেকে তাকে দেখতে আসত। তাদেরই একজন উম্মে মিসতাহ, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকটাত্মীয়, তার সাথে এক রাতে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বের হন। এমন সময় চাদরের সঙ্গে জড়িয়ে উম্মে মিসতাহ হোচট খেয়ে পড়ে যায়। তারপর

যখন তিনি উঠে নিজেকে পরিপাটি করলেন, তখন অভিশাপ দিলেন, 'মিসতাহর সর্বনাশ হোক!'

এতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব ব্যথিত হলেন, বিস্মিত হলেন, কেমন করে একজন নিজের নেককার ছেলেকে অভিশাপ দিতে পারে? প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারিণী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অনুভব করলেন বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। তিনি বললেন, 'একজন মুহাজিরকে বদ দুআ দিয়ে তুমি অন্যায় করলে। তিনি তো বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন।'

উম্মে মিসতাহ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথায় খুব অবাক এবং দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তার ছেলে মিসতাহ এ অপবাদ রটনাকারীদের একজন। একটু পরেই তিনি জবাব দিলেন, 'হে আবু বকর তনয়া! সে তোমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে তুমি কি তা জান না? এটা সম্ভব যে, তুমি সত্যিই পরম বিশ্বাসী মহিলাদের একজন যে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নেয়, অথবা তুমি কি সত্যিই জান না যে, কী ঘটছে?'

এ প্রশ্নটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে আরও দ্বিধা সৃষ্টি করল। আয়েশা সত্যিই চারিদিকের ঘটনাবলি থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী বলেছে? কোন ঘটনা? আমাকে কিছুই জানানো হয়নি।' এ কথা বলে আয়েশা উম্মে মিসতাহর চোখের দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টির মর্ম ছিল, 'আমাকে তাড়াতাড়ি বল কী ঘটেছে।' উম্মে মিসতাহ তখন বলা শুরু করলেন, 'তোমার ব্যাপারে কিছু অপবাদ রটানো হয়েছে।' তারপর তিনি শুরু থেকে এ পর্যন্ত অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।[১৭৯]

এটা বিশ্বাস করা ছিল অসম্ভব। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অসুস্থতা, যা ভালো হওয়ার দিকে ছিল, তা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন এবং অন্তর ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এবং কান্নার শব্দে বুক ভারী হয়ে উঠছিল।

---

[১৭৯] ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ৪:৪৬৪।

তার পা নড়ানোর ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেল। মনে হয় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবেন। এ অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি সত্যি এরকম ঘটেছে?'

অজ্ঞান হওয়ার আগে এটাই ছিল তার শেষ কথা।

কিছু সময় পর অনেক কষ্টে তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। তারপরেও তিনি নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, লোকেরা কীভাবে এসব কথা বলছে?'

উম্মে মিসতাহর সাহায্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তার পিতার গৃহের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তিনি খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদিও তিনি দ্রুত বাসার দিকে হাঁটতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পা নির্দেশ মানছিল না। তিনি বাসায় পৌঁছেই মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলেন, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, লোকেরা নানা কথা-বার্তা বলছে। আপনি তো তার কিছুই আমাকে বলেননি।'

উম্মে রুমান ছিলেন খুব শান্ত এবং দৃঢ় চরিত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখারও প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি তার মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'স্নেহের তনয়া আমার! ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নাও। কোনো পুরুষের সুন্দরী রমণী থাকলে পুরুষ তাকে ভালোবাসে। যদি তার সতীন থাকে, তাহলে তার সম্পর্কে নারীরা অনেক কিছু বলবে। অনেক কিছু অন্যান্য লোকেরাও বলবে, এমন না হলে তা হবে বিরল ঘটনা।'[১৮০]

উম্মে রুমান যৌক্তিক কথাই বলেছেন। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রে যে অপবাদ চারিদিকে রটেছে, তা একজনের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। রাতের পর রাত কেটে গেল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চোখে ঘুম এল না।

---

[১৮০] বুখারী, *সহীহ*, শাহাদাহ, ১৫ (২৫১৮)।

সাফওয়ানও এ অপবাদের ঘটনা শুনলেন। তাকে কেন্দ্র করেই তা ছড়াচ্ছে। তিনি দেখলেন যে, কিছু মুসলমান সেটা বিশ্বাসও করে ফেলেছে। হাসসান ইবনে সাবিত ছিলেন তাদের একজন। সাফওয়ান তার কাছে গেলেন এবং উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করলেন। এটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়াল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসতাহকে নিয়মিত সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তিনি এ ঘটনার পর তার মন পরিবর্তন করলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, মিসতাহ এ অপবাদ রটানোতে অংশগ্রহণ করেছে, তখন তিনি আর মিসতাহকে সাহায্য করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুনাফিকরা এ অপবাদের ঘটনাপরম্পরা দেখে খুব উল্লসিত হলো। এই কিছু দিন আগেই বনু মুসতালিক অভিযান থেকে ফেরার পথে তারাই ছিল সবার টার্গেট। এখন তাদের কথা আর কারও মনে নেই।

সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্বাস

অপবাদের ঘটনা সাহাবীদের মধ্যেও প্রভাব ফেলে। তবে অনেক সাহাবীর কাছে এটা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। বেশিরভাগ সাহাবীই বলেছেন, 'এটা একটি জঘন্য অপবাদ।'

অনেকে এ ধরনের কোনো কিছু কল্পনাও করতেন না। যারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সতীত্ব ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানতেন, তারা অন্তর দিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন। কোনো এক ব্যস্ত মুহূর্তে আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে যা কিছু বলছে আপনি কি সেসব শুনেছেন?'

যদিও তিনি শুনেছেন, তবু তিনি এসব না শোনার মতো আচরণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন, এ কাজ কে এবং কেন করছে। তিনি জানতেন, যে মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তিনি কখনো এমন কাজ করতে পারেন না। তিনি বললেন, 'হে উম্মে আইয়ুব, আল্লাহর কসম, আমাকে বলো, তুমি কি এ রকম করতে?'

উম্মে আইয়ুব এ কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে গেলেন। যারা আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে, তারা কখনো এমন কাজ করতে পারে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি কখনো এমন করতাম না।'

আবু আইয়ুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে জবাব দিলেন, 'ভুলে যেও না, আয়েশা তোমার থেকে অনেক বেশি ধার্মিক।'

যে আয়াত এ অপবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে, সেখানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট যেমন আবু আইয়ুব, যারা দৃঢ়ভাবে এ অপবাদের বিরোধিতা করেছে এবং ঈমানদারদের উচিত যে কোনো অপবাদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে প্রতিবাদ করা।

জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাতে দেরি হওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথিত ছিলেন। তিনি গভীরভাবে দুঃখিত ছিলেন। কারণ এখনো কোনো ওহী নাযিল হলো না। সাধারণত এ ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত ওহী নাযিল হয়ে থাকে এবং তাতে সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও থাকে। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করছিলেন যাতে ওহীর শিক্ষা তাদের অন্তরে গেঁথে যায়।

নীরবতা অপবাদের ঘটনাকে আরও জটিল করে তুলল এবং মুনাফিকরা কিছু ঈমানদারদেরও দলে ভেড়াতে সক্ষম হলো। এ পরিস্থিতিতে কিছু বলার প্রয়োজন ছিল। একদিন নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> লোকসকল! লোকদের কী হয়েছে? তারা আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা অসত্য কথা বলছে আমার পরিবারের বিরুদ্ধে। আল্লাহর কসম! তাদের ব্যাপারে মঙ্গল ও কল্যাণ ছাড়া কিছুই আমি জানি না। আর তারা এটা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই আমার জানা নেই। সে যখন আমার গৃহে প্রবেশ করে, তখন সে আমার সঙ্গেই থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনায় গভীরভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন এবং সাহাবীরা বিষয়টি আর সহ্য করতে চাননি। কিন্তু কেউই জানত না কে এই কাজটি করছে। আউস গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনে মুআয দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি এবং আপনাকে স্বস্তি এনে দিতে পারি। এ অপবাদ রটনাকারী যদি আমার গোত্রের হয়ে থাকে, তাহলে আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করব! আর যদি সে খাযরায গোত্রের হয়ে থাকে, যারা আমাদের ভাই, তাহলে আপনি যা হুকুম করবেন, আমরা তা-ই করব।'

এ কথায় নিজ গোত্রের প্রতি ইশারা থাকাতে সা'দ ইবনে উবাদা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং তিনিও দাঁড়িয়ে গেলেন। সম্ভবত তিনি জানতে পেরেছেন এ অপবাদ রটনাকারী কে। তিনি আউস গোত্রের সর্দারের দিকে ইশারা করে বললেন, 'একজন মানুষকে হত্যা করার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনি এটা বলেছেন কারণ আপনি জানেন যে, অপরাধী লোকটি খাযরায গোত্রের। আর যদি অপরাধী আপনার গোত্রের হতো, তাহলে আপনি এ কথা বলতেন না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে এ খুতবা দিয়েছিলেন এবং তাতে এখন দুপক্ষের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে। তারপর সা'দ ইবনে মুআযের চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদায়র সা'দ ইবনে উবাদার কথার প্রতিবাদ করে তাকে মুনাফিকদের বাঁচানোর জন্য দায়ী করে বললেন, 'আমরা অবশ্যই তাদের হত্যা করব। আল্লাহর কসম! যে এই অপবাদ রটিয়েছে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করাই উচিত।'

পরিস্থিতি খুব উত্তেজনামুখর হয়ে ওঠে। মনে হয় একশ বছরের উত্তেজনা এসে ভর করেছে। সাম্প্রদায়িক কলহে আসল বিষয়ই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মানুষ যখন উত্তেজিত হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা লোপ পায়। ঐ সময় কেউই এ রকম উক্তি মেনে নিতে পারত না। এজন্য মানুষ বিভিন্ন পক্ষ নেওয়া শুরু করল এবং পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। আউস এবং খাযরায গোত্র সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় । আর এটাই মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ছিল।

তাদেরকে শান্ত করা ছিল রাসূলের দায়িত্ব। তিনি উভয়পক্ষকে চুপ করার আদেশ দিলেন। তারপর তিনি খুতবা শেষ করে বাসায় ফেরেন। তিনি আলী ইবনে আবি তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না। কারণ সেটা ছিল দিবালোকের মতোই পরিষ্কার। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অন্যান্য ঈমানদারদেরকেও শরীক করেতে চেয়েছেন যেন তার পবিত্রতার কথা সবার সামনে উন্মোচিত হয়। উসামা দৃঢ়ভাবে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পরিবার সম্পর্কে তো আমরা ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর এসব কথা মিথ্যা ও অসার।'

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে দৃষ্টি দিলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও বুঝলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাচ্ছেন, কিন্তু মনে মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তঃকরণে যে ব্যথা অনুভব করছেন, এ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলেন না, যা থেকে তিনি বের হয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি এটা চিন্তা করতে ভালোবাসতেন যে, দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে দামি। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছেন? আল্লাহ আপনাকে এ কষ্ট থেকে হেফাজত করুন। সে ছাড়া তো আরও নারীরা আছে। আপনি তার দাসীকে জিজ্ঞেস করুন। আমি নিশ্চিত সে যা বলবে তা আপনাকে খুশি করবে।'

তিনি এই বলে কথা শেষ করলেন, 'আমি কেবল আপনাকে নিয়েই চিন্তিত। সম্ভবত আপনি এমন কাউকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তাকে বেশি চেনে।' সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসী বারিরাকে ডাকলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আয়েশার মধ্যে এমন কিছু দেখেছ যা তোমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে?'

এ ধরনের একটি জেরার মুখোমুখি হয়ে বারিরা খুব বিব্রতবোধ করল এবং তার চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে বললেন,

> সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য ও ন্যায় দিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু জানি না। আমি তার মধ্যে এমন কোনো দোষ দেখিনি যা নিয়ে আমি সমালোচনা করতে পারি। কেবল এটুকু যে, আমি আটা খামীর করে তাকে খেয়াল রাখার জন্য বলে যাই আর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে। আমি আমার চোখ-কান দিয়ে যা দেখেছি, তাতে আমি কসম করে বলতে পারি যে, আয়েশার সতীত্ব স্বর্ণের মতোই খাঁটি এবং পবিত্র।

এটা একটি চমৎকার সত্যায়ন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতেই সন্তুষ্ট থাকলেন না, তিনি আরও সাহাবীদের মতামত জানতে চাইলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে তার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে আলোচনা করতে চাইলেন এবং এজন্য তিনি প্রথমে যায়নাব বিনতে জাহাশকে পছন্দ করলেন। তার সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কিছুটা প্রতিযোগিতা ছিল। তাকে নির্বাচন করার আরেকটা কারণ ছিল যে, তার বোন হামনাহ এ রটনা বিশ্বাস করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে যয়নাব! তুমি কী বল? তুমি কি কখনো তার মধ্যে বিপরীত কিছু দেখেছ?'

তিনিও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছু জানেন না বললেন।[১৮১]

সুসংবাদ

কয়েকদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের বাড়িতে এলেন। সালাম বিনিময়ের পর ঘরে বসলেন। বনু মুসতালিক থেকে ফেরার পর এটাই ছিল রাসূলের প্রথম আগমন।

এ সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পাশের রুমে তার মায়ের সাথে ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন এবং মহা করুণাময় আল্লাহর কাছে এ

---

[১৮১] বুখারী, সহীহ, শাহাদাহ, ১৫ (২৫১৮)।

অপবাদের প্রতিকার চেয়ে দুআ করছিলেন। তার সাথে একজন আনসার মহিলাও ছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছিলেন যা তিনি বাবা-মা থেকে জানতে পারেননি।

আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ফিরলেন এবং বললেন,

> হে আয়েশা! লোকেরা কী সব বলাবলি করছে তা তো তোমার জানা হয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর লোকেরা যেসব কথা বলাবলি করছে, তাতে তুমি লিপ্ত থেকে থাকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর। আল্লাহ তো বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথাই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে বিশাল হাতুড়ির আঘাতের মতো মনে হচ্ছিল। যদিও তার বক্তব্যে ভালো কথাই ব্যক্ত হয়েছে, তবু তিনি যেখানে নিজের জীবনকে তার জন্য উৎসর্গ করেছেন, সেখানে এই মিথ্যা অপবাদের ভিত্তিতে সম্ভাবনার পর্যায়েও তার নাম উল্লেখ করাটা তার জন্য ছিল চরম বিব্রতকর। তার চোখে অশ্রুপাত করার মতো আর কোনো পানি অবশিষ্ট ছিল না এবং চোখের রক্তও যেন শুকিয়ে গেছে!

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি আর কার সাথে নিজের দুঃখের কথা বলবেন যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বিষয়টিকে এভাবে দেখছেন! বাকরুদ্ধ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অনুভূতিহীন হয়ে পড়লেন এবং মনে হলো তিনি হয়তো হার্ট-অ্যাটাক করে মরেই যাবেন! তিনি করুণভাবে তার পিতা-মাতার দিকে তাকিয়ে তার পক্ষে কিছু জবাব আশা করলেন। কিন্তু তারা তেমন কিছুই বললেন না। শুধু এতটুকু বললেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কী জবাব দেওয়া যায়, তা আমাদের জানা নেই।'

তার নিজের পিতা-মাতাও এ অপবাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরে নিজের অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বললেন,

আমার ব্যাপারে যেসব কথা বলা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আমি কখনো তওবা করব না। আমি ভালো করেই জানি যে, লোকেরা যেসব কথা বলাবলি করছে আমি যদি তা স্বীকারও করি, আর আল্লাহ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ তবে যা ঘটেনি তা স্বীকার করে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে লোকেরা যা বলাবলি করছে আমি তা অস্বীকার করলেও তারা তা সত্য বলে মেনে নেবে না। হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের পিতা যা বলেছিলেন তেমন কথাই আমি উচ্চারণ করব,

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

অতএব সুন্দর সবরই (উত্তম)। আর তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি। (সূরা ইউসূফ, ১২:১৮)

তার কাছে একটি মাত্র পথই খোলা ছিল। তিনি এমন একজনের কাছে সাহায্য চেয়েছেন, যার কেউ নেই তার জন্য তিনিই সব। তিনি আশা করছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তার নির্দোষের কথা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। এজন্য তিনি অনবরত দুআয় নিমগ্ন হলেন।

কিছুক্ষণ পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারকে একটি পরিবর্তন তার নযর কাড়ল; তার চেহারা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামের কাছ থেকে ওহী গ্রহণ করছেন যে কিনা গত একমাস নীরব ছিলেন। ওহীর ভারে মনে হচ্ছিল তার আত্মা বেরিয়ে যাবে! আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আশান্বিত হয়ে উঠলেন। বিশ্বস্ততার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে; বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নতুন বার্তা আসছে। তিনি তার পিতা-মাতার দিকে তাকাতে পারছিলেন না, তাদের চেহারা দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত হয়ে আছে। তাদের অন্তর কেঁপে উঠছে, ভয় পাচ্ছিলেন যে, সত্য উন্মোচিত করার আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। কারণ তিনি জানতেন, আল্লাহ তার উপর জুলুম করবেন না।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাভাবিক হলেন এবং তার মোবারক চেহারা থেকে ঘাম মুছতে মুছতে তিনি আবু বকরের পরিবারের দিকে তাকালেন। সারা ঘরে যে বেদনার পরিবেশ ঘিরে ধরেছিল তা আনন্দে পরিণত হলো এবং সবাই দেখল মাথার উপরে জমে থাকা দুঃখের কালো মেঘ সরে যাচ্ছে, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসছেন। মুনাফিকরা এ শহরকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু করার পর থেকে তার চেহারায় এ প্রশান্তি মুছে গিয়েছিল। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে আয়াত নাযিল করেছেন। ওঠ, আল্লাহর প্রশংসা কর।'

দীর্ঘ এক মাসের দুঃখ-দুর্দশা সমাপ্তি হলো, তিনি যা চেয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি বলে উঠলে, 'আলহামদুলিল্লাহ।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার স্ত্রী উম্মে রুমান রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখে-মুখে ঔজ্জ্বল্য দেখে উম্মে রুমান তার মেয়ে, উম্মুল মুমিনীন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঠ, রাসূলের শোকর আদায় কর।'

কিন্তু তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক কঠিন অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলেন। তার সতীত্ব ও পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং তা পৃথিবী শেষ হওয়া অবধি পঠিত হতে থাকবে। গত এক মাস ধরে যে অপবাদ তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন, তা সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি এটাকে কেবল আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবেই দেখেছেন। এজন্য বললেন,

> না, আমি তাকে ধন্যবাদ দেব না। আমি কেবল আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করব এবং তার প্রশংসা করব।[১৮২]

---

[১৮২] বুখারী, *সহীহ*, শাহাদাহ, ১৫।

তখন থেকে কুরআন মাজীদে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে আয়াত তিলাওয়াত শুরু হয় যা সব যুগের সব মুমিনীনদের কাছে তার পবিত্র জীবনের সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব আগ্রহ সহকারে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ দ্রুত সাহাবীদের জানাতে চাইলেন, তাদের তিলাওয়াত করে শোনালেন,

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪

যারা এ অপবাদ আনয়ন করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করবে না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিজেদের কৃত পাপকর্মের ফল। আর তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (সূরা আন-নূর, ২৪:১১)

সাহাবীরাও গভীরভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। কারণ সবাই জানতেন আসল অপরাধী কে। কিন্তু তারা তাদের জিহবাকে সংযত করে রেখেছিলেন এবং কখনো তাদের অন্তরকে কলুষিত করেননি। কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে তাদের কথাও বলা হয়েছে,

لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ⑫

তারা যখন এটা শ্রবণ করল তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করেনি এবং কেন তারা বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (সূরা আন-নূর, ২৪:১২)

বাহ্যিকভাবে ভালো ধারণা পোষণ করাটাই জরুরি। এ রকম অপবাদের ক্ষেত্রে নাক গলানোর আগে তা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। যতক্ষণ না দোষ প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ একজন মুমিনের জন্য এসব রটনায় নীরব

থাকাই শ্রেয়। পরবর্তী আয়াতে অপবাদদানকারীদের চেহারায় চপেটাঘাত করার মতোই বিবৃত হয়েছে,

لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

> তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু আল্লাহর নিকট তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন-নূর, ২৪:১৩)

কোনো একজন মহিলাকে ব্যভিচারের দায়ে দোষীসাব্যস্ত করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। এটা না করে যদি কেউ তাকে দোষী বলে তাহলে সে অপবাদদানকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। আর এজন্য তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। মিথ্যাবাদী হিসেবে তার হাশর হবে এবং বিচার দিবসে তার কপালে মিথ্যাবাদীর একটি চিহ্ন থাকবে, চিরকাল সে মিথ্যাবাদী হিসেবেই পরিচিত হবে। যদিও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক মাস অসম্ভব কষ্টে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত কষ্টের জন্য তিনি আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয়েছেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বীনের অনেক বিষয়ে আয়াত নাযিল হয়েছে, বিশেষ করে মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। সন্দেহের উপর বিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সমাজে ক্ষমা ও সৌন্দর্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সাহাবীদের জন্য বিতর্কিত পরিস্থিতিতে সংহতি প্রকাশের প্রয়োজন ছিল, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতির কারণেই তারা সমূহ আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছেন যা সাধারণত অহংকারী জনগোষ্ঠীর উপর আপতিত হয়ে থাকে। তারপরের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

> দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, সেজন্য মহাশাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। (সূরা আন-নূর, ২৪:১৪)

সাহাবীরা তখন বুঝলেন যে, তাদের আল্লাহ তাআলার এই রহমত ও বরকতের জন্য তাদের তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তারা এটাও শিখলেন যে, যে কোনো গুনাহকে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং কখনই অবহেলা করা যাবে না; বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছার আগেই তাদের শিশুসুলভ আচরণ ত্যাগ করতে হবে।

কুরআন তাদের দিকে ইশারা করেছে যারা অপবাদের ঘটনায় উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়নি,

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖۗ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ وَ لَوْ لَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖۗ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

> তোমরা যখন মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে সে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়। আর তোমরা যখন এটা শ্রবণ করছিলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান। এ তো এক গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন-নূর, ২৪:১৫-১৮)

কুরআন মাজীদ উদাহরণ হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম এবং মরিয়মের সতীত্ব ও পবিত্রতার কথা বর্ণনা করেছে। তাদের নামে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘটনাও একই রকম। তাকে বলা হতো 'সিদ্দীকা' এবং তাকে এ নামে ডাকা হতো, 'সিদ্দীকের কন্যা সিদ্দীকা'; তার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইশারা করা

হতো। তার একনিষ্ঠ শিষ্য ইমাম মাসরূক শেষ উপাধিটি দিয়েছিলেন। অন্যরা তাকে 'আয়েশা সিদ্দীকা' হিসেবেই ডাকতেন।

ঈসা এবং মরিয়মের মতোই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। সতীত্ব ছাড়াও তার সত্যবাদিতা এবং ধৈর্যের কারণে এ উপাধি তার প্রাপ্য ছিল। মরিয়মের মতো আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে প্রাত্যহিক জীবনে আল্লাহর ইবাদত ছিল মুখ্য বিষয়। তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাকে ছাড়া জীবনে আর কোনো পুরুষের সাথে তার বিয়ে হয়নি। তিনি মুনাফিক ও তাদের মিত্রদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। তারা তার সুনামকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। তার মাসব্যাপী দুঃখ-কষ্ট মুক্তির আনন্দে শেষ হয়। ঈসা এবং মরিয়মের মতোই তার পবিত্রতার প্রমাণ আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন। যদিও ঈসা এবং মরিয়মের ক্ষেত্রে তাদের নিষ্কলুষতা আরেকজনের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে; ঈসার ব্যাপারে তার মা, মরিয়ম এবং মরিয়মের ক্ষেত্রে তার শিশুর মাধ্যমে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতা সরাসরি আল্লাহর কথার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে এটা ছিল তার উপর বিশেষ অনুগ্রহ।

সতীনদের সাথে সম্পর্ক

যেসব পুণ্যবতী নারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের 'উম্মুল মুমিনীন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীগণও মানুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে একই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হতো এবং তা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলত। তবে প্রত্যেকের আচরণের যৌক্তিক কারণ ছিল এবং এজন্য প্রত্যেককে তার পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবেচনা করারও প্রয়োজন ছিল। নতুবা সবকিছু—কীভাবে তারা একে অন্যকে ডাকতেন, কীভাবে কথা-বার্তা বলতেন, তাদের কী আখলাক ছিল ইত্যাদি—সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না এবং এসব মহান মহিলাদের সম্পর্কে ধারণাও পরিষ্কার হবে না।

এসব বরকতময় মহিলারা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পরম বিশ্বস্ত এবং আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারিণী। তাদের কথায় যেমন হেকমত প্রকাশ পেত, তেমনি তাদের নীরবতায় তা ফুটে উঠত। কোনো বিচার-বিশ্লেষণে যদি তাদের চরিত্রের মাধুর্য ফুটে না ওঠে অথবা কোনো ব্যাখ্যায় যদি সার্বিকভাবে তাদের মহান আচরণকে বিবেচনা না করা হয়, তাহলে তাতে বিচারক ও ব্যাখ্যাকারীর অবহেলাই দায়ী। এখন আমরা যদি রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আচরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি তাহলে দুটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এক, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে তার সম্পর্ক এবং দুই, বাকি সব উম্মুল মুমিনীনদের সাথে তার সম্পর্ক।

খাদিজা রা.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ের আগেই খাদিজার ইন্তেকাল হয়েছিল। তাই তারা একসাথে সংসার করা এবং রাসূলের সাথে যৌথভাবে জীবন-যাপনের সুযোগ পাননি। এ ছাড়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বেশি ঈর্ষা করতেন। কারণ খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যৌবনে মধুময় স্মৃতির অংশীদারী এবং তখনকার কঠিন মুহূর্তে সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন। ওহী নাযিল হওয়ার আগে তার পনেরো বছরের সংসারজীবনে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। প্রথম ওহী নাযল হওয়ার সময় চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় সান্ত্বনাদানকারী। সর্বোপরি একজন দৃঢ় এবং অবিচল মহিলা হিসেবে তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী। তার মৃত্যুতে কাকতালীয়ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় নির্বাসিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই তার প্রথম স্ত্রীকে ভুলে যাননি যার সাথে তিনি এত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং জীবনের সবচেয়ে দুঃখ-দুর্দশার মুহূর্তগুলো একসাথে অতিবাহিত করেছেন। সুযোগ পেলেই তিনি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে স্মরণ করতেন, কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি তা করতেন।

আবুল-আস ছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মেয়ে যয়নাবের স্বামী। বদরের যুদ্ধে তিনি বন্দী হয়ে এলে তার মুক্তিপণ হিসেবে একটি গলার হার দেওয়া হয়। এটা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবেগতাড়িত হয়ে ওঠেন। কারণ এ হারটি ছিল খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের উপহার। এ হার তাকে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে বাধ্য করে এবং তিনি স্মরণ করেন, কী কঠিন মুহূর্তে খাদিজা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন! এ ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই তিনি সাহাবীদের যয়নাবের স্বামীকে মুক্ত এবং তার হারটি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১৮৩]

---

[১৮৩] আবু দাউদ, *সুনান*, জিহাদ, ১২১ (২৬৯২)।

আবুল-আস খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্মৃতিচারণের উসিলায় মুক্তি পেয়ে যান।

পরবর্তী বছরগুলোতেও এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। মক্কা বিজয়ের সময় যখন তিনি হাজার হাজার সাহাবীদের সাথে শহরে হাঁটছিলেন, লোকেরা দেখল যে তিনি তার চলার দিক পরিবর্তন করছেন এবং খাযুনের দিকে যাচ্ছেন। লোকেরা তাকে সতর্কতার সাথে অনুসরণ করছিল এবং তাদের সামনে আবার বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠল। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কবর যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু এর আগে তিনি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কবরের পাশে দীর্ঘ সময় ধরে দুআয় মগ্ন ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা লালন করেন। যখন কোনো হাদিয়া আসত, তিনি প্রথমে সেটা খাদিজার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাঠাতেন। তিনি তাদের সম্মান করতেন এবং তাদের বসার জন্য নিজের আসন ছেড়ে দিতেন। কেউ একজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'তিনি যাকে ভালোবাসতেন, আমিও তাকে ভালোবাসি।'

কেউ খাদিজা সম্পর্কে মন্দ বললে তিনি তা সহ্য করতেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতেন। একদিন যখন খাদিজার প্রসঙ্গ ওঠে, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঈর্ষান্বিতা হয়ে বললেন, 'মনে হয় দুনিয়াতে খাদিজা ছাড়া আর কোনো নারী নেই!'

এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিচলিত করে তোলে। তিনি দ্রুত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ফিরে খাদিজার গুণগুলো তুলে ধরেন—একের পর এক, অপার্থিব সব গুণাবলী। তারপর আরও

যোগ করেন : তার ঘরে আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তান দিয়েছেন যারা তার কথা মনে করিয়ে দেয়।[১৮৪]

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে বসেছিলেন। এ সময় একজন দরজায় শব্দ করে। তিনি দ্রুত দরজা খুলে জিজ্ঞেস করেন, 'ও আল্লাহ, এ তো হালাহ, খুওয়াইলদের কন্যা। প্রবেশ করুন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার বোনের গলার স্বর বুঝতে পেরেছিলেন। হালাহর কণ্ঠস্বর তাকে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে বাধ্য করে এবং তার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে তিনি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ছায়া দেখতে পান।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ দৃশ্য খুব মনোযোগ সহকারে দেখতেন, আশ্চর্য হতেন। এখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজাকে প্রাণভরে ভালোবাসেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এ রকমভাবে কাউকে ভালোবাসেন, তাহলে তার কি আর দুনিয়া-আখিরাত নিয়ে চিন্তিত হতে হবে? এই ভালোবাসা অর্জন করার জন্য যে কোনো ত্যাগই স্বীকার করা যায়। কিন্তু এর পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। যদি রাসূলের ভালোবাসার পেছনে আসল কারণ জানা যেত, তাহলে তা অর্জন করা সহজ হতো। এজন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,

> কেন ঐ মহিলাকে এত বেশি স্মরণ করতে হবে যে কিনা কয়েক বছর আগেই ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তার পরিবর্তে উত্তম নারী আপনাকে দান করেছেন।

তার প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায়, তার অন্তরের মধ্যে কী ঝড় বইছিল; আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আশা করেছিলেন এতে নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি এ গভীর ভালোবাসার কারণ

---

[১৮৪] বুখারী, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৫০ (৩৬০৭)।

বর্ণনা করবেন। তার মতো একজন মহীয়সী নারীর পক্ষে এর যথাযথ কারণ জানা থাকবে না, তা হতে পারে না। তিনি চাচ্ছিলেন রাসূলের মুখ থেকেই খাদিজার গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ শুনতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন এবং এটা তার অভিব্যক্তিতে প্রকাশও করলেন,

> তার মতো কে হতে পারবে? আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেননি। মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, সে আমাকে সত্য বলেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে তার সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন।[১৮৫]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার প্রত্যাশিত জবাব পেলেন। রাসূলের কাছে সবার জন্যই বিশেষ ভালোবাসা ছিল। একজনকে ভালোবাসা মানে আরেকজনকে অবহেলা নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রশ্নের জবাবে পুরো মুসলিম সমাজ জেনে গেল যে, খাদিজার ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করা যাবে না।

তারপর এটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য অবধারিত হয়ে গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করা এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়া। তিনি আর কখনো খাদিজার ব্যাপারে আর কিছু বলবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন।[১৮৬] আল্লাহ তাআলা খাদিজার জন্য রাসূলের মনে যে ভালোবাসা নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তা আর কেউ লাভ করতে পারেনি। তিনি মৃত্যুর পরও রাসূলের অন্তরে প্রোথিত ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার অভিব্যক্তি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

> আমি খাদিজাকে দেখিনি। তা সত্ত্বেও আমি তাকে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য

---

[১৮৫] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:১১৭ (২৪৯০৮)।
[১৮৬] তাবরানি, *মুযমাউল কবির*, ২৩:১১।

কোনো স্ত্রীকে সে পরিমাণ ঈর্ষা করিনি। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুব বেশি বেশি স্মরণ করতেন। তিনি যখনই কোনো ছাগল জবেহ করতেন, তার কিছু অংশ কেটে খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন।[১৮৭]

রাসূল সা.-এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক

খাদিজার ইন্তেকালের পর সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহাই প্রথমে রাসূলের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আসলে যিনি রাসূলের এ বিয়ের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, তিনি একই সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং সওদার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। হিজরতের তিন বছর পূর্বে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল হয়। আর এর কিছুদিন পরই সওদার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। আর বিয়ের তিন বছর পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের ঘরে ওঠেন।

মদীনায় হিজরতের পরে বাকি সব স্ত্রীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সবাই উম্মুল মুমিনীন হিসেবে সম্মানিত হন। তারা হচ্ছেন, হাফসা হিজরতের তৃতীয় বছর; উম্মে সালামা চতুর্থ বছর; জুওয়াইরিয়া এবং যায়নাব বিনতে জাহশ পঞ্চম বছর; উম্মে হাবিবা ষষ্ঠ বছর; মাইমুনা এবং সাফিয়্যা সপ্তম বছর। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল চুয়ান্ন বছর, হাফসার সময় ছাপ্পান্ন বছর, উম্মে সালামার সময় সাতান্ন বছর, জুওয়াইরিয়া এবং যায়নাবের সময় আটান্ন বছর, উম্মে হাবিবার সময় উনষাট বছর এবং মাইমুনা ও সাফিয়্যার সময় ষাট বছর।

এসব সৌভাগ্যশীলা নারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের সদস্যা ছিলেন যারা 'উম্মুল মুমিনীন' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। একবার সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহার আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তখন তিনি খুব আতঙ্কিত হয়ে

---

[১৮৭] বুখারী, *সহীহ*, নিকাহ, ১০৭ (৪৯৩১)।

পড়েন, মনে করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো তাকে তালাক দিয়ে দেবেন এবং তিনি বলেন,

> আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমাকে তালাক দেবেন না এবং আমাকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। আমার সময় এখন পড়ন্ত; আমি আমার সময় আয়েশাকে দিয়ে দিলাম।[১৮৮]

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তালাক দেননি এবং তার উপাধি উম্মুল মুমিনীন হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখতে সমর্থ হলেন।

---

[১৮৮] বুখারী, নিকাহ, ৯৭ (৪৯১৪)।

আয়েশা রা.-এর মর্যাদা

রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে কারও কারও উপর ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন ছিল। বিশেষ করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সুউচ্চ মর্যাদা অন্যান্য স্ত্রীগণও স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্যই কুরআনে তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের জন্য শাস্তি বর্ণিত হয়েছে এবং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বাস্তবায়ন করেছেন। আরও অনেক কারণে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্য স্ত্রীদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্যই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরা জানতে পেরেছে কীভাবে পানি না থাকলে পবিত্র হতে হয়। মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে তাকে দেখানো হয়েছে এবং জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাকে সরাসরি বলেছেন যে, আয়েশা তার স্ত্রী হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই কুমারী ছিলেন। তার অন্যান্য সব স্ত্রীদের আগে বিয়ে হয়েছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই একমাত্র নারী যার পিতা-মাতা দুজনই মুহাজির ছিলেন। তার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার পরিবারের চার জেনারেশন—তার দাদা, বাবা, ভাই এবং দুজন ভাতিজা—ঈমান এনে রাসূলের সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একমাত্র স্ত্রী যিনি রাসূলের সাথে একান্তে অবস্থান করা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়েছে। যেসব সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া দিতে চাইতেন, তারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পালার দিন সেসব হাদিয়া দিতে পছন্দ করতেন।

তারা আশা করতেন যে, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি খুশি হবেন এবং হাদিয়াটি গ্রহণ করবেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মানববেশে কেবল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই দেখার তাওফীক অর্জন করেছেন এবং জিবরাইলও তার সাথে সালাম বিনিময় করেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মোহরানা অন্য সব স্ত্রীদের থেকে বেশি ছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা বর্ণনা করতেন। কেবল উম্মে হাবিবার ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। রাসূলের পক্ষে তার বিয়ে হয়েছিল ইথিওপিয়ায় এবং তার বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ইথিওপিয়ার বাদশা।

সওদা তার পালা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়ে দেওয়ার পর তার পালা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এটাও অন্যান্য স্ত্রীদের ভাগ্যে হয়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সম্পর্ক ছিল ভিন্ন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে খুশি করতে। মাঝে মাঝে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পছন্দমতো কপট-বিনয়ী আচরণ করতেন এবং দেখার চেষ্টা করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুশি করার জন্য কী আচরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে তার সাথে দুবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বেহেশতে দেখেছেন এবং সেখানে তার হাতের তালু থেকে উজ্জ্বল আলো বিকিরণের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যার কোলে মাথা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইলমের দিক দিয়ে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাসূলের আর কোনো স্ত্রী অথবা অন্য কোনো মহিলা সাহাবী তার মতো

এত অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেননি। অন্য যে কোনো মহিলা, এমনকি রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে তার গভীর জ্ঞানের বিশাল প্রভাব ছিল। যখন কেউ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না, তারা আয়েশার কাছে আসতেন। তারা তার কাছ থেকে আনন্দচিত্তে ফিরে যেতেন এবং অবশ্যই জবাব নিয়ে ফিরতেন।

অন্তিম অসুস্থতার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শেষ সময়টুকু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে কাটাতে চেয়েছিলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোলে মাথা রেখেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের মৃত্যুর পরও একই ঘরে থাকতেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর তার ঘরের মাটিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়েছিল, এ মাটি পৃথিবীর সব মাটি থেকে উত্তম। রাসূলের মৃত্যুর পর তার আচরণ সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ছিলেন। বড় বড় সাহাবীরা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যায় তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন এবং সন্তোষজনক জবাব নিয়ে ফিরতেন।

তার ইবাদতে নিমগ্নতা, রোযা ও নামাযের ব্যাপারে তার একাগ্রতা, তার কৃচ্ছ্রতা এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং তার সামর্থ্যে যা কিছু ছিল তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেওয়ার মানসিকতা ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে তার মহান চরিত্র চিরভাস্বর হয়ে আছে।

যারা তার এ আভ্যন্তরীণ চরিত্র সম্পর্কে জানতেন, তারা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন যেন তার দুআ এবং আশির্বাদ লাভ করা যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের মেয়ে হাফসাসহ অন্যান্য উম্মুল মুমিনীন থেকেও বেশি সমীহ করতেন। গনীমতের মাল বণ্টনের সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সবার থেকে বেশি অংশ দিতেন।

বাহ্যিকভাবে মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র অনুযায়ী সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে হিংসা করারই কথা ছিল যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চার বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। বরং এটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে সওদা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গেই

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সবচেয়ে বেশি মিল এবং বন্ধুত্ব ছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তিনি কত মহান মহিলা! আমি সওদার চেয়ে মহীয়সী কোনো নারী দেখিনি, আমি তার মতো হতে চাইতাম।'[১৮৯]

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে হাফসা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সবচেয়ে কাছের বান্ধবীতে পরিণত হন, যেন তাদের পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কের ছায়া ছিলেন তারা। তারা একসাথে সময় কাটাতেন, নিজেরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতেন। তাদের পরস্পরের মতের মধ্যে ছিল চমৎকার বোঝাপড়া এবং যথোপযুক্ত সম্মানবোধ।

উম্মে সালামা তার চতুর বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় উত্তেজনা প্রশমিত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কোনোভাবেই ছোট করে দেখার উপায় নেই।[১৯০]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জুওয়াইরিয়ার সুপ্রসন্ন ভাগ্যের প্রশংসা করে বলেন, 'সামাজিক প্রভাবের কারণে তার থেকে আর কাউকে আমি এত বেশি উপকৃত হতে দেখিনি।'[১৯১]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্য উম্মুল মুমিনীন সম্পর্কে এ রকম অনেক অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। অবশ্যই প্রত্যেকে অন্যদের থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন করে দূরে রাখত। স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করলে মনে হবে, এটাতে অন্যদের অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আচরণে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং রাসূলের পছন্দকে মেনে নিতে তার কখনো কষ্ট হয়নি।

---

[১৮৯] মুসলিম, সহীহ, রাদা, ৪৭ (১৪৬৩)।
[১৯০] বুখারী, সহীহ,সুরুত, ১৫ (২৫৮১)।
[১৯১] আবু দাউদ, সুনান, ইতক, ২ (৩৯৩১)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কিছু চাওয়ার আগেই তিনি তা বুঝতে পারতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার চাহিদাকে বলার আগেই পূরণ করতে চাইতেন। তিনি জানতেন, রাসূলের প্রতিটি বিয়েরই কোনো না কোনো কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তিনি মক্কার লোকদের সাথে বিভিন্ন গোত্রের সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে চাইতেন; তিনি ইহুদী গোত্রের সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট ছিলেন; অথবা তিনি কোনো গোত্রকে ইসলামের ছায়ায় আসার সুযোগ তৈরি করতেন। তার এ প্রত্যাশা অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিল। তার বিয়ের কারণে বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করেছে।

কয়েকটি বিয়ে ওহীর কারণে হয়েছিল। যেমন উম্মে হাবীবা এবং যয়নাবের সাথে বিয়ে। সম্ভবত এটা বলা ঠিক হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন, তখনই মক্কা বিজয় শুরু হয়ে গিয়েছিল।[১৯২] আর যয়নাবকে বিয়ে করার মাধ্যমে সমাজের অনেক ভ্রান্ত সমস্যা এবং প্রথা কোনো ধরনের শত্রুতা ছাড়াই দূর করা সম্ভব হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে ইসলামের সৌন্দর্য স্থান করে নিয়েছিল।[১৯৩]

তাদের বাড়িটি ছিল যেন একটি শিক্ষালয়। এ বাড়ি থেকে অনবরত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি হতো যা ভবিষ্যতে মুসলমানরা মুখোমুখি হবে। মহিলাদের মধ্যে যত আবেগ-অনুভূতি তৈরি হতে পারে, তার সবই এখানে পাওয়া যেত এবং লোকেরা রাসূলের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করত। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্ভবত এ কথাই বলবে যে, তাদের শান্তির ঘরে এসব ঘটনা ঘটারই প্রয়োজন ছিল যাতে ভবিষ্যতের মুসলমানদের জন্য এগুলো দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আর নতুবা মহিলাদের মধ্যে একই ধরনের সমস্যা সমাধানে উত্তম পদ্ধতি নির্ধারণ

---

[১৯২] এটা প্রসিদ্ধ যে, কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা মুমতাহিনা, ৬০:৭)।

[১৯৩] 'অতঃপর যায়েদ যখন যয়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে।' (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৭)।

অসম্ভব হয়ে যেত, যা স্বাভাবিকভাবে খুবই স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে উঠত। বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাদের অনুভূতি ছিল সাময়িক এবং স্বল্পকাল-স্থায়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হিংসা এবং ঈর্ষার পাত্র ছিলেন।

কারও প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত কোনো বিশেষ নেয়ামতকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করাতে দোষ নেই। রাসূলের কাছে নিজের যোগ্যতাকে আকর্ষণীয় করতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাঝে মাঝে এটা করতেন। একদিন তিনি রাসূলের কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি ফলবান বৃক্ষবেষ্টিত কোনো উপত্যকায় পৌঁছে দেখেন যে, কিছু বৃক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ফল খাওয়া হয়েছে, আর কিছু বৃক্ষের ফল এখনো স্পর্শও করা হয়নি। আপনি তখন কোনো বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করতে এবং বাহন বাঁধতে পছন্দ করবেন?'

তার প্রকাশভঙ্গির অর্থ ছিল পরিষ্কার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মর্ম বুঝলেন। কারণ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই ছিলেন তার স্ত্রীদের মধ্যে কুমারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনঃপূত জবাবই দিলেন, 'ঐ বৃক্ষের নিচে যে বৃক্ষের ফল এখনো স্পর্শ করা হয়নি।'[১৯৪]

রাসূলের পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকেরই আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তারা একে অন্যের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেমন হাফসাকে বেশি কাছের মনে করতেন, তেমনি সওদা এবং সাফিয়্যা ছিলেন। আর যয়নাব উম্মে সালামাসহ আরও কয়েকজনের সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখতেন।[১৯৫]

রাসূলের সংসারে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পরে সম্ভবত যয়নাবের বেশি প্রভাব ছিল। তিনি রাসূলের পিতার দিক থেকে ফুফুর মেয়ে ছিলেন

---

[১৯৪] বুখারী, সহীহ,নিকাহ, ৯ (৪৭৮৯)।
[১৯৫] বুখারী, হিবা, ৭ (২৪৪২)।

এবং বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের বোন ছিলেন। তার সাথে রাসূলের বিয়ে সরাসরি ওহীর মাধ্যমে হয়েছিল।

স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিতে কোনো দলাদলি ছিল না। কারও প্রিয়ভাজন হওয়া মানে আরেকজনের বিরাগভাজন হওয়া নয়। যদিও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হতো এবং তারা চিন্তা-ভাবনায়ও ছিলেন ব্যতিক্রম, তবুও সবকিছুতেই তারা রাসূলের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং যে কোনো ইস্যু সহজেই সমাধান হয়ে যেত।

সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। হিজরতের পরে যারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের সময় তাকে তৈরি করছিলেন, তাদের মধ্যে যয়নাব ছিলেন অগ্রগণ্য এবং পরবর্তীতে যখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হয়, তখন যয়নাবই প্রথম এর প্রতিবাদ করেন।

রাসূলের স্ত্রীগণ আখেরাতে সফলতার জন্য বেশি বেশি নেক আমল করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তারা একে অন্যের সাথে এ কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। যে বেশি নেক আমল করার তাওফীক পেতেন, অন্যরাও তাকে অতিক্রম করতে চাইতেন। কিন্তু তাতে অন্যের নেক আমলের কোনো ক্ষতি করার চিন্তা ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফ করতেন। এসময় মসজিদের ভেতর তাঁবু টাঙানো হতো। একবার আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য মসজিদে তাঁবু টাঙানো হলো। তখন রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীগণও একইভাবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকটবর্তী হতে চাইলেন এবং তারাও তাঁবুর জন্য আবেদন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের চত্বরে তাঁবুগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো কী?'

জবাব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি এগুলো দিয়ে নেকী হাসিলের ধারণা কর?

আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে যে কোনো মহিলার পক্ষেই স্বস্তিতে ইবাদত করা মুশকিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের তাঁবুগুলো খুলে ফেলার আদেশ দেন এবং নিজে ই'তেকাফ ভেঙ্গে ফেললেন। পরে রোযা শেষ করে শাওয়াল মাসে তা পূর্ণ করেন।[১৯৬]

একবার রাসূলের সাথে সফরে যাওয়ার জন্য যয়নাব এবং সাফিয়্যার নাম উঠল। এ সফর ছিল দীর্ঘ এবং আবহাওয়া ছিল চরম গরম। আর সাফিয়্যা যে উটের উপর আরোহী ছিলেন, সে উট দুর্বল হয়ে পড়ল এবং আর এগুতে পারল না। যয়নাবের যেহেতু একটি অতিরিক্ত উট ছিল, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'যেহেতু সাফিয়্যার উট হাঁটতে পারছে না, আমি চাই তুমি তাকে একটি উট দাও।'

এটা একটি যৌক্তিক পরামর্শ ছিল। কিন্তু আরবরা ইহুদী গোত্রের প্রতি চিরকালই বিরাগভাজন ছিল। বিশেষ করে বনু কুয়াইনুকা, বনু নাযিদর, বনু সুরাইযা, খাইবার এবং ওয়াদি আল-কুরার প্রতি। সাফিয়্যার পিতা হুইয়াই ইবনে আখতাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছে যা ইহুদীদের জন্য বড় রকমের উপকারে আসে। কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যয়নাব বললেন, 'আমি! এই ইহুদীকে দেব?'

তার এ চিন্তাহীন কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব কষ্ট পেলেন এবং ভীষণ নাখোশ হন। তার বিবেচনায় এটা কোনো ঈমানদারের আচরণ হতে পারে না এবং এটা নিশ্চিতভাবেই জাহিলিয়্যাতের যুগের কাজ। তিনি যয়নাবের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর অবস্থান নিলেন এবং তার এ অনুভূতিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি তাকে কয়েক মাস এড়িয়ে চলেন। যয়নাব খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং তার কথার কারণে চরম শাস্তির মুখোমুখি হলেন। দুনিয়ায় সবচেয়ে শান্তির কারণ ছিল তিনি রাসূলের সহধর্মিণী হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখন তার কাছে সেটা মলিন মনে হচ্ছে। যয়নাব খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি আবার আগের সুখের দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। যখন এই অবস্থা দীর্ঘায়িত

---

[১৯৬] বুখারী, ইতিকাফ, ৬ (১৯২৮)।

হচ্ছিল, তখন বিরোধ নিষ্পত্তির আশাকে তার কাছে অলীক স্বপ্ন মনে হতে থাকে। এমনকি তিনি তার বিছানা-পত্র গোছাতে শুরু করেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় রাসূলের সঙ্গে মধ্যস্থতার করার জন্য তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে যান।

এটা একটি চমৎকার পরিকল্পনা ছিল। নিশ্চিতভাবেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যস্থতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হবেন। কয়েকদিন পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্য দুপুরে যয়নাবের ঘরে আসেন। এভাবে তার দুঃসময়ের অবসান হয় এবং তার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উজ্জ্বল চেহারার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর থেকে দুশ্চিন্তার কাল মেঘ সরে যায়। কিন্তু তারপরেও একটি কথা থেকে যায়, এখন থেকে আর কারও নামে কোনো মন্দ কথা বলা যাবে না।[১৯৭]

যদিও রাসূলের কাছে বিশেষ অবস্থানের কারণে কোনো বিদ্বেষ ছাড়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ঈর্ষা করা হতো, তথাপি যয়নাব সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিচের উক্তি করেন,

> দ্বীনের ব্যাপারে যয়নাবের মতো সচেতন মহিলা আমি আর দেখিনি। নিশ্চিতভাবেই তিনি সবচেয়ে বেশি তাকওয়া-পরহেজগারীর অধিকারিণী ছিলেন; তারা কথা-বার্তা ছিল সত্যনিষ্ঠ এবং তিনি তার আত্মীয়-স্বজনদের খুব খেদমত করতেন। দানের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রগামী ছিলেন, অন্যের সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং আল্লাহর খুব নৈকট্যশীল ছিলেন। যদিও তিনি একটু রাগী ছিলেন, কিন্তু সেটা একটু পরেই মিলিয়ে যেত।[১৯৮]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে আমার সাথে আখিরাতে আগে মিলিত হবে।'

---

[১৯৭] আবু দাউদ, *সুনান*, ৪ (৪৬০২)।
[১৯৮] মুসলিম, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবাহ, ৮৩ (২৪৫২)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর রাসূলের স্ত্রীদের এ কথা মনে ছিল এবং তাদের মধ্যে কে আগে ইন্তেকাল করবে - এটা জানার জন্য সবাই জড় হয়। সবাই সবার হাত সোজা করে মাপতে শুরু করে এবং কারটা বেশি লম্বা তা জানার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা কোনো সমাধানে পৌছতে সক্ষম হননি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'যয়নাব বিনতে জাহশ ইন্তেকাল করার আগ পর্যন্ত আমরা হাত মাপতেই থাকি। তার ইন্তেকালের পর আমরা বুঝতে পারি যে, তার হাতই লম্বা ছিল। আসলে এখানে গূঢ় রহস্য হচ্ছে, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীলা ছিলেন। আমরা সবাই কম-বেশি দান-সদকা করতাম, কিন্তু তিনি নিজের হাতে এটা সবচেয়ে বেশি করতেন। একটু একটু করে টাকা জমিয়ে আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন।'[১৯৯]

একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সাফিয়্যার ছোটখাটো গড়নের দিকে ইশারা করে বলেন, 'আপনি তাকে যা দেন, তা তার জন্য যথেষ্ট।'
তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, রাসূলের জন্য তাকে বেশি সময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব গোস্বা হয়ে বললেন, 'যদি তোমার কথাটাকে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা সাগরের পানিকে ময়লা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।'

এ কথায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব দুঃখ পেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাগাতে চাননি, অথবা সাফিয়্যার সমালোচনাও করতে চাননি। তিনি বললেন, 'আমি কেবল তার বর্ণনা দিতে চেয়েছিলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, 'আমাকে যদি দুনিয়াও দিয়ে দেওয়া হয়, আমি কখনো এ রকম কথায় সন্তুষ্ট হব না।' এ ঘটনার পর অন্তরকে যে কোনো মন্দ ধারণা থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি সাফিয়্যাকে নিজের ঘরে ডেকে আনেন এবং তার বান্ধবীতে পরিণত হন। তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একসাথে কাজ করেন।

---

[১৯৯] বুখারী, সহীহ, যাকাহ, ১০ (১৩৫৪)।

সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভালো রান্নার জন্য যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি তার চেহারার সৌন্দর্যের জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীগণ তাকে রান্নার জন্য ঈর্ষা করত। মৃত্যুর সময় তার কাছে এক লাখ দিরহাম ছিল যার এক-তৃতীয়াংশ তিনি তার বোনের ছেলের জন্য অসিয়ত করে যান। কেউ কেউ এত বড় অংশ তার বোনের ছেলেকে দিতে চাচ্ছিল না। কারণ সে ছিল ইহুদী। এ খবর শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি যা অসিয়ত করে গিয়েছেন, তা-ই তার বোনের ছেলেকে দিয়ে দাও।'

রাসূলের স্ত্রীগণ যথাসম্ভব সাম্য বজায় রেখে চলতেন। যখন কেউ কোনো বিষয়ে আঘাত পেতেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাই তা মিটিয়ে দিয়ে তাকে খুশি করার জন্য চেষ্টা করতেন যেন সেটা ভুলে যাওয়া সহজ হয়। রাসূলের স্ত্রী হিসেবে তাদের সহজ-সরল এবং পবিত্র জীবনের প্রত্যাশা না করাটাই ছিল অবাস্তব।

উম্মে হাবিবা মৃত্যুর সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে ফিরে বললেন, 'যেহেতু আমরা দুজনই রাসূলের স্ত্রী ছিলাম, সেজন্য এ রকম হতে পারে যে, আমি তোমার কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছি অথবা তুমি করেছ। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাকে এ কারণে মাফ করে দিন।'

কোনো বর্ণনাতে পাওয়া যায় না যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মে হাবিবার মধ্যে সামান্যতম কোনো দ্বন্দ্ব ছিল। তবে এই বরকতময় নারীরা খুব সংবেদনশীল ছিলেন। কারণ তারা রাসূলের স্ত্রী হওয়ার মতো গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং তারা তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক ছিলেন। তারা কারও সাথে সম্পর্কের অবনতি বা ফাটল রেখে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেননি। এ ব্যাপারে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনার সবকিছুকে ক্ষমা করে দিন, আপনার দুর্বলতাকে ঢেকে দিন এবং আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিন।'

উম্মে হাবিবা এতে খুব খুশি হলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকেও খুশি করে দিন।'

তারা ছিলেন সৎ গুণাবলির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কও ছিল আরও বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত। আমাদের একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিংসা এবং ঈর্ষা মাঝে মাঝে দানা বেঁধে উঠেছে, তা কখনো স্থায়ী হয়নি। ওহী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার আচরণে তারা সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে এসেছেন।

একবার রাসূলের সব স্ত্রীগণ সওদার ঘরে একত্রিত হয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করে। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা নিচের সিদ্ধান্তে উপনীত হন,

> হে উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম! লোকেরা রাসূলকে হাদিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আয়েশার পালার দিনের জন্য অপেক্ষা করে। আয়েশা যেমন কেবলই নেক কাজ করতে চায়, আমরাও তা-ই চাই। তোমরা কেন রাসূলের কাছে গিয়ে এ কথা পেশ কর না যে, তিনি যেন লোকদেরকে হাদিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পছন্দকে ত্যাগ করে যখন যা ইচ্ছা দিতে বলেন।

এটা ছিল সবার মনের কথা। তাই উম্মে সালামা রাসূলের কাছে এ কথা পেশ করলেন। তিনি এতে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এসে উম্মে সালামা ঘটনার বিবরণ দিলেন। কিন্তু তারা তাকে আবার রাসূলের কাছে যেতে বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি এ পরামর্শে বিরক্ত হলেন।

উম্মে সালামা আবার আশাহত হয়ে ফেরত গেলেন। তখন অন্যান্য স্ত্রীগণ আবার তাকে রাসূলের কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি তৃতীয়বারের মতো যখন রাসূলের কাছে গিয়ে একই অনুরোধ করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ করে বললেন,

> হে উম্মে সালামা! আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিও না। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে ছাড়া তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার লেপের মধ্যে আমার নিকট ওহী এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির গভীরতা উপলব্ধি করে উম্মে সালামা দ্রুত তার আচরণ পরিবর্তন করলেন এবং এ অনুরোধ করা থেকে বিরত হলেন। তারপর বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যেহেতু আমি আপনাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছি।'

অন্যান্য স্ত্রীগণ সামনে না থাকায় কী পরিস্থিতি হয়েছিল অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী অবস্থায় জবাব দিয়েছেন, তা উপলব্ধি করতে পারেননি। তারা ভেবেছেন, উম্মে সালামা হয়তো তাদের বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি। তারপর তারা ফাতিমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী বানায়,

> আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে এ কথা বল যে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার স্ত্রীগণ আপনার কাছে আবু বকরের মেয়ের ব্যাপারে ন্যায়বিচার আশা করে'।

সম্ভবত আগের পরিস্থিতির কোনো কিছু বিচার-বিবেচনা না করেই ফাতিমা রাসূলের স্ত্রীদের অভিযোগ পেশ করে। ফাতিমা রাসূলের চেহারায় বিরাট পরিবর্তন দেখতে পায় - তিনি হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আমার কন্যা, আমি যাকে ভালোবাসি তুমি কি তাকে ভালোবাস?'

এটা ছিল তাকে প্রভাবিত করার মতো একটি প্রশ্ন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোনো রকমের দ্বিধা ছাড়াই জবাব দেন, 'হ্যাঁ।'

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের ব্যাপারে তৃতীয় কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করেননি। তার বলার ধরন ফাতিমাকে তার জায়গায় স্থির করে ফেলে এবং তিনি তার অনুরোধ ত্যাগ করেন; তিনি রাসূলের স্ত্রীদের কাছে পুরো পরিস্থিতির বিবরণ পেশ করেন। তারা আবার ফাতিমাকে তাদের অনুরোধকে পরিষ্কারভাবে রাসূলের কাছে পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ফাতিমা এবার কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। রাসূলের মেয়েদের জন্য এ বিষয়ে নাক গলানো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আর এভাবে স্ত্রীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তারা আয়েশার ব্যাপারে রাসূলের অবস্থান পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি।

রাসূলের স্ত্রীগণ তারপর যয়নাবকে একই অনুরোধ করার জন্য পাঠাতে মনস্থির করেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তার সাথে রাসূলের বিয়ের ব্যাপারে ওহী নাযিল হয়েছিল। এজন্য সব স্ত্রীদের মধ্যে তার অবস্থান ছিল খুবই উজ্জ্বল। তার সাথে রাসূলের বংশগত সম্পর্কও তাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দিয়েছিল। যয়নাব রাসূলের কাছে এসে অনুনয় করে বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার স্ত্রীগণ আপনার কাছে আবু কুহাফার ছেলের মেয়ের ব্যাপারে ন্যায়বিচার আশা করে।'

তিনি একটু উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তা শুনতে পেলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কথাটা শুনেছেন, এটা বুঝতে পেরে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকে তাকালেন এবং তার দৃষ্টির ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রভাবিত হলেন। তারপর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং যয়নাব একসাথে কথা বলা শুরু করলেন। আয়েশা ছিলেন খুব জ্ঞানী এবং অন্যের সাথে আলোচনা ও তাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার মেধা ছিল প্রখর। শেষ পর্যন্ত যয়নাব আত্মসমর্পণ করেন। এ ঘটনা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে তার প্রশংসায় বলেন, 'আসলেই তুমি আবু বকরের মেয়ে।'[২০০]

[২০০] বুখারী, সহীহ, হিবা, ৭ (২৪৪২)।

তাহরিমের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল তিনি সাধারণত আসরের নামাযের পর সব সহধর্মিণীদের ঘরে গিয়ে দেখা করতেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাদের সাথে কিছু সময় কাটাতেন। এজন্য তিনি প্রত্যেকের জন্য প্রতিনিয়ত একটি সময় নির্ধারণ করেছিলেন। যখন রাসূলের জন্য এটা নিয়মিত রুটিনে পরিণত হলো, তখন রাসূলের স্ত্রীগণ প্রতিদিন আসরের নামাযের পরে তার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন।

একদিন এর ব্যতিক্রম হলো। তারা যথারীতি আসরের পর রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তাদের অপেক্ষার পালা দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। প্রতিটি মিনিট গত হওয়ার সাথে সাথে তাদের উদ্বেগও বাড়তে থাকে। তাদের আশঙ্কা হতে থাকে, অন্যান্য দিনের মতো আজকে তারা হয়তো রাসূলের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবেন না।

হঠাৎ করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন এবং তারাও খুব আবেগতাড়িত হয়ে ওঠেন। দ্রুত তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাগত জানান। যদিও তার একটু দেরি হয়েছিল, কিন্তু তার উজ্জ্বল চেহারা এবং তার উপস্থিতি ঘরকে আনন্দে ভরে দিল। কিন্তু তাদের মনে একটি সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্য স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কথা বলেন এবং রাসূলের কাছে দেরি হওয়ার কারণ জানতে আগ্রহী হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যয়নাবের গোত্রের এক মহিলা আমার জন্য কিছু মধু হাদিয়া এনেছিল।'

রাসূলের সব স্ত্রীগণ বুঝতে পারলেন যে, এ দেরি হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে যয়নাব। তারা একটু ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বুঝতে দেননি।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার সময় তাদের মনে হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গন্ধ পছন্দ করেন না এবং তা এড়িয়ে চলেন। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে যার কাছেই আসবেন, তিনি তখন জিজ্ঞেস করবেন যে, 'আপনি কি পান করেছেন?' এবং 'কিসের গন্ধ আসছে?'। এতে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন যে, তিনি মধু পান করেছেন, তাহলে প্রত্যেকেই এই জবাব দেবে, 'আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের দুর্গন্ধ আসছে (মাগাফীর একপ্রকার উদ্ভিদের ফুল যা থেকে মৌমাছি মধু আহরণ করে)।'

যে রকম পরিকল্পনা ছিল, তেমনই করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের একজনের কাছে গেলেন। তার কাছ থেকে এই মন্তব্য শুনলেন। তিনি বললেন, 'না, আমি কেবল যায়নাবের ঘরে একটু মধুর শরবত খেয়েছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও শান্তভাবে এ জবাব দিয়েছিলেন, তবু তিনি একটু বিব্রতবোধ করলেন। তিনি এতটাই দুঃখ পেলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আর মধুর শরবত পান করবেন না।

এ ধরনের একটি প্রতিজ্ঞা হয়তো সাধারণ কোনো মানুষের জন্য কোনো বিষয়ই না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তার কাছে ওহী আসত যা তখনো জারি ছিল। আর ওহীর ধারাবাহিকতায়ই ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্য তার প্রতিটি কথায়ই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে আছে।

এর কিছুক্ষণ পরেই জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে নাযিল হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘামছিলেন এবং মনে হচ্ছিল যে, তিনি ওহীর ভারে তার হাড়-গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যাবে এবং তিনি হয়তো পঙ্গু হয়ে যাবেন।

একটু পর তার চেহারায় মোবারক হাসি ফুটে ওঠে। আল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে আয়াত নাযিল করেছেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

> হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? (সূরা তাহরিম, ৬৬:১)

এ আয়াত থেকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অনুভব করা যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপলক্ষ করে মানুষের কল্যাণে ইসলামের নতুন বিধি-বিধান নাযিল হয়। প্রথমত, আল্লাহ যা হালাল সাব্যস্ত করেছেন, সেটাকে কখনো হারাম বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ক্ষমা এবং জ্ঞান প্রয়োজন যা সর্বজ্ঞানী এবং পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। তৃতীয়ত, যে কিনা হালাল জিনিসকে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে। আয়াতে বলা হয়েছে,

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

> আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাহরিম, ৬৬:২)

আয়েশা রা. এবং ফাতিমা রা.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়েদের মধ্যে ফাতিমার সাথেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক ছিল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার বিয়ের আগ পর্যন্ত প্রায় এক বছর বা তার চেয়ে কিছু কম সময়ের জন্য তারা একসাথে কাটান। ফাতিমার বিয়ের সময় সকল উদ্যোগ-আয়োজনে অন্যদের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও শরিক ছিলেন। তাদের সাদামাটা জীবন শান্তিতে ভরা ছিল। ঐসব দিনের কথা বলতে গিয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিচের কথাগুলো বলেছেন,

> রাসূলুল্লাহ আমাদের ফাতিমাকে আলীর নিকট পৌঁছানোর জন্য তাকে সাজসজ্জা করিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দেন। আমরা (আলীর) ঘরে বাতহা উপত্যকার নরম মাটি বিছিয়ে দিলাম, অতঃপর দুটি বালিশে খেজুর গাছের ছাল ভরে তা পরিষ্কার করে রেখে দিলাম। এরপর আমরা খোরমা, কিশমিশ ও মিঠা পানির দ্বারা পানাহারের ব্যবস্থা করলাম, কাপড় ও পানির মশক ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি কাঠের খুঁটি ঘরে কোণে দাঁড় করিয়ে দিলাম। আমরা ফাতিমার বিবাহের চেয়ে অধিক পরিপাটি ব্যবস্থা আর দেখিনি।

আলী ফাতিমাকে নিয়ে যে ঘরে থাকতেন, সে ঘরের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরের মাঝখানে শুধু একটি দেয়াল ছিল। সে দেয়ালে একটি জানালাও ছিল। ফাতিমার সাথে তিনি জানালা দিয়ে কথা-বার্তা বলতেন।[২০১]

---

[২০১] সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, *সিরাতু সায়্যিদাতি আয়েশা*, ১২২।

ফাতিমা ছিল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সবচেয়ে ভালো বান্ধবী। সব বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করতেন। ফাতিমা তাকে নিজের আনন্দ-বেদনার কথা এবং নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা যা তিনি এখনো অর্জন করতে পারেননি, তাও বলতেন। আটা পিষতে পিষতে একবার ফাতিমার হাতে ফোসকা পড়ে যায়। তখন তিনি রাসূলের কাছে একজন দাসীর জন্য আসেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিষয়টি জানিয়ে দাসী না নিয়েই ফিরে যান।[২০২]

ফাতিমা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে খুব ভালোবাসতেন। তাদের এ ভালোবাসা পরস্পরের জন্য একই রকম ছিল। ফাতিমার হৃদয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য আলাদা স্থান ছিল। একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কে রাসূলের কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন?'

কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দেন, 'ফাতিমা।'[২০৩]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আরও বলেন, 'আমি ফাতিমার চেয়ে একমাত্র তার পিতা ছাড়া আর কোনো ভালো মানুষ কখনো দেখিনি।'[২০৪] তিনি কখনো বিরূপভাবে ফাতিমাকে দেখেননি। তিনি বলেন,

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাল-চলন, উঠা-বসার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যদি কাউকে দেখে থাকি, তাহলে তিনি হলেন ফাতিমা। তিনি যখন তার পিতার সাথে দেখা করতে আসতেন, পিতা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। মেয়ের কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আবার পিতা তার ঘরে গেলে মেয়ে উঠে দাঁড়াতেন, পিতাকে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন।[২০৫]

---

[২০২] বুখারী, *সহীহ*, খুমস, ৬ (২৯৪৫)।
[২০৩] তিরমিযি, *সুনান*, মানাকিব, ৬১ (৩৮৭৪)।
[২০৪] তাবরানি, *মুযমাউল আওসাত*, ৩:১৩৭।
[২০৫] আবু দাউদ, *সুনান*, আদব, ১৫৫ (৫২১৭)।

ফাতিমার গুণাবলি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। আহলে বাইআতের ঘটনায় প্রথমে ফাতিমা, তারপর আলী, হাসান এবং হুসাইনের কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তারা আমার আহলে বাইআত।'[২০৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের আগের দিন, তার স্ত্রীগণ রাসূলের ঘরে এলেন। তারপর ফাতিমা এলেন। তার আসার ভঙ্গি রাসূলের মন থেকে মুছে যায়নি। এমনকি তার হাঁটার শব্দও তার কানে বাজছিল। তাকে দেখেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আমার কন্যা! স্বাগতম।' পরম মমতাভরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পাশে বসালেন। মনে হচ্ছিল ঘরে কোনো অপূর্ণতা ছিল। ফাতিমার আসার সাথে সাথে তা পূর্ণতা পেল।

তারপর স্ত্রীগণ দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমার কানে কানে কিছু বললেন। পুরো ঘরে সুনসান নীরবতা। ফাতিমা কাঁদতে লাগলেন। তার কান্নায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথিত হলেন। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তার দিকে ঝুঁকে কানে কানে কিছু কথা বললেন। আশ্চর্যজনকভাবে ফাতিমা, একটু আগে যিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, হাসতে লাগলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফাতিমার প্রথমে কান্না এবং পরে হাসির কারণ না জেনে থাকতে পারলেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে গোপন কথা বললেন, আর তুমি কাঁদছ। তুমি কি আমাকে বলবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন?'

ফাতিমা জবাব দিলেন, 'আমি রাসূলের গোপন কথা ফাঁস করব না।' ফাতিমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কী বলেছেন, এটা কাউকে বলতে চাননি, এমনকি আয়েশাকেও না। আবার আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেটা না জেনে স্থির হতে পারছিলেন না।

---

[২০৬] তিরমিযি, *সুনান*, মানাকিব, ৬১ (৩৮৭১)।

রাসূলের ইন্তেকালের পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আবার ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কারণে আমি জানতে চাচ্ছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন তোমাকে কী বলেছিলেন?'

ফাতিমা যখন বললেন, 'আমি এখন সেটা বলতে পারি', আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন খুব খুশি হলেন, যেন তাকে পুরো পৃথিবী দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি এমন এক তথ্য জানতে যাচ্ছেন যা তার পরিবারের সাথে রাসূলের অনুভূতিকে জানার ব্যাপার। ফাতিমা বললেন,

> প্রথমবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, প্রতি বছর জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম আমার সঙ্গে একবার কুরআন শরীফ দাওর করে থাকেন, এ বছর দুবার দাওর করেছেন। মনে হয় আমার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে (আমি এই রোগে ইহজগৎ ত্যাগ করব)। এটা শুনে আমি কেঁদেছি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।' এই সুসংবাদে আমি হেসেছি।[২০৭]

---

[২০৭] বুখারী, সহীহ, মানাকিব, ২২ (৩৪২৬)।

রাসূল সা.-এর জীবনের অন্তিম সময়ে আয়েশা রা.-এর ভূমিকা

দিন শেষ হয়ে গেল। যেদিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসূলের বিয়ে হয়েছিল, সেদিন এখনো স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, মনে হয় গতকালের ঘটনা! ইতিমধ্যে দশ বছর পার হয়ে গেছে। তিনি গত এক দশক ধরে এক ব্যতিক্রমী জীবন-যাপন করেছেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন; তার দরজা নিঃস্ব, এতীম, মহিলা এবং জ্ঞান পিপাসুদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল রাসূলের সাথে তার সময় শেষ হয়ে আসছে। শেষ বছর চারিদিকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল।

সফর মাসের শেষ সোমবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে গেলেন। তার সাহাবীদের প্রতি শেষ দায়িত্ব পালন করলেন। যারা চলে গিয়েছেন, তাদের মাগফেরাতের জন্য দুআ করলেন।

যখন তিনি ফিরে আসছিলেন, তখন তার প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হলো এবং তিনি মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তার জ্বর এত বেশি ছিল যে, এটা মাথার পাগড়ি স্পর্শ করলেও বোঝা যেত।

একই সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহারও মাথাব্যথা শুরু হয়। বিপদের সময়ও তারা এক সাথে ছিলেন, এ অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের দিকে ফিরে বললেন, 'হায় আমার মাথা!'

তিনি আশা করেছিলেন যে, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু কথা বলবেন এবং নিজের কষ্টের কথা একটু হয়তো ভুলে যাবেন।

কিন্তু তিনি এমন জবাব পেলেন যা তিনি আশা করেননি, 'উহ! আমারও তো ভীষণ মাথাব্যথা!'

সবাই রাসূলের দিকে সহমর্মিতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার মাথাব্যথাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন যা তারা আগে খেয়াল করেননি এবং ব্যথা কমারও কোনো লক্ষণ ছিল না।

তার এ অবস্থা পরবর্তী এগারো দিনে কোনো পরিবর্তন হলো না। কিন্তু তিনি তারপরেও মসজিদে নামাযে ইমামতি করতেন।

উত্তম আচরণ ও ন্যায়ের পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি অন্তিম অসুস্থতার সময়ও স্ত্রীদের দৈনন্দিন রুটিন ঠিক রেখেছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীগণ এটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, তার অন্তর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকেই নিবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের উন্নত মানবিক বোধ ও অনুভূতির কারণে তারা রাসূলের সব চাওয়াকে স্বাভাবিক মনে করতেন। অবিশ্বাস্য ধীশক্তির অধিকারিণী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বিদায়ের সময়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুক এবং মনে ধারণ করুক, এটাই হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন। স্ত্রীগণ তাদের নির্ধারিত দিন ছেড়ে দিলেন এবং তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুশি করল। এটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আরও বেশি উৎফুল্ল করে। পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবনের শেষ কয়েক দিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়াতে পারছিলেন না এবং হাঁটতে গেলে মাটিতে পা হেঁচড়াতে হতো। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এলেন। তিনি এ ঘরে তার শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকবেন!

তিনি অসুস্থতার ভয়াবহতা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার আবার লোকদের সামনে এলেন। তিনি চাচ্ছিলেন কিছু লিখে রেখে যেতে যাতে লোকজন তার

মৃত্যুর পর বিভ্রান্তিতে না পড়ে। নিকটস্থ সাহাবীদের তিনি বললেন, 'আমার কাছে (কাগজ ও কলম নিয়ে) আস, তোমাদের জন্য একটি বিষয় লিখিয়ে দিয়ে যাই, যার পরে তোমরা কখনো পথহারা হবে না।'

এটা ছিল একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। যারা তার এ অবস্থা দেখছিলেন, তারা বললেন, 'ব্যাধির প্রকোপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভূত করে ফেলেছে। এ অসুস্থতার সময় তাকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আমাদের কাছে তো আল-কুরআন রয়েছে; আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'

সাহাবীরা দুভাগ হয়ে গেলেন। কেউ কেউ উপরের মতের উপর ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে, রাসূলের কথাগুলো লিখে রাখা দরকার। উভয় পক্ষের বাক-বিতণ্ডা বেড়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'তোমরা সবাই এখান থেকে উঠে যাও।'

তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ফিরে গেলেন। তার তীব্র জ্বর এবং মারাত্মক ব্যথা সত্ত্বেও তিনি লোকদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের সাথে নামায পড়তেন। তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন এবং সূরা মুরসালাত পুরো তিলাওয়াত করলেন।

তারপর তিনি ঘরে ফিরে এলে রাসূলের অসুস্থতায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভয় পেয়ে গেলেন। তা প্রতি মুহূর্তেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হলো তিনি যেন দাঁড়াতেই পারছেন না। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা কি জামাতে নামায আদায় করেছে?

না, তখনো জামাত হয়নি। ঐ দিন পর্যন্ত সাহাবীরা রাসূলের ইমামতিতেই নামায আদায় করেছেন। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো মসজিদে আসেননি, এজন্য সবাই নামায না পড়ে অপেক্ষায় ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, 'না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

তিনি নিজে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বললেন, 'আমার জন্য পানির ব্যবস্থা কর, আমি অযু করব।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে বললেন, তা করা হলো। তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন এবং খুব কষ্টে অযু করলেন। তিনি যখন নামাযের জন্য বের হবেন, তখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মসজিদে প্রতিদিন যেতেন, আজ সেখানে যেতে পারলেন না। শান্তির ঘরে দুঃখের বন্যা বয়ে গেল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পাগলের মত তার কাছে ছুটে গেলেন। আল্লাহর শোকর, একটু পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, 'না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

যদিও এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু তিনি নামাযে তাদের ইমামতি করতে পারবেন বলে মনে করলেন না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে বল।'

এটাতে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে যে, রাসূলের ইন্তেকালের পর তার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু আবু বকর মুসলিম জাতির নেতৃত্ব নেবেন। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর একজন কোমল-প্রাণ মানুষ। কুরআন পাঠ করতে লাগলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না। তাই, আপনি আবু বকর ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আদেশ করতেন।'

এ কথার পেছনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনের আশঙ্কা ফুটে ওঠে। রাসূলের শূন্যস্থান কারও পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, লোকেরা আবু বকরের সমালোচনা করবে যদি তিনি রাসূলের শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করেন। কারণ এতে লোকেরা রাসূলের অনুপস্থিতি অনুভব করবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার

পিতাকে লোকদের এসব সমালোচনা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, 'আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে বল।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আবার একই জবাব দিলেন। কিন্তু তার জবাবে রাসূলের কথার কোনো পরিবর্তন হলো না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পুনঃপুন আবেদনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব গোস্বা হলেন। তার এ চেষ্টাকে অযৌক্তিক বোঝানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা তো দেখছি ইউসূফ (ﷺ)-এর সাথে আচরণকারী মহিলাদের মতো।[২০৮] আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বুঝলেন, রাসূলের ইন্তেকালের পর লোকদের নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন হতে পারে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উত্তরসূরি নির্বাচন করে রেখে যেতে চান। এর মানে হচ্ছে তার পিতা আবু বকর রাসূলের দায়িত্বকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারবেন। তাই তিনি আবু বকরকে সংবাদ দিলেন এবং আবু বকর জামাতে ইমামতি করলেন। কিন্তু তার এই ইমামতি কেবল এক নামাযের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। তারপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর নামাযে ইমামতি করতে পারেননি। আবু বকরই তারপর থেকে ইমামতি করেছেন।[২০৯]

রবিবার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে যা কিছু ছিল সব বিতরণ শুরু করলেন; বাহ্যিকভাবে তিনি এ দুনিয়ায় যেমন শূন্য হাতে এসেছিলেন, তেমনভাবেই এখান থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছিলেন। তিনি এমনভাবে সবকিছু উজাড় করে দান করে দিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত

---

[২০৮] ইউসূফ আ.-এর সহচরী অর্থাৎ আযীযের স্ত্রীর চা-চক্রের আহবানে আগত শহরের সম্ভ্রান্ত নারীগণ যেভাবে উচ্চ প্রশংসার জালে আবদ্ধ করে ইউসূফ আ.-কে সঠিক পন্থা হতে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল, তোমরাও তেমনি আমাকে আমার যথার্থ করণীয় হতে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট হচ্ছ। -অনুবাদক

[২০৯] রাসূলের ইন্তেকালের আগে বৃহস্পতিবার এশার নামায থেকে সোমবার ফজর নামায পর্যন্ত মোট সতেরো ওয়াক্ত নামাযে আবু বকর ইমামতি করেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ঘরের কুপির তেলের জন্য এক মহিলার কাছে পাঠাতে হয়েছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্ধকারে থাকতে না হয়।

তাদের বাড়িতে কোনো খাবার ছিল না। এ সময় রাসূলের ব্যবহৃত বর্মটি ত্রিশ সা' পরিমাণ গমের পরিবর্তে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখা হয়।[২১০]

সোমবার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের সাথে লাগোয়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরের পর্দা সরিয়ে দিলেন এবং মসজিদে নামাযরত অবস্থায় সাহাবীদের দেখছিলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। নামাযের জামাত একজন ইমামের পেছনে ঠিকভাবেই হচ্ছিল এবং ইবাদতে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি ছিল না। তিনি আনন্দচিত্তে পর্দাটি বন্ধ করলেন এবং ঘরের দিকে ফিরলেন।[২১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়েকে চুপে চুপে কিছু বলার পর ফাতিমা তার দুছেলেকে ডাকলেন। হাসান এবং হুসাইন। তাদের কপালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুমু খেলেন এবং তাদের সচ্চরিত্রের উপদেশ দিলেন। এই সময় অন্যান্য স্ত্রীগণও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এলেন। রাসূলের শেষ সময়টুকুতে তারা পাশে থাকতে চান। তাদের বিদায়ের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু নসীহত করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আয়েশা! তুমি ঐ স্বর্ণগুলো কী করেছ?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব দ্রুত সে স্বর্ণগুলো হাজির করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মুহাম্মাদ এ স্বর্ণসহ কেমন করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে? এগুলো সব এখনই দান করে দাও।'[২১২]

---

[২১০] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ২:২৩৯।
[২১১] বুখারী, *সহীহ*, সিফাতুস সালাত, ১২ (৭২১)।
[২১২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৪৯ (২৪২৬৮)।

রাসূলের ব্যথা আরও বেড়ে গেলে তিনি আয়শাকে বললেন, 'হে আয়েশা! নিঃসন্দেহে আমি খাইবারে যে বিষমিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম, তার প্রতিক্রিয়া এখনো অনুভব করছি। সে বিষক্রিয়ায় আমার রগগুলো সব দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে।'

তিনি একটি চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলেন। তিনি যখন তন্দ্রা এবং গরম অনুভব করলেন, চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন। এসময় তিনি বলে উঠলেন, 'নামায, নামায।' তিনি বেশ কয়েকবার শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন। তিনি লোকদের তাদের দাস-দাসী এবং গোলামদের প্রতি মানবিক আচরণ করার নসীহত করেন।[২১৩] যে বিষয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে, সে বিষয়ে তিনি নসীহত করেন।

ইত্যবসরে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সূরা আন-নাস এবং সূরা আল-ফালাক পড়ে রাসূলের শরীরে দম করেন যেভাবে তিনি তার কাছ থেকে শিখেছিলেন।[২১৪] প্রতিবার তিলাওয়াত শেষ করে তিনি রাসূলের উপর দম করছিলেন এবং তার সুস্থতার জন্য দুআ করছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে এখনই বিদায় নেবেন, এ আভাস ফুটে উঠল। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোলে মাথা রাখলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর এ সময় হাতে একটি তাজা মিসওয়াকের ডাল নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। রাসূলের দৃষ্টি সে মিসওয়াকের দিকে আকৃষ্ট হলো। আয়েশার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সেটা বুঝতে পেরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি এটা আপনাকে দেব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারায় সম্মতি জানালেন। তিনি তখন সেটা তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[২১৩] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৩:৫৯ (৪৩৮৮)।
[২১৪] বুখারী, *সহীহ*, মাগাযি, ৭৮ (৪১৭৫)।

সাল্লামকে দিলেন। কিন্তু সেটা অনেক শক্ত ছিল। এজন্য তিনি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি এটা আপনার জন্য নরম করে দেব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার ইশারায় সম্মতি জানালেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেটা চিবিয়ে নরম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিলেন।[২১৫]

দাঁত মিসওয়াক করে তিনি উপরের দিকে হাত উঠালেন। তার দৃষ্টি ছিল ছাদের দিকে এবং তার ঠোঁট দুটো নড়ছিল। রাসূলের কথা শোনার জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার মুখের কাছে নুয়ে পড়লেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

> হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার নেয়ামতে ধন্য নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং পুণ্যবানদের সাথে আপনার রহমতে প্রবেশ করান। আমাকে রাফীকে আ'লার সাথে মিলিত করুন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনে অস্থিরতা শুরু হয়। কারণ তিনি সুস্থাবস্থায় রাসূলের কাছে শুনেছেন, 'কোনো নবীকেই তুলে নেওয়া হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তার অবস্থানক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়ে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, চাইলে সে দুনিয়ায় থাকতে পারে অথবা মৃত্যুবরণ করতে পারে।'

যখন তিনি শুনলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের ব্যাপারেই দুআ করছেন, তখন আয়েশা রাসূলের এই উক্তিকে স্মরণ করে বলেন, 'তিনি আর আমাদের মাঝে থাকবেন না।'[২১৬]

হঠাৎ করেই পুরো নীরবতা নেমে আসে। কারও মুখে কোনো কথা ছিল না। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে তার জন্য দুআ করাটাই ছিল

---

[২১৫] বুখারী, *সহীহ*, খুমস, ৪ (২৯৩৩)।
[২১৬] বুখারী, *সহীহ*, মাগাযি, ৭৯ (৪১৯৪)।

ঈমানদারদের জন্য একমাত্র করণীয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও রাসূলের হাত ধরে আল্লাহর করুণা ভিক্ষা করছিলেন। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত দূরে সরিয়ে দেন। সময় হলো বিদায় নেওয়ার, এ সময় দুনিয়াকে স্পর্শ করা ঠিক না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কোলে শায়িত ছিলেন।[২১৭]

এটা ছিল আয়েশার জন্য চরম দুর্দিন। তিনি হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি শক্ত থাকার চেষ্টা করছিলেন। রাসূলের মাথার নিচে একটি বালিশ টেনে দিলেন। তারপর তিনি লোকজনকে এ দুঃখজনক সংবাদ সবাইকে জানাতে বললেন।

সাহাবীরা সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি শীঘ্রই তাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। এ সংবাদে চারিদিকে ঝড় বয়ে গেল। মদীনার পুরো শহরে বেদনা ছেয়ে গেল। কেউ কেউ, যেমন উমর, চিন্তা করলেন যে, দুনিয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। তারা কী করবেন, বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু মৃত্যু আল্লাহর অবধারিত আদেশ। তা এসে গিয়েছে। মৃত্যু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ দুনিয়ার বন্ধন থেকে ছিন্ন করে আখিরাতের পর্দার আড়ালে নিয়ে গেছে।

এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফন-দাফন করার সময় হয়েছে। রাসূলের মৃত্যুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাহাবীরা তাকে কোথায় দাফন করা হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতা আবু বকর রাসূলের একটি কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি কথা শুনেছিলাম যা আমার এইমাত্র মনে পড়েছে। তিনি বলেছেন, কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ তার নবীদের জন্য মৃত্যু সেখানেই নসীব করেন যেখানে তাকে দাফন করা হবে।'

---

[২১৭] বুখারী, সহীহ, জানাযা, ৯৪ (১৩২৩)।

এজন্য তাকে তার বিছানার জায়গাতেই দাফন করা হবে।

সুতরাং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হলো। এ দৃশ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, 'হে আয়েশা! এটাই তোমার ঘরে প্রথম এবং সম্মানিত চাঁদ।' এটা এমন একটি কথা যা কেবল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই বুঝতে পেরেছিলেন।

কয়েক বছর আগে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখন যে, তার ঘরে একের পর এক তিনটি চাঁদ ছুটে এসে পড়েছে। যখন তিনি এটা আবু বকরকে বললেন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এটা যদি সত্য স্বপ্ন হয়ে থাকে, তাহলে তোমার ঘরে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ তিনজনের কবর হবে।'[২১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে কবর দেওয়ার পর তার ঘরে সবচেয়ে উজ্জ্বল চাঁদ উদিত হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছেই শায়িত হলেন। পবিত্র হজে মক্কায় গমন অথবা আশেপাশে সামান্য সময়ের সফর ছাড়া তিনি কখনো এ ঘর ছাড়েননি। তিনি আমৃত্যু এখানেই ছিলেন।
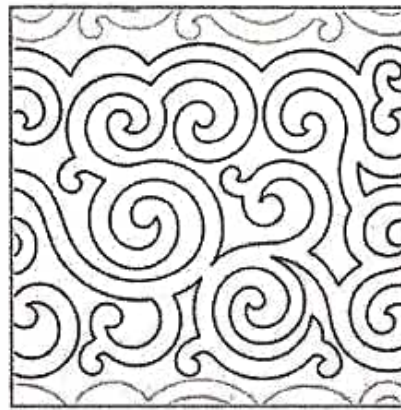
---

[218] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৩:৬২ (৪৪০০)।

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং মুআবিয়া রা.

তীব্র কষ্ট-যাতনার পরও জীবন এগিয়ে চলে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের সাথেই বেশি সময় কাটাতেন এবং তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। এখন যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে নেই, তবু বিষয়টি একই রকম রয়ে গেছে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে দুভাবে যোগাযোগ করা যেত। লোকেরা তার কাছে এসে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত অথবা শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু সংঘটিত হলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাতে হস্তক্ষেপ করতেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে রাসূলের বাণী প্রচার করতেন। রাসূলের কাছ থেকে যা শিখেছেন, তা অন্যদের সাথে আলোচনা করতেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পায়, এজন্য সচেষ্ট ছিলেন।

একদিন রাসূলের সাহাবী আবু সালামার সাথে আরেকজনের জমি নিয়ে বিরোধ হয়। দুপক্ষের কেউই জমিটির মালিকানা নিয়ে একমত হতে পারছিলেন না। আবু সালামা সমস্যাটি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জানালেন। সম্ভবত তিনি তার সাপোর্ট চাচ্ছিলেন। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পুরো ঘটনা শুনে তাকে এ জমি থেকে দূরে থাকতে বললেন। আর বললেন, তিনি রাসূলের কাছ থেকে শুনেছেন, যে কেউ এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি নিয়ে অবৈধ মালিকানা দাবি করবে, কিয়ামতে তার জন্য কঠিন আযাব রয়েছে।[২১৯]

আরেকদিন কেউ একজন এসে বলে, অনেকে রাতে নামাযে এক বা দুরাকাতে পুরো কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছে। এখন এটা ঠিক আছে কি না, জানতে চাইল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'তারা

---

[২১৯] বুখারী, *সহীহ*, মাযালিম ১৪ (২৩২১)।

তিলাওয়াত করে না বুঝে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমি রাতে উঠে প্রায় সারা রাত নামায পড়তাম। তিনি সূরা আল-বাকারা, আল-ইমরান এবং আন-নিসা তিলাওয়াত করতেন। যখন তিনি কোনো আযাবের আয়াত পড়তেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। আবার যখন তিনি সুসংবাদের কোনো আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন সেটা পাওয়ার আশা করতেন।'[২২০]

আগের মতোই লোকজন তাদের সদ্যজাত শিশু সন্তানকে দুআ ও বরকতের জন্য রাসূলের ঘরে নিয়ে আসতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের জন্য দুআ করতেন এবং আল্লাহর কাছে বরকতের জন্য প্রার্থনা করতেন। একদিন এ রকম এক শিশুকে কোলে নিয়ে বালিশে শোয়ানোর সময় দেখলেন যে, তার কপালে কাল তিলকের মতো কিছু একটি দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' তারা বলল, 'এটা তাকে বদনযর থেকে হেফাজত করবে।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুব রাগান্বিত হলেন। এটা ছিল একটি বিদআত। রাসূলের মৃত্যুর পর এ রকম বিদআতকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে ভবিষ্যতে আরও হাজারও ভুল-ভ্রান্তিকে স্বাগত জানানো। তিনি তখন তিলক মুছে দিলেন এবং বললেন,

> এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎ প্রবক্তাদের নিষিদ্ধ করেছেন এবং যারা এ কাজ করত, তিনি তাদের প্রতি খুব রাগান্বিত ছিলেন।[২২১]

নতুন নতুন এলাকা বিজয়ের পর সেখানকার বিভিন্ন রকম পানীয় পান করার ব্যাপারে লোকেরা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে অনুমতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাদের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং অপরিচিত পানীয় পান করতে নিষেধ করলেন।[২২২]

---

[২২০] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৯২ (২৪৬৫৩)।
[২২১] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:৩১৪ (৯১২)।
[২২২] বুখারী, *সহীহ*, আশরিবা, ৭ (৫২৭৩)।

হজের সময় যখন সব পথের পথিকরা মক্কার দিকে চলত, তখন মহিলারা তাকে ঘিরে তাদের মনের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত। এটা এত বেশি হতো যে, তিনি মহিলা পরিবেষ্টিত হয়েই পথ চলতেন। তিনি এ সময়টাকে রাসূলের বাণীগুলো পৌঁছানোর এবং তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার উত্তম সময় হিসেবে মনে করতেন।[২২৩]

আয়েশা একবার মীনায় কিছু যুবতীদের হাসাহাসি করতে দেখলেন। তিনি তাদের হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, 'তাদের একজন তাঁবুর রশির সাথে আটকে পড়ে গিয়েছে। তাতে তার ঘাড় ভাঙ্গার উপক্রম হয়েছে এবং চোখ নষ্ট হওয়ার দশা হয়েছে।' তিনি তাদের সতর্ক করে বললেন,

> সাবধান, হেসো না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুসলমানের পায়ে কাঁটা বিঁধলে বা এর চেয়ে নিম্নমানের কষ্টে তার মর্যাদা এক মর্তবা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সব সময় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। এ ব্যাপারে তিনি কারও অবস্থার দিকে তাকাতেন না। লোকেরা জানত, তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং সবাই তার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে চায় যেন তার মাধ্যমে বেশি বেশি উপকৃত হতে পারে।

আবু বকর রা.-এর খেলাফতকাল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন খুবই কোমল মনের মানুষ। তবে তিনি সবকিছুর উপর আল্লাহর বিধানকেই প্রাধান্য দিতেন। তার খেলাফতের শুরুর দিকে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন স্ত্রীর আবেদন পেশ করেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত

---

[২২৩] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২২৫ (২৫৯২৩)।

সম্পত্তির মিরাস দাবি করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো সম্পত্তি রেখে মারা যাননি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করতে মনস্থির করলেন। হয়তো তার কাছে এ বিষয়ে রাসূল থেকে কোনো তথ্য থাকতে পারে। কারণ তিনি জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যারা মিরাস চাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নেই।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাথা নাড়লেন এবং বললেন, 'আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা।! রাসূলের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কোনো মিরাস হবে না। কারণ তিনি বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত হবে না। আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সদাকাহরূপে গণ্য হয়।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ এবং খলীফা নিজে বিষয়টি বুঝতে পারলেন। এ বিষয়ে আর নতুন কোনো মতামতের প্রয়োজন ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তাদের চাহিদা ত্যাগ করলেন এবং সাধারণ জীবন-যাপনে ফিরে গেলেন।[২২৪]

তখন থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উল্লেখযোগ্য তথ্যের ভাণ্ডার হয়ে ওঠেন। যখন অসৎ লোকেরা তাকে কোনো বিষয়ে সন্দিহান বা ঘোলাটে করার চেষ্টা করত, তিনি আয়েশার সাথে পরামর্শ করতেন। ঐসব দিনগুলোতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কঠিন সময় পার করতে হয়েছে এবং কিছু ঘটনা এমন মারাত্মক ছিল যেন তা কোনো পাহাড়কেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে! এসব ক্ষেত্রে আয়েশার জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। প্রায় আড়াই বছর খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। মুরতাদ আর ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় শেষের দিকে। তিনি রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ততার পূর্ণ স্বাক্ষর রেখেছেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায়ও তিনি একই দায়িত্ব পালনে সচেতনতার পরিচয় দেন। তিনি তার মেয়ে আয়েশা

[২২৪] বুখারী, সহীহ, খুমুস, ১ (২৯২৬, ২৯২৭)।

রাযিয়াল্লাহু আনহাকে পাশে রাখেন এবং তার সাথে অন্তরের কথাগুলো আলোচনা করেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ইশারা পেয়েছেন—দুনিয়ার বুকে তার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস এবং দশ দিন বেঁচে ছিলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম শয্যায় পাশে ছিলেন, তেমনি পিতারও যত্ন নেওয়া শুরু করলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবিত থাকতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একটি অসিয়তনামা লেখার জন্য উসমানকে কাছে ডাকলেন। তারপর আয়েশাকে তার মৃত্যুর পর যা কিছু অর্থ-কড়ি থাকবে, তা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বললেন। তিনি বললেন, 'উমর বলাতে আমি সরকারি কোষাগার থেকে ছয়শ দিরহাম নিয়েছিলাম। অমুক জায়গায় একটি দেয়ালের নিচে সেগুলো রাখা আছে। দিরহামগুলো বের করে উমরকে বুঝিয়ে দিয়ে দিও।'

তার কথায় তার দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্তী খলীফা হিসেবে তার উত্তরাধিকার নির্বাচন করার ইশারাও করেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার আরও কিছু কথা বলার ছিল। তাকে তিনি কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি সরকারি কোষাগার থেকে একটি দিরহাম অথবা দিনারও আমার পরিবারের জন্য খরচ করিনি। বরং এর পরিবর্তে আমি ক্ষুধার্ত থেকেছি এবং পুরোনো কাপড়ই পরিধান করেছি।'

প্রতি মুহূর্তে আবু বকরের অস্থিরতা এবং হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি তার কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব তাড়াতাড়ি কারও উপর ন্যস্ত করতে চাইলেন। তিনি তার মেয়ের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। তার সাথে রাসূলের বিয়ে হওয়ার পর থেকে তাকে তিনি নিজের মায়ের মতোই দেখতেন। তার ভেজা দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাচ্ছিল কত গভীরভাবে তাকে তিনি

ভালোবাসতেন। তার এই ভালোবাসা সত্ত্বেও কঠিন সমস্যাগুলো তার সাথে আলোচনা করা থেকে তিনি বিরত থাকেননি। তিনি বললেন,

> হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি জান, আমি তোমাকে সবার থেকে বেশি ভালোবাসি এবং সম্মান করি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি তোমাকে কিছু জমি দিয়েছিলাম। তুমি কি আমাকে সেটা ফেরত দেবে? কারণ আমি এ বণ্টনে সন্তুষ্ট নই। আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমার সন্তানদের মধ্যে সব সম্পত্তি বণ্টন করতে চাই। আল্লাহর সামনে আমি এমন পিতা হয়ে দাঁড়াতে চাই না যে তার কোনো সন্তানকে অন্য সন্তানদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

কোনো রকমের দ্বিধা ছাড়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তা দিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন।[২২৫]

আবু বকর তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূল কোনো দিন ইন্তেকাল করেছেন?'

'সোমবার।'

'আজ কী বার?'

'সোমবার।'

তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস নিলেন। তার ঠোঁট থেকে এ ইচ্ছা প্রকাশ পেল, 'আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এবং আশা করি আমি এ রাতের পর আর একটি রাতও যেন না পাই।'

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফনে মোট কতটি কাপড় ছিল?'

'আমরা তাকে তিনটি নতুন কাপড় দিয়ে কাফন পরিয়েছি। এগুলোকে বলা হয় সহুলিয়্যা। তার পাগড়ি এবং পাঞ্জাবি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

---

[২২৫] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৩:১৯৫।

নিজের পরিধেয় কাপড়ের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন, 'আমার এই কাপড়টি ধুয়ে দেবে। এতে জাফরানের দাগ রয়েছে। এর সাথে আরও দুটি কাপড় দিয়ে আমাকে দাফন দেবে।'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা মূর্ত হয়ে উঠল। তার পিতা এবং মুসলিম জাহানের খলীফা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তার নিজের দায়িত্ব ভুলে গেলেন। কারণ তিনি লোকদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুকালীন সব অনুরোধ পূর্ণ করার জন্য খুবই আন্তরিকতা দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ কথাটি মানতে পারছিলেন না। সর্বোপরি আবু বকর কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি রাসূলের খলীফা এবং মুসলমানদের নেতা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উত্তরসূরি। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু এটা তো পুরোনো।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'এটাই চলবে। মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশি। আর কাফনের কাপড়ও একসময় নষ্ট হয়ে যাবে।'[২২৬]

তার আরেকটা ইচ্ছা ছিল। তিনি রাসূলের সঙ্গ চাচ্ছিলেন যা নবুওতের পর থেকে তেইশ বছর ধরে অবিচল ছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের পাশে দাফন হতে চাচ্ছিলেন। তিনি চেয়েছেন তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তার মরদেহ গোসল দেবে এবং ছেলে আব্দুর রহমান তাকে সাহায্য করবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চোখে পানি ছল ছল করে উঠল।

তিনি যেমন চেয়েছিলেন, সে রাতেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন এবং রাসূলের কবরের পাশেই তাকে দাফন করা হলো। এটাই ছিল সেই দ্বিতীয় চাঁদ যা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার ঘরে এই দ্বিতীয় চাঁদকে জায়গা করে দিলেন প্রথম চাঁদ রাসূলের পাশেই।

---

[২২৬] বুখারী, *সহীহ*, জানাযা, ৯২ (১৩২১)।

উমর রা.-এর খেলাফতকাল

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যদিও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রতি একই ভক্তি এবং শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তথাপি তার কাছে ইলমী যোগ্যতার কারণে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অবস্থান ছিল সবার উপরে। তিনি তাকে 'রাসূলের প্রিয়া' বলে সম্বোধন করতেন।

যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধবা স্ত্রীদের প্রাধান্য দিতেন। বছরে তাদের প্রত্যেককে দশ বা বারো হাজার দিরহাম দিতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিশেষ অবস্থানের জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এ থেকে দুই হাজার দিরহাম বেশি দিতেন।[২২৭]

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের এক বিশাল দায়িত্ব বহন করতেন। যদি কেউ ধর্মীয় বিধিবিধানে ইচ্ছামতো সমাধান দিত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিরোধ করতেন এবং তিনি সাধারণভাবে ধর্মীয় বিষয়াদি যেখানে-সেখানে আলোচনার সুযোগ দিতেন না। নিশ্চিতভাবেই তিনি কুরআন এবং সুন্নাহকে অন্য কিছুর সাথে মেশাতে চাইতেন না। তখনকার সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। মদীনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে যেখানে লোকজন হালকাভাবে বা তাদের খেয়ালখুশিমতো ধর্মীয় আলোচনা করতেন না, সেখানে নতুন সমস্যা সমাধানে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফতওয়া (রুলিং) দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে যেতেন; যে বিষয়ে তার জানা ছিল না সেসব বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

---

[২২৭] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪:৯ (৬৭২৩)।

করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি তার এই আচরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য বিধবা স্ত্রীদের ক্ষেত্রে একই রকম ছিল। তিনি তাদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের প্রাধান্য দিতেন। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করতেন এবং যে কোনো সম্পদ প্রাপ্ত হলে তিনি সর্বপ্রথম তাদের খেদমতে পেশ করতেন। যখন মৌসুমবিহীন কোনো ফল পেতেন, তখন তিনি সেগুলো আলাদা ঝুড়িতে করে রাসূলের স্ত্রীদের কাছে পাঠাতেন।[২২৮] যখন তিনি কোনো পশু কুরবানি দিতেন, তখনো তাদের কথা আগে স্মরণ করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'উমর খুব দেখভালো করতেন, কাউকে আলাদা করে চিন্তা করতেন না এবং আমাদের সবাইকে কুরবানির গোশতের অংশ দিতে কখনই অবহেলা করতেন না।'

ইরাক জয় করার পর প্রাপ্ত গনীমতের মাল বণ্টন করার সময় হলো। অভিজ্ঞ সাহাবীরা একত্র হয়ে বণ্টন নিয়ে আলোচনা করছেন। কিছুক্ষণ কঠিন আলোচনার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার মতে, এ বিজয়ে যারা বেশি অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যেই তা বণ্টন হওয়া উচিত।'

সবাই এতে সম্মতি প্রকাশ করল। তাই আবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কাকে দিয়ে প্রথমে শুরু করব?'

লোকেরা বলল, 'আপনার চেয়ে যোগ্য আর কে? আপনি আপনাকে দিয়েই বণ্টন শুরু করেন।'

খলীফা হিসেবে বিশেষ মর্যাদার কারণে অন্যদের কাছে তিনিই এর বেশি যোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরকম আচরণ করতে দেখেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার শেষে নিতে পছন্দ করতেন যদিও তিনিই ত্যাগের ক্ষেত্রে সবার আগে ছিলেন। এজন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, 'না, আমি আল্লাহর রাসূলের পরিবারের সদস্য দিয়ে আগে শুরু করব।'

---

[২২৮] মালিক, *মুয়াত্তা*, ১:২৭৯ (৬১৮)।

একটু পর একই যুদ্ধের গনীমতের মাল হিসেবে একটি ছোট কাপড়ের থলে ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার খলীফার সামনে আনা হলো। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এর দাম জান?'

তারা জানত না। কেউই এর মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। এজন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা সঠিকভাবে বণ্টন করতে পারছিলেন না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা অনুমতি দিলে আমি এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষকে সবাই ভালোবাসতেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই সবাই সম্মতি দিল।

দূতের মাধ্যমে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ থলেটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিজস্ব ভঙ্গিমায় খুব যত্নের সাথে তিনি এটা খুললেন। স্বর্ণ-অলংকার দেখে ভয়ে শিউরে উঠলেন এবং চিন্তায় পড়ে গেলেন। সম্ভবত তখন তার মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনাড়ম্বর জীবনের কথা ভেসে উঠেছিল। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর উমর আমার সাথে এসব কি করছে?'

তিনি তার হাত উপরের দিকে তুলে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, তার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আমি যেন আর একটি সুযোগও না পাই, এ রকম কোনো অনুগ্রহ পাওয়ার আগেই যেন আমি মরে যাই।'[২২৯]

ইয়ারমুক যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রেও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই ধরনের দায়িত্ব-সচেতন ছিলেন। তিনি রাসূলের স্ত্রীদের কথা ভুলে যাননি, তাদের জমি অথবা মাসিক ভাতার মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।[২৩০]

---

[২২৯] হাকিম, মুসতাদারক, ৪:৯ (৬৭২৫)।
[২৩০] বুখারী, মুযারা, ৭ (২২০৩)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে লজ্জা পেতেন। কারণ তিনি রাসূলকে তার সাথে বিশেষ আচরণ করতে দেখেছেন এবং রাসূল বলেছেন যে, শয়তান ভয়ে উমরের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। তাদের পারস্পরিক সম্মানবোধ ছিল। যখন শরীয়তের কোনো বিষয়ে জ্ঞানের প্রশ্ন আসত, তখন উমরের কাছে আয়েশার ভূমিকাই অগ্রগণ্য হয়ে উঠত। তিনি আবু বকরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে আয়েশার বাড়িতে যেতেন এবং তাকে সমসাময়িক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। এটা তো শুধু খলীফার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না। বরং সকল সাহাবীই একই আচরণ করতেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম আলেমরা তাদের অনুসরণ করেছেন; বিশেষ করে যখন হাদীসের কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যের প্রয়োজন পড়ত।[২৩১]

একদিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, আমর ইবনে উমাইয়া একজন বেশ্যাকে এক থান কাপড় দিয়েছে। এ খারাপ মহিলাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজ থেকে বয়কট করা হয়েছিল। এ ঘটনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব রেগে যান। তিনি আমরকে ডেকে বললেন, এ ধরনের দান আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার আশা নেই। কিন্তু আমর বেশ্যাদের সম্পর্কে রাসূলের কথা নকল করে বলেছেন, 'তাদের তোমরা যা দান করবে, তাও সদকা হিসেবে কবুল হবে।'

তার এই আত্মরক্ষামূলক চেষ্টায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তিনি বললেন যে, আমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করছেন! তাদের মধ্যে যুক্তি-তর্ক চলার এক পর্যায়ে তারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে সমাধানের জন্য যেতে রাজি হলেন। আমর বললেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি আপনাকে বলতে চাই, রাসূল কি এ কথা বলেননি যে, 'তোমরা তাদের যা দান করবে, তাও সদকা হিসেবে কবুল হবে।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবাব ছিল পরিষ্কার, 'আল্লাহ আমার সাক্ষী, হ্যাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন।'

---

[২৩১] ইবনে সা'দ, তাবাকাত, ২:৩৭৫।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথায় উমর পিছু হটে এলেন। কারণ তার বিচার সঠিক ছিল না। তিনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'কে জানে আমি আমার ব্যবসায় ব্যস্ত থাকার সময় রাসূলের এমন কত কথা শুনতে পারিনি!'[২৩২]

দিনের পর দিন যেতে থাকে। এভাবে দশ বছর চলে গেল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আসল গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এল। খলীফাকে ছুরিকাহত করা হলো এবং তিনি নিজের দেহের রক্তের উপর পড়ে গেলেন। একটি ছোট বাঁকানো ছুরির মাথায় বিষ মাখানো হয়েছিল এবং এ বিষ ও আঘাতের তীব্রতায় খলীফার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। একটু পরেই তিনি এ পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন। তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি রাসূলের পায়ের কাছে দাফন হতে চান। কিন্তু এ কথা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলার মতো সাহস সঞ্চার করতে পারেননি। আর এজন্য আয়েশার অনুমতির দরকার ছিল। কিন্তু সময় উমরের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি প্রায় তার সুযোগ হারানোর দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেলেন। তিনি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে কাছে ডেকে বললেন,

> উম্মুল মুমিনীন আয়েশার কাছে যাও। খবরদার, তাকে এ কথা বলো না যে, খলীফা তোমাকে প্রেরণ করেছেন। এখন থেকে আমি মুসলিম জাতির খলীফা নই। বলবে, উমর ইবনুল খাত্তাব পাঠিয়েছেন। তারপর বলবে, তিনি তার আগের দুবন্ধুর পাশে দাফন হতে চান।

এটা ছিল একটি পরিপূর্ণ বার্তা। রাসূল সাহাবীদের যে আদব-কায়দা শিখিয়ে গেছেন, তা ছিল অতুলনীয়। যদিও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ইচ্ছার পক্ষেই ছিলেন, তবু খলীফার কথা বলে আয়েশার উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে চাননি। তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই অনুরোধ করতে চেয়েছেন। তখনই আব্দুল্লাহ আয়েশার কাছে গেলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ দুরবস্থার খবর আগেই শুনেছিলেন এবং এজন্য চোখের পানি ফেলেছেন। সালাম বিনিময়ের পর

---

[২৩২] যারকাসি, আল-ইযাবা, ২০।

আব্দুল্লাহ কথা বলার অনুমতি নিয়ে বললেন, 'উমর আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি তার দুবন্ধুর পাশে দাফন হতে চান।'

কে চাইবে না রাসূলের পাশে দাফন হতে? এটা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন নিজের চেয়ে তার মুসলিম ভাই-বোনকে প্রাধান্য দেওয়াই শ্রেয়। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের দিকে ফিরে বললেন, 'যদিও আমি ঐ স্থানটি নিজের জন্য রেখেছিলাম, তবে আমি সন্তুষ্টচিত্তে উমরকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অনুমতি পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বস্তির শ্বাস নিলেন। তিনি যে বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, সেটা কেটে গেছে। তার চোখে-মুখে এখন হাসি ফুটে উঠেছে। এখন নিশ্চিন্তে বিদায় নেওয়ার সময়। তারপরেও একটি চিন্তা তার মাথায় এসে ভর করল। সম্ভবত খলীফা হওয়ার কারণে তিনি এ অনুমতি লাভ করেছেন। তিনি আরেকবার নিশ্চিত হতে চাইলেন। এজন্য ছেলেকে ডেকে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! আমি মারা গেলে আমার লাশ নিয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশার ঘরের দরজায় নিয়ে রেখে বলবে, খাত্তাবের ছেলে উমর আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছে'। যদি তিনি আবার অনুমতি দেন, তাহলেই কেবল আমাকে সেখানে দাফন করবে। যদি তুমি বুঝতে পার যে, তিনি তার মত পরিবর্তন করেছেন, সাবধান, তাহলে তাকে বাধ্য করবে না। এর পরিবর্তে আমাকে জনসাধারণের কবরস্থানে দাফন করবে। আমি এ বিষয়ে চিন্তিত যে, আমার খেলাফতের বিষয়টি এ অনুমতি লাভে প্রভাব ফেলেছে কি না।'

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ও গভীর সচেতনতার স্বাক্ষর রেখে অনন্ত অসীম জীবনের পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরো মদীনা শোকে ভারী হয়ে উঠল। মনে হলো এ শহর এ রকম দুর্দশায় কখনো পড়েনি। এখন তার শেষ ইচ্ছা পূরণের সময় হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে পিতার অসীয়ত অনুযায়ী সব বললেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে থাকলেন—এ দুনিয়া ছাড়ার সময়ও উমর কি আদর্শ

রেখে যাচ্ছেন! নিশ্চতভাবেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক মহত্ব, ভদ্রতা এবং সম্মান দেখিয়েছেন, কিন্তু এটা কেবল তার জন্যই সীমিত ছিল না।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে আগে একবার অনুমতি দিয়েছেন। তার কাছে মনে হলো, এখন নতুন করে অনুমতি চাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এজন্য তিনি আগে যা বলেছিলেন, এখন তার আবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং লোকদের নিশ্চিত করলেন। এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার আখেরাতের পথে আয়েশার পছন্দের স্থানটুকুতে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেলেন।[২৩৩] আর এভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেল এবং তার ঘরে তৃতীয় চাঁদ উদিত হলো।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করার পর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নতুন জীবন শুরু হলো। রাসূল এবং তার পিতার কবর যিয়ারত করার সময় আগে যে আরামবোধ করতেন, এখন তাতে পরিবর্তন হলো। তিনি তার চেহারা ঢেকে ফেললেন যা তাকে আগে করতে হয়নি। যদিও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মৃত, তবু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চেহারা ঢেকেই সেখানে প্রবেশ করতেন। যেহেতু তার ঘর চতুর্থ কারও জন্য যথেষ্ট ছিল না, এজন্য তিনি কাছাকাছি নুতন জায়গায় বসবাস শুরু করলেন।[২৩৪]

উসমান রা.এর খেলাফতকাল

প্রথম দুই খলীফার সময় আয়েশা যে মর্যাদা ও অবস্থানে ছিলেন, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালেও তা অব্যাহত থাকে। ইসলামী রাজ্যের প্রসারের সাথে সাথে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে তথ্যের জন্য আসতে থাকে এবং উপকৃত হতে থাকে। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধবা স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

---

[২৩৩] বুখারী, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৮ (৩৪৯৭)।
[২৩৪] সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, *সিরাতু সায়্যিদাতু আয়েশা*, ১৫৪-১৫৫।

আনহার প্রতি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে আচরণ ও সম্মান প্রদর্শন করতেন, তাতে তিনি কোনো পরিবর্তন করেননি। তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করতেন এবং তাদের ইবাদত-বন্দেগীতে আরাম পৌঁছাতে চাইতেন এবং তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আচরণ ছিল উল্লেখ করার মতো। তিনি তাকে খুব লজ্জা পেতেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে একই আচরণ করতেন। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে রাসূল বলেছেন,

> আমি তাকে দেখে কেন লজ্জা পাব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়।[২৩৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দুমেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তার জন্য অনেক দুআ করেছেন।[২৩৬]

তার খেলাফত মোট বারো বছর টিকে ছিল। এর প্রথম ছয় বছর সর্বত্র শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কিন্তু সপ্তম বছরে রাজ্যে অশান্তি শুরু হয় এবং কিছু গ্রুপ খলীফার বিরুদ্ধে অসার আপত্তি-অভিযোগ প্রচার-প্রসার শুরু করে। ফিতনার দ্বার প্রশস্ত হয় এবং কিছু মানুষ খলীফার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা খলীফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলা শুরু করে এবং খলীফাকে নিজেদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। কিছু মানুষ, যেমন ইবনে সাবা, খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের অবমাননায় উঠে-পড়ে লাগে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ কোন্দলে অস্বস্তি প্রকাশ করেন এবং যারা এর পেছনে সক্রিয় ছিল, তাদের সতর্ক করে বলেন, 'যারা উসমানকে অভিশাপ দিচ্ছে তারা জানে না যে, এর মাধ্যমে তারাই শত অভিশাপে পতিত হচ্ছে। আল্লাহও তাদের অভিশাপ দিবেন। আমি একদিন উসমানের হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বসতে দেখেছি। রাসূলের উপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছিল এবং

---

[২৩৫] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:২১১ (৬০৩)।
[২৩৬] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২৬১ (২৬২৯০)।

আমি তার কাপাল থেকে ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম। অধিকন্তু তিনি তার দুমেয়েকে উসমানের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আদর করে উসমানকে বলতেন, 'আমার ছোট উসমান'। ভুলে যেও না, যে কিনা রাসূলের কাছে এত প্রিয়, তিনি আল্লাহর কাছেও প্রিয়।'[২৩৭]

তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানকে নিচের কথাগুলো তিনবার বলেছিলেন,

> হে উসমান! একদিন আসবে যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে খেলাফতের পোশাক পরিধান করাবেন। যদি মুনাফিকরা সে পোশাক খুলে ফেলতে চায়, তবে কখনো তুমি নিজ থেকে তা খুলবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতার সময় তিনি আয়েশাকে বলেছেন, 'আমি চাই আমার গোত্রের কিছু মানুষ আমার কাছে আসুক।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবু বকরকে ডাকব?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন। আয়েশা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি উমরকে ডাকব?' রাসূল একই রকম নীরব থাকলেন। এটা পরিষ্কার যে, তিনি এমন কাউকে চাচ্ছিলেন যার নাম তিনি বলতে পারছিলেন না। আয়েশা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি উসমানকে ডাকব?'

তখন তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠল এবং বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ।'

উসমানকে ডাকা হলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। তিনি তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ভবিষ্যতের পর্দা সামান্য উন্মোচিত করে তিনি উসমানকে ধৈর্য সহকারে সে সময় মোকাবেলা

---

[২৩৭] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২৫০ (২৬১৭৩)।

করার উপদেশ দিয়েছিলেন। অনেক বছর পর, যখন সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন উসমান বলেছেন, 'রাসূল আমাকে বলেছেন, আমি যেন ধৈর্য সহকারে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করি।'[২৩৮]

রাসূলের কাছে উসমানের অবস্থান সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্যক অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো ভুল ধরিয়ে দিতে কখনো পিছ পা হননি। তিনি এসব ভুল ধরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করতেন না, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে এবং রাসূল ও আল্লাহর বন্ধুকে সতর্ক করতেও দ্বিধা করতেন না।

এ সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, কিছু গোত্র সরাসরি বিরোধিতায় নেমে পড়ল যা অন্যদেরও খলীফার বিরুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করছিল। এটা তাদের জন্য একটি মোক্ষম সুযোগে পরিণত হলো যারা বিশৃঙ্খলা করতে চেয়েছিল, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে একটি গুজব ছড়িয়ে দিল যে, রাসূল আসলে খেলাফতের দায়িত্ব আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে গেছেন। বিস্তৃত এলাকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে আফ্রিকা। সে এসব এলাকায় মুসলমানদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করে তুলল। এসব বিদ্রোহীরা মিশরকে তাদের কেন্দ্র বানাল।

এ বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেল এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি হলো। মুহারিক ইবনে সুমামা বসরার নেতা, উসমানের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা-বার্তা শুনে খুব বিব্রত হলেন। তিনি তার বোন উম্মে কুলসুম বিনতে সুমামাকে আয়েশার নিকট পাঠিয়ে নিচের প্রশ্নটি করতে বললেন, 'আয়েশার কাছে যাও এবং উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাও। কারণ লোকজন তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলছে।'

তিনি একটি চিঠিও পাঠালেন। তাতে তিনি যা শুনেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে আয়েশার মতামত জানতে চেয়েছেন। উম্মে কুলসুম

---

[২৩৮] তিরমিযি, মানাকিব, ১৯ (৩৭১১)।

আয়েশার কাছে বলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন, আমার এক ভাই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। তারা আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং উসমান ইবনে আফফানের ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চেয়েছে।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে এই কথা বলে শুরু করলেন, 'যে উসমানকে অভিশাপ দেবে, আল্লাহও তাকে অভিশাপ দেবেন।'

একের পর এক বিবরণ তুলে ধরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উসমান ইবনে আফফানের মর্যাদা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন যে, যারা উসমানের বিরুদ্ধে এসব জঘন্য কথা ছড়াচ্ছে, তারা আল্লাহর অভিশপ্ত।'

একদিন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে, বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক জমা হয়ে হেজাযের দিকে আসছে, 'হজ করার জন্য।' এটা দেখতে স্বাভাবিক হলেও তাদের আসল টার্গেট ছিল খেলাফত। ঘটনা বুঝতে পেরে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এ দলের লোকেরা অবাধ্যতার সব সীমাই অতিক্রম করেছিল এবং প্রশংসা করে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আকাশে উঠিয়েছিল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যে এটা পরিষ্কার ছিল যে, তারা ভুলের উপর রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথমে তারা শান্ত হলেও পরবর্তীতে খেলাফতের জন্য আন্দোলন শুরু করে। আয়েশার নিজের ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরও তাদের একজন ছিলেন। তার অবস্থান আয়েশাকে খুব পীড়া দেয়। তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তুমি ভুল পথে রয়েছ, কিন্তু তাকে তাতে রাজী করাতে পারেননি। এমনকি তাকে তিনি তার সাথে হজে যেতে বলেছিলেন যেন বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হননি। খলীফাকে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, এমনকি তারা খলীফাকে এক ঢোক পানিও পান করতে দেয়নি। ঐ দিন উম্মে হাবিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়; খলীফার জন্য সামান্য একটু পানি আনতে গিয়ে তিনি প্রায় মৃত্যুর

মুখোমুখি হন এবং কোনোমতে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন।[২৩৯] তিন সপ্তাহ ধরে এ অবস্থা চলল।

মদীনার আকাশে যখন বিপদের অন্ধকার নেমে এল, তখন হজের মৌসুম হয়ে গেল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে গেলেন। যখন তাকে বলা হলো যে, শান্তিতে মদীনায় থাকাই তার জন্য ভালো হবে, আয়েশা উম্মে হাবিবার কথা স্মরণ করে বললেন, 'আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতাম এবং উম্মে হাবিবার সাথে যা করা হয়েছে, আমার সাথেও তা করা হতো।'[২৪০]

হজ শেষে মদীনায় ফেরার পথে তিনি খবর পেলেন যে, তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হয়েছে। যারা তাকে নিয়ে সমালোচনা করত, তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'খলীফা যা করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের সমালোচনাই এ ঘটনার জন্য দায়ী।'

তার ব্যাপারে একটি সমালোচনা এই ছিল যে, তিনি এমন কিছু মানুষের হাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যারা পরবর্তীতে তার বিপদের কারণ হয়েছিল। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধদলের নেতা-কর্মীদের রাষ্ট্রীয় পদ দিয়ে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা কমাতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেন। কিন্তু লোকজন তার এ শান্তি-প্রচেষ্টা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তারা বড় গলায় এ কথারই প্রচার-প্রসার করতে লাগল যে, খলীফা ভুল করছেন।

আয়েশা তালহা এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কাছে কি খবর আছে?'

তারা মদীনার বিরূপ পরিবেশ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে শান্তির শহর মক্কায় চলে এসেছেন। যারা মদীনাকে অবরোধ করে রেখেছিল, তারা ছিল সত্য

---

[২৩৯] তাবারি, *তারিখ*, ২:৬৭২।
[২৪০] ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া*, ৭:১৮৭।

থেকে অনেক দূরে। পরবর্তীতে তারা কী করবে, এটা পরিষ্কার ছিল না। আয়েশা সূরা হুযুরাত থেকে নিচের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন,

وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَی الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ ﴿۹﴾ اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَۃٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَ اَخَوَیۡکُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۱۰﴾

আর যদি মুমিনদের দু-দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোশ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। (সূরা ৪৯:৯-১০)

তারপর তিনি আরও বলেন, 'মানুষ এখন কীভাবে এই আয়াতের উপর কাজ করবে?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। তার চেহারা বেদনায় ছেয়ে আছে। তিনি মদীনার বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফিরে না গিয়ে তিনি মক্কায় থেকে গেলেন। কাবার কাছে গেলেন। তিনি কিছু বলেননি অথবা কারও কাছ থেকে কিছু শুনতেও চাননি। তিনি প্রথমে কাবার দরজার কাছাকাছি এলেন, তারপর হজরে ইসমাঈল। সেখানে নামায পড়ে

দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। মুসলিম সমাজের প্রতি যে বিপদ নেমে এসেছে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মক্কায় অবস্থানের কথা জেনে বিশালসংখ্যক লোকজন তার কাছে জমা হয়। তারা তার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় ছিল। আয়েশা কথা বলা শুরু করেন, 'হে লোকসকল!' প্রথমে যা সংঘটিত হয়েছে, তিনি তার বিবরণ দেন এবং লোকজনকে সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিতে বলেন। তারপর বলেন :

> উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর তারা এত বেশি চাপ প্রয়োগ করে যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্যও হয়ে থাকে, তারপরেও তিনি ছিলেন ধুলোবিহীন খাঁটি স্বর্ণের মতো অথবা পানি নিংড়ানো পবিত্র কাপড়ের মতো এবং এভাবেই তিনি আল্লাহর সামনে হাজির হবেন।[২৪১]

যদিও গতকালের ভুল আজকে বুঝতে পেরে কোনো লাভ নেই, তবু তিনি তাদের অতীতের ভুল ধরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে এসব থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অন্তরে এ ঘটনা তীব্রভাবে আহত করল এবং তিনি বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছিলেন না। যখন তার এ বেদনাবিধুর অবস্থা বিরাজমান ছিল, তখন আশতার আল-নাখাই এসে জিজ্ঞেস করেন, 'খলীফা শহীদ হওয়ার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'

তিনি বলেন, 'আল্লাহ নিষেধ করেছেন! মুসলমানদের নেতার রক্ত ঝরবে, আর আমি কী করে নীরব থাকি? কীভাবে আমার অন্তর এটা কবুল করবে?'[২৪২]

অতীতকে অতীতেই রাখতে হবে এবং এখন নতুন কাজ হাতে নেওয়ার সময় হয়েছে। নতুন খলীফা নিয়োগের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি শান্ত করতে

---

[২৪১] তাবারি, *তারিখ*, ৩:৬।
[২৪২] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৪৮৫।

হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পছন্দের প্রার্থী ছিলেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যে তার কাছে আসত, তাকেই তিনি এ পছন্দের কথা বলতেন।

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামোর প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং এ রাষ্ট্র গঠনে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশে গভীর চিন্তা-ভাবনার যেমন সুযোগ ছিল না, তেমনি ভালো পরিকল্পনা করারও অবসর ছিল না। দিন যতই গড়াতে লাগল, সবকিছুকে ম্লান করে দিয়ে রাসূলের যুগের পবিত্রতা ততই পেছনে সরে যাচ্ছিল। এটা আরও বিপদের সূচনা করছিল। যে ফিতনা জীবনকে উলটপালট করে দিয়েছে তা অব্যাহত থাকল এবং কেউ ধারণা করতে পারছিল না এর শেষ কোথায়! এ রকম অন্ধকার পরিবেশে পবিত্র হাত সম্প্রসারিত হলো। আশা ছিল সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহাবীদের যেন পথভ্রষ্ট না করে। রাসূল যেমন অনেক বছর আগে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, তেমনি তারা এক নতুন যুগে প্রবেশ করল। আয়েশা ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মদীনায় ফেরার পরিকল্পনা স্থগিত করলেন।

এ ফিতনার কারণেই উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলেন। মুসলমানরা মুসলমানদের রক্তপাতে মেতে উঠল এমন একটি শহরে যেখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল এবং পবিত্র মাসে তারা সম্পদ লুটে নিতে সচেষ্ট হলো। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন যে, বিদ্রোহীরা যদি সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে, তবু তারা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি আঙুলের সামান হতে পারবে না। কারণ তাদের কর্মকাণ্ড ছিল জঘণ্য।

আলী রা.-এর খেলাফতকাল

দেশে অরাজকতা দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হয়েই গভর্নরের পদে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন। বিশেষ করে যারা এ ফিতনায় জড়িত ছিলেন, তাদের পরিবর্তে নতুন গভর্নর নিয়োগ করলেন। আর এ পরিবর্তন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য অনেক নতুন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আয়েশা মদীনার ব্যাপারে আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেখান থেকে প্রতিনিয়তই দুঃসংবাদ আসতে থাকে। লোকজন তার কাছে জমা হতে থাকে। বিশেষ করে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়কার গভর্নররাও তার কাছে ভিড় করে। যদিও তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত মেনে নিয়েছিলেন, তবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে মক্কায় এসে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে দেখা করেন। এ ঘটনা অন্যদেরও আকৃষ্ট করে।

যারা মদীনার সাম্প্রতিক ঘটনায় বিচলিত হয়ে ছিলেন, তাদের জন্য মক্কা মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। যারা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বিচার চাইতেন, তারাই এখানে জমা হতে লাগলেন। এ আন্দোলনে শরীকরা দীর্ঘ দিনের ইসলামের ঐতিহ্য বিনষ্ট করার আশঙ্কায় চিন্তিত ছিলেন। তারা শান্তির একটি উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। হজ শেষ হয়ে গেলেও লোকজন মক্কা ছেড়ে গেল না। তাদের একজন বলে উঠল, 'আমরা মক্কা ছাড়ব না যতক্ষণ না উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীকে না পাওয়া যায়।'

নেতারা তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। কেউ কেউ মক্কায় থেকে যেতে চাইলেন, আবার অনেকে মদীনায় ফিরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অনেকে আবার বসরায় যেতে চাইলেন। কারণ উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী বসরার অধিবাসী বলে মনে করা হচ্ছিল। এভাবে বসরাই সবার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

ইবনে সাবা এবং তার বিদ্রোহী বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। আবতাহে এর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়। কেউ কেউ শত শত উট এবং ঘোড়া দান করে, অনেকে যুদ্ধের অস্ত্র সরবরাহ করে এবং অনেকে তাদের রুপা-স্বর্ণ অকাতরে দান করে দেয়।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ একসাথে ছিলেন। কিন্তু তারা কাফেলার পেছনে থেকে গিয়েছিলেন এবং তাদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় জানান এবং নিরাপদ সফরের জন্য দুআ করেন।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে খলীফার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন তিনি বসরা অভিমুখে আয়েশা এবং জনগণের অভিযানের খবর পান, তখন ফিরে আসেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কাফেলাকে প্রশমিত করতে চাইলেন। এ কাফেলায় কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। বসরার গভর্নর ছিলেন উসমান ইবনে হুনাইফ। তিনি ইমরান ইবনে হুসাইনসহ একটি প্রতিনিধিদলকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে তাদের উদ্দেশ্য জানার জন্য পাঠালেন। তারা বলল, 'আমাদের গভর্নর আপনাদের উদ্দেশ্য জানার জন্য পাঠিয়েছেন।' তারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবাবের জন্য অপেক্ষায় ছিল।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মতো ব্যক্তিরা কোনো কথা গোপন রেখে ঘর থেকে বের হতে পারে না। আর না কোনো মা প্রকৃত ঘটনা তার সন্তানদের কাছে লুকাতে পারে।' তারপর তিনি তাদের সামনে একের পর এক ভুলের কারণে তার দুশ্চিন্তার বিবরণ তুলে ধরেন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তার এ আগমনের কারণ বর্ণনা করেন।[২৪৩] তালহা এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুও একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। সবাই উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীর অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন এবং এ অরাজকতার সমাপ্তি আশা করেছেন। তারা প্রথমে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। যারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য শুনল, তা তাদের উপর খুব প্রভাব ফেলল। লোকেরা দুভাগ হয়ে গেল। বড় দলটি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিরোধিতা করা বন্ধ করল।

যারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অনুগত ছিলেন, তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাদের তরবারি বাধ্য না হলে যেন ব্যবহার না করে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও তিনি ঘোষণা দিলেন, আরেকজনকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া হত্যা বা আঘাত করার অধিকার নেই। উসমান ইবনে হুনাইফকে বিশৃঙ্খলার সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার মুক্তি দাবি করেছিলেন। তিনি তাকে যেখানে খুশি যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন।[২৪৪]

---

২৪৩ তাবারি, তারিখ, ৩:১৪।
২৪৪ তাবারি, তারিখ, ৩:১৫।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একই ধরনের চিঠি কুফাতেও পাঠালেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের সহযোগিতা আশা করেছিলেন। অনেক নেতাই তার চিঠি পেয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য সরাসরি কথাও বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এবং মুহাম্মাদ ইবনে তালহা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে জানতে চাইলেন, এ অবস্থায় কী করা উচিত যেখানে মুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তখন তিনি তাদের আদম আলাইহিস সালামের দুছেলের কথা মনে করিয়ে দিলেন। যদিও কাবিল তার ভাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু হাবিল প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাত উঠাবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে আমার ছেলেরা! আদমের সম্মানিত ছেলে যা করেছে, তা যদি তোমরা করতে পার, তাহলে সেটাই কর।'

উটের যুদ্ধ : মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরীক্ষা

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা ছাড়ার সময় তার সাথে মাত্র সাতশ মুজাহিদ ছিল। কুফা পৌছার আগেই তা বেড়ে সাত হাজার হয়ে গেল। আর যখন বসরার লোকজন শরীক হলো, তখন তা বেড়ে হয়ে গেল বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। অন্যদিকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বাহিনীতে ছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য। অবস্থা এমন মনে হচ্ছিল, তাদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। যে তরবারিগুলো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠত, তা এখন পাশাপাশি ইবাদতকরনেওয়ালা মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হয়েছে। এটা ছিল দুগ্রুপের জন্যই এক বেদনাদায়ক দিন। উটের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার অবতারণা করল ইতিপূর্বে কখনো যার মুখোমুখি হতে হয়নি।

যাকার নামক স্থানে দুদল মিলিত হলো। প্রথমে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে কাকা ইবনে আমর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি কি আমাকে বলবেন, আপনি কেন এ শহরে এসেছেন এবং কী আপনাকে এ রকম সফর করতে বাধ্য করল?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একই শান্ত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উদ্দেশ্য।'

তারা প্রত্যেকেই একই কথা এবং একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তালহা এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মধ্যস্থতার জন্য এগিয়ে আসতে বললেন। তারা যখন আসল, তখন আলী একই কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবাবও পুনরাবৃত্তি করলেন। তাদের নিজেদের জবাবও এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। কোনো কিছু হওয়ার আগেই সম্ভবত সবকিছু মিটমাট হয়ে যাচ্ছিল। এ সময় কাকা ইবনে আমর তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা কি অনুগ্রহ করে বলবেন, এই শান্তির প্রক্রিয়া কী হবে?'

তারা বলল, 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে বিচার করা, যা না করা হলে কুরআনের আদেশের অমান্য করা হবে।'

তারা ঠিকই ছিলেন, কিন্তু আরও কিছু সত্য বিবেচনা করার প্রয়োজনও ছিল। কাকার দল বলল, 'ধরুন, আপনি উসমান হত্যাকারীকে হত্যা করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তাকে হত্যা করার আগের অবস্থা হত্যা করার পরের অবস্থা থেকে কি ভালো নেই? আপনাকে ছয়শ লোক হত্যা করতে হবে এবং এর প্রতিবাদে ছয় হাজার লোক আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। হারকাস ইবনে যুহাইর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী। আর ছয় হাজার লোক একমত হয়েছে যে, তাকে তারা আপনার হাতে তুলে দেবে না। আপনি যদি তাদের তাদের অবস্থানে ছেড়ে দেন, সেটা কি শান্তির প্রক্রিয়ায় কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না? আর যদি তাদের সবাইকে হত্যা করেন, তাহলে সমস্যা এখন যা আছে তার চেয়ে আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে না? আপনি যদি হারকাস ইবনে যুহাইরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান, তাহলে ছয় হাজার লোক আপনার প্রতিবাদ করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। বিষয়টি এত সহজে সমাধান করা সম্ভব নয়। আপনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটু সময় দেবেন না? তিনি নিশ্চিতভাবেই উসমান হত্যাকারীর বিচার করতে চান, কিন্তু পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে তা করতে চান। তখন রক্তপাত কম হবে। তিনি সঠিক সময়ে শান্তি বাস্তবায়ন করার সুযোগের প্রতীক্ষায় আছেন।'

আয়েশা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'হে কাকা! আসলে তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

'এটা সত্য যে, বিষয়টি জটিল। এটা কেবল চরম ধৈর্যের সাথেই সমাধান করা সম্ভব। যখন বিশৃঙ্খলা স্তমিত হয়ে যাবে, তখন সবকিছুই এমনিতেই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। আমি আপনাকে সবর করার অনুরোধ করছি। আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি জানেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এখন মুসলিম জাহানের খলীফা। আপনি আগেও খলীফাদের সাথে সুনামের সাথে আচরণ করছেন। নিশ্চয়ই আপনি তাদের সহযোগিতা করতে চান না যারা ইচ্ছাপূর্বক সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়।'

আয়েশা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। ভালো কথা বলেছ। এখন তাহলে তুমি আলীর কাছে গিয়ে তার মতামত জানতে চাও। তিনি যদি একই মত পোষণ করেন, তাহলে বিষয়টি এখানেই শেষ। আমরা সবাই শান্তি চাই।'

বিশৃঙ্খলা মুহূর্তে কমে গেল। কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কছে গিয়ে সব বর্ণনা করলেন। খলীফা তার কথা শুনে খুশি হলেন। তিনি আশা করলেন, অনভিপ্রেত রক্তপাত ছাড়াই বিষয়টি খুব দ্রুতই নিষ্পত্তি হতে যাচ্ছে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এত খুশি হলেন যে, তিনি বিষয়টি তার বাহিনীকে জানাতে চাইলেন। তিনি সবার সামনে গিয়ে তার আনন্দের কথা ব্যক্ত করলেন।[২৪৫]

এটা ছিল একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। যেহেতু আয়েশা ও তার বাহিনী এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার বাহিনী সঠিক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছেন। খলীফার উপরই হত্যাকারীর বিচারের ভার অর্পিত হলো। আয়েশা ও তার বাহিনী ফেরার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন।

তালহা এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইশারা করে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আমার ভাইয়েরা! আপনারা যা জানেন, তার ব্যাপারে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু আমি সেটা কীভাবে করব যেখানে লোকেরা প্রভাবশালী এবং তাদের উপর আমার কোনো অধিকার নেই? ঐ যে দেখুন, আমাদের গোলামরা তাদের সাথে এবং অনেক আরবও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে যা আমাদের ধারণায়ও ছিল না। আপনারা

---

[২৪৫] তাবারি, তারিখ, ৩:২৯; ইবনে কাসির, আল-বিদায়া, ৭:২৩৮।

দেখুন, তারা আমাদের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা হেঁটে বেড়াচ্ছে। এখন বলুন, এ পরিস্থিতিতে আপনাদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?'

সন্তুষ্টচিত্তে এখন ফেরার সময়। প্রস্তুতি চলছে। এ সময় সবার দৃষ্টি আয়েশার দিকে নিবদ্ধ হলো। মনে হয় তার কিছু একটি হয়েছে। পরিষ্কারভাবে তার চেহারায় কোনো দুশ্চিন্তা ভর করেছে বোঝা যাচ্ছে। তার প্রতিটি চলাফেরায় অনুতাপের ভাব ফুটে উঠছে।

এভাবে কিছু সময় চলে গেল। তিনি কাছাকাছি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা এখন কোথায় আছি?'

তারা জবাব দিল, 'হাওয়াব।'

প্রচণ্ড দুঃখ নিয়ে তিনি বললেন, 'হাওয়াব?' 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাযিউন (নিশ্চিতভাবেই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে)।' (মুসলমানরা বিপদে পড়লে এ কথা বলে)।

তিনি আরও বেশি বিমর্ষ হয়ে গেলেন। দুশ্চিন্তায় তার অবস্থা বেগতিক হয়ে গেল। লোকেরা তার চারিদিকে জমা হলো এবং তারা এর কিছুই বুঝতে পারছিল না। তারা আগ্রহ এবং অধীর হয়ে তার আচরণ দেখতে লাগলেন।

তারপর দুঃখভরা কণ্ঠে তিনি অনুতাপের কথা উচ্চারণ করলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি সেই হাওয়াবের কুকুরের ডাক শুনলেওয়ালাদের একজন হয়ে গেছি। আমাদের এখনই ফেরত যেতে হবে।'

লোকেরা তারপরেও কিছু বুঝে উঠতে পারল না। তার আচরণ আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং সবার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তাদের দৃষ্টিতে এটা প্রতিভাত হয়ে উঠল যে, কোনো কিছু না জেনে তারা এখান থেকে এক পা-ও অগ্রসর হবে না, তখন আয়েশা হতাশ হয়ে বললেন, 'আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কাকে দেখে হাওয়াবের কুকুরগুলো ডাকবে! আমি সেদিন এটা শুনে হেসেছিলাম।

রাসূল আমাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'হে হুমাইরা! সতর্ক থেকো, তুমিও হতে পার!'[২৪৬]

কুকুরের আওয়ায কানে বাজছিল। আয়েশা মনে মনে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সত্য বলেছেন।'[২৪৭]

ঐ দিন যুবায়ের আয়েশাকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা যেখানে আপনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান, সেখানে আপনি তা ত্যাগ করে ফিরে যাবেন?'

অন্যরাও একই কথা বললেন, 'বরং আপনি এ যাত্রা অব্যাহত রাখেন যেন আল্লাহ আপনার মাধ্যমে সকলের মধ্যে শান্তির ফায়সালা করে দেন।'[২৪৮]

শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই আয়েশার লোকজনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

তারা সবাই আরেকবার যুদ্ধ না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। তারা রাতে বিশ্রাম করে প্রত্যুষে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন।

কিন্তু সেখানে আরও চক্রান্ত কাজ করছিল। মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এবং তার দল, এ বিশৃঙ্খলার জনক, শান্তির এ প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। রাতের মধ্যেই তারা দুগ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ লাগানোর ফন্দি আঁটে। রাতের গভীর অন্ধকারে তারা একই সাথে দুগ্রুপে আক্রমণ করে বসে। যারা আয়েশা এবং তার বাহিনীকে আক্রমণ করে, তারা তাদের আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী মনে করে এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর আক্রমণকারীদেরও আয়েশার বাহিনী মনে করতে থাকে।

চরম অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। যেহেতু অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করেছে, এজন্য তারা ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে নিজেদের অস্ত্র

---

[২৪৬] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৩:১২৯ (৪৬১০); এটা বলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ফিরে বললেন যে, তিনি যেন আয়েশার সাথে ভালো আচরণ করেন যদি ভবিষ্যতে কখনো কোনো বিষয়ে তিনি আগে বেড়ে যান।
[২৪৭] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৫২ (২৪২৯৯)।
[২৪৮] প্রাগুক্ত, ৬:৯২ (২৪২৯৯)।

হাতে তুলে নেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে রক্ষার জন্য প্রতিআক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একই সময় ঘটনার খলনায়করা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে, আর বলতে থাকে যে, তাদের সাথে বেঈমানী করা হয়েছে। এটা একটি যুদ্ধের রূপ নেয় এবং কী হচ্ছিল তা বোঝাই মুশকিল হয়ে যায়।[২৪৯]

দুপক্ষই একজন আরেকজনকে দুষতে থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে সুস্থ চিন্তার কোনো অবকাশ ছিল না। তারা ধারণা করতে পারল না, কারা আক্রমণ করেছে আর কারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে! যদি তারা আরও বেশি সতর্ক হতো এবং অনুসিন্ধৎসু হতে পারত, তার হয়তো বুঝতে পারত যে, তাদের আক্রমণকারীরাই রাস্তায় নেমে বুক ফুলিয়ে বলেছে, 'আমরাই উসমান হত্যাকারী'। আহা, যদি তারা জানত!

এটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কেউ জানত না কে কাকে হত্যা করছে। কিন্তু তারা তাদের অস্ত্র তুলে নিল এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করল।

খলীফা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা অথবা আয়েশা, যুবায়ের বা তালহার কোনো চেষ্টা কাজে আসল না। প্রতিটি রক্তপাতের সাথে আশা তিরোহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং একেকজনের পঙ্গুত্বে হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছিল। যদি কেউ অস্ত্র ব্যবহার না করত, তাহলে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছিল। নিজেকে বাঁচানোর জন্য তারা তাদের হাত রক্তে রঞ্জিত করা শুরু করল। এটা ছিল একটি কঠিন এবং ভয়াবহ পরীক্ষা।

ইবনে সাবা এবং তার সঙ্গীরা আয়েশার হাওদার দিকেও তাদের তীর তাক করল। আয়েশা বললেন, 'ও আল্লাহ! ও আল্লাহ! আল্লাহকে ভয় কর। বিচার দিবসের কথা মনে কর।'

কিন্তু কেউই তার কথা শুনল না। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আয়েশা একটি উটের উপর উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

---

[২৪৯] তাবারি, *তারিখ*, ৩:৩৯-৪০; ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া*, ৭:২৪০।

তাকে বাঁচানোর জন্য তার উটকে বসিয়ে ফেলার প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি মুহূর্তই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আয়েশাকে রক্ষা করার জন্য তরবারি দিয়ে উটের পায়ে আঘাত করা হলো। উট বসে পড়ল। আয়েশা বেঁচে গেলেন। কিন্তু তার উটের চারিদিকে কাটা হাত-পায়ের স্তূপ জমে ছিল। তার বর্ম আচ্ছাদিত হাওদাকে ... মনে হচ্ছিল, শত শত তীর-বর্শা তাতে আঘাত হেনেছে।

আয়েশাকে রক্ষা করার জন্য এ যুদ্ধে সত্তর জন মৃত্যুবরণ করেছেন। অবশেষে আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর তাকে হাওদা থেকে বের করেন। ঐ সময় ভাইয়ের হাত তার পিঠে লাগে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকান। যুদ্ধ এবং মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থেকেও তিনি বলে ওঠেন, 'এটা কার হাত? আমার শরীর থেকে সরাও। কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও হাত আমার শরীর স্পর্শ করেনি।[২৫০]

এমনকি যখন তিনি বুঝতে পারলেন এটা তার ভাইয়ের হাত, তখনো তিনি অপমানিত বোধ করলেন এবং বললেন, 'তুমি, অবাধ্য তুমি!'[২৫১]
এ ঘটনায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও খুব আশাহত হলেন। তিনি আয়েশার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি কেমন আছেন?'

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য নিরাপদ তাঁবু তৈরি করতে বললেন।
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, আল্লাহর শোকর, আমি ভালো আছি।' তারপর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য দুআ করলেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে বললেন, 'আপনার জন্যও একই দুআ।'

---

[২৫০] তাবারি, *তারিখ*, ৩:৫৫।
[২৫১] প্রাগুক্ত।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বড় ধরনের ঝুঁকি নিলেন। কারণ আয়েশা ইবনে সাবা এবং তার লোকদের টার্গেট ছিলেন। মনে হচ্ছিল, এ বিশৃঙ্খলা সমাধানের সম্ভাব্য কোনো পথ নেই। এটা অস্ত্র দিয়ে সমাধান করা সম্ভব না। এজন্য কূটনৈতিক তৎপরতার প্রয়োজন দেখা দিল। যারা মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বললেন যাদের সাথে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার পর থেকেই পাশাপাশি ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তারাও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহসী ছিলেন এবং খলীফার আহবানে সাড়া না দিয়ে পারেননি। তারা দুজনেই সামনের কাতারে চলে এলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে তালহা! কেমন করে তুমি রাসূলের পরিবারে সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারলে যেখানে তোমার পরিবার বাড়িতে নিরাপদে আছে?'

একজন অকৃত্রিম বন্ধুর মতোই আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কথাগুলো বলেছিলেন। আর এ রকম কথায় একটু খোঁচা থাকতেই পারে। কিন্তু কে এ বাস্তবসম্মত প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?

তারপর তিনি বললেন, 'হে যুবায়ের, তোমার কি মনে নেই একদিন তুমি রাসূলের পাশে বসে ছিল। তখন আমার আগমনে রাসূল আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। তারপর আমার দিকে ইশারা করে তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাকে ভালোবাস?' তুমি জবাব দিলে, 'হ্যাঁ।' তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কিন্তু একদিন আসবে তুমি তার প্রতি অন্যায় আচরণ করবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর হুবহু একই কথা মনে পড়ল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা ছিল পরিকল্পিত অস্ত্র যা তাকে তার তীর-বর্শাকে খাপে পুরতে সহায়তা করে। যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর পৃথিবী পুরো উলট-পালট হয়ে গেল। তারপর তিনি শুধু একটি কথাই বলতে পারলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। আমি যা ভুলে গিয়েছিলাম, তা আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।'

এটাই সত্যিকার জ্ঞানী মানুষের সিদ্ধান্ত। তিনি তার অস্ত্র ফেলে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন। তিনিও রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ যত সহজ ছিল, যুদ্ধ ত্যাগ করা অত সহজ ছিল না। ভাগ্য তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিছু লোক যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে টার্গেট করেছিল। প্রচণ্ড অনুতপ্ত অন্তরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একাকী ফিরে যাচ্ছিলেন। তারা তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং শহীদ করে ফেলে।[২৫২] তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাগ্যও এ থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। যারা অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, তাদের কাছে যুবায়ের এবং তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর চলে যাওয়া সহ্য হয়নি। এজন্য তাদের জীবন দিতে হলো।

যদিও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা চারিদিকে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাগুলো খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, যুবায়ের এবং তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অনেকে আয়েশার হাওদার কাছে ব্যথিত মনে জড় হলো। তারা ভবিষ্যতের জন্য করণীয় জানতে চাচ্ছিলেন। তাদের নিয়ত যদিও ভালো ছিল, কিন্তু এ দলের আগমনে নতুন ভীতি সঞ্চার করল।

তারপর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাই মুহাম্মাদকে ডাকলেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য একটি নিরাপদ জায়গায় তাঁবু গেড়েছেন এবং ভাইয়ের মাধ্যমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে খবর পাঠালেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি নিরাপদে মক্কায় যেতে পারবেন এবং আর কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মক্কার সফর ঠিক করলেন এবং বসরার চল্লিশজন মহিলা নেত্রীকে সাথে দিলেন। যাতে তিনি একাকিত্ব বোধ না করেন।

---

[২৫২] তাবারি, *তারিখ*, ৩:৫৫।

যদিও সবাই খুবই মর্মান্তিক একটি ঘটনার সাক্ষী ছিলেন, তবুও সবাই ন্যায়ের পক্ষেই ছিলেন। সময় ছিল প্রচণ্ড আবেগের। স্বাভাবিক ব্যবহার আশা করা ছিল স্বপ্ন। এ অবস্থাতেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দুজনেই অপূর্ব আচরণের সাক্ষ্য রেখেছেন। বিদায়ের সময় আশেপাশের লোকজনকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

> 'হে আমার সন্তানেরা! দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা একে অন্যকে আঘাত করেছি। মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত করেছি এবং খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর থেকে কেউ যেন কারও দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে না তাকায় অথবা যা হয়েছে এজন্য আবার যুদ্ধে লিপ্ত না হয় অথবা অনর্থক বাক-বিতণ্ডা না ছড়ায়। আল্লাহর কসম! একজন নারীর তার জামাইদের সাথে যে রকম সম্পর্ক থাকে, তাছাড়া অন্য কোনো বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক আমার ও আলীর মধ্যে অতীতে ছিল না। যদিও আমি কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, তারপরেও তিনি সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠদের একজন যার জন্য আমি ভালো কামনা করি।'

রাসূলের কাছে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ মর্যাদা ছিল। এটা চিন্তা করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অনুতপ্ত ছিলেন। অনেক বছর আগে, তিনি হাসসান ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধেও কিছু বলাকে পছন্দ করতেন না যিনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের চক্রান্তে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি এখনো তাকে 'রাসূলের রক্ষাকারী' হিসেবেই মনে করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আগের মতোই ভালোবাসেন এবং অপপ্রচারকারীদের আশাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন যারা এ ঘটনাকে বাড়িয়ে বলতে চায়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তর ছুঁয়ে গেল, কারণ এ বক্তাকে রাসূল নিজে সবকিছু শিখিয়েছেন। তিনি একইভাবে ব্যথিতও হয়েছিলেন, কারণ শান্তির নামে তার অনেক আত্মীয়-স্বজন এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথায় তার ব্যথায় কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ায় তিনি জবাবে বললেন, 'হে জনমণ্ডলী! তিনি সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি কতই না সুন্দর বলেছেন।'

ব্যথাকে ভালো করার জন্য এটাই ছিল সর্বোত্তম উপায়। দুপক্ষেরই শান্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর না হলে একই জায়গায় আবার আক্রমণের শিকার হওয়ার ভয় ছিল। আয়েশার একাকী সফর করা নিরাপদ ছিল না। এজন্য যারা কাছাকাছি ছিল, তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন,

> 'তার এবং আমার মধ্যে কোনো রেষারেষি নেই। তিনি আপনাদের নবীর স্ত্রী—দুনিয়া এবং আখিরাতে।'[২৫৩]

আবার তাদের সফর শুরু হলো। যারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিদায় জানাতে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তাদের সাথে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি তাদের নিরাপদ সফরের জন্য দুআ করলেন। তার ছেলে ইমাম হাসান তাদের সাথে ছিল এবং তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বহু মাইল পথ এগিয়ে দিয়ে আসেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য ছিল মক্কা এবং আগামী বছরের হজ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করা। তিনি অনুভব করলেন, অনেক বছর ধরে তিনি বেঁচে আছেন এবং হঠাৎ করেই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি লোকদের আহবানে সাড়া দিয়ে যে ভুল করেছেন, তার জন্য চরমভাবে অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি তা এভাবে ব্যক্ত করতেন, 'হায়! আমার যদি জন্মই না হতো এবং আমি কিছুই না হতাম; হায়! আমি যদি বৃক্ষ হতাম, যদি পাথর হতাম অথবা রোদে শুকনো কাঁদা হতাম যারা তাদের ভাষায় কেবলই আল্লাহর প্রশংসা করে! হায়, যদি আমি বিশ বছর আগেই মৃত্যুবরণ করতাম!'[২৫৪]

এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করতে যেতেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লজ্জা পেতেন। এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের পাশে দাফন হতে চাইতেন। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আমি অনেক দুঃখজনক ঘটনার সাথে নিজেকে

---

[২৫৩] তাবারি, *তারিখ*, ৩:৬১।
[২৫৪] সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছেন (ইবনে আবি শাইবা, *মুসান্নাফ*, ৭:৫৪৪ (৩৭৮১৮); ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৭৩-৭৪।

সম্পৃক্ত করেছি’ এবং তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে জান্নাতুল বাকিতে দাফন হওয়ার আশা ব্যক্ত করতেন।[২৫৫]

তিনি যখন নামায পড়তেন অথবা কুরআন তিলাওয়াতের সময় এই আয়াতে পৌছতেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

নিজ গৃহে অবস্থান কর। (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩)

‘নিজ গৃহে অবস্থান কর’—যেখানে বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তিনি তখন এত বেশি কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তার আঁচল ভিজে যেত।[২৫৬]

একদিন উকবা ইবনে শাইবান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে নিচের আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন,

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿۳۲﴾

অতঃপর আমি এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদের, যাদের আমি মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কতক তো নিজের প্রতি অত্যাচারী, কতক মধ্যপন্থী এবং কতক এমন যারা আল্লাহ তাআলার তাওফীকে সৎকর্মে অগ্রগামী। এটা (আল্লাহর) বিরাট অনুগ্রহ। (সূরা ফাতির, ৩৫:৩২)

তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

---

[২৫৫] বুখারী, সহীহ, জানায়েয, ৯৪ (১৩২৭)।
[256] ইবনে সা'দ, তাবাকাত, ৮:৮০।

> হে আমার সন্তান! তারা সবাই বেহেশতের অধিবাসী। যারা একে অন্যের সাথে সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বেঁচে ছিলেন, আর মধ্যপন্থী হচ্ছে তার পরবর্তী যুগের এবং যারা নিজেদের উপর অত্যাচারী তারা হচ্ছে তুমি এবং আমি।[২৫৭]

একটি চরম দুর্যোগ মোকাবেলা করে তারা বেঁচে ছিলেন। সব মুসলমানের মতো আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও প্রচণ্ডভাবে মানসিক কষ্টে ছিলেন। কিন্তু অতীতকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। এটা সত্য যে, তারা অতীত দিয়ে নিজেদের জীবনকে বিচার করেননি। বরং তারা পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেই জমিনে চলতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জটিল কোনো বিষয় সামনে এলেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে সমাধানের জন্য আসতেন। অপরদিকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে পরামর্শ করতেন।

যা হোক, ঐ সময় চরম বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার দুয়ার খুলে গেল। অপবাদ চারিদিকে ছড়াতে লাগল। মানুষের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতা ধ্বংস হতে লাগল। কেউ কেউ দাবি করা শুরু করল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নিযুক্ত করে গেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ সংবাদ শুনে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যেমন কিনা একজন দরজা খোলার পরিবর্তে প্রচণ্ডভাবে তা বন্ধ হওয়াতে চেহারায় আঘাত পায়,

> এটা আবার কখন হলো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগে আমার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম করেছেন। তারপর তিনি মিসওয়াক চাইলেন এবং আমার কোলে মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমি তার সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলাম। সুতরাং কখন রাসূল আলীর জন্য এ অসীয়ত করলেন?

---

[257] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ২:৪৬২ (৩৫৯৩)।

মুয়াবিয়া রা.-এর খেলাফতকাল

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পর মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হন।

এটা এমন একটি সময় ছিল যখন অনেক অঘটন ঘটেছে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এসব ঘটনায় খুব কষ্ট পেলেও তেমন কিছু করতে পারেননি। উটের যুদ্ধে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়েছে, এজন্য তিনি খুব মর্মপীড়ায় ভুগতেন। তিনি একই ব্যথায় আর ব্যথিত হতে চাননি। যারা তার কাছে আসত এবং তার উপদেশ আশা করত, তিনি তাদেরকে চিন্তাভাবনা ও সতর্কতার সাথে আচরণ করতে বলতেন। তিনি নিজেকে গভীর নিস্তব্ধতা এবং ধ্যানে নিমগ্ন করে রেখেছিলেন যেন তিনি দুনিয়ার প্রতি তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পুরোপুরি আখিরাতমুখী জীবন-যাপন করছিলেন। তিনি ইবাদত ছাড়া সময় কাটাতেন না এবং বাকি সময় ইলম চর্চায় কাটাতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সূর্যের মতো; যারাই তার কাছে আসত, তিনি সবাইকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করতেন। তিনি ছিলেন নিরাপত্তার প্রতীক, সবার জন্য একটি শান্তির ছায়া যারা আধুনিক সমাজে বিব্রত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। দুঃসংবাদ আসতেই থাকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র হাসান, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা মাথায় চুমুতে ভরে দিয়েছিলেন এবং খুব যত্ন করে যাকে বড় করা হয়েছে, শহীদ হয়ে গেলেন। তার বড় আশা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাফন হওয়ার।

একদিন তিনি তার ভাইকে বললেন, 'যদি আমি মারা যাই, তাহলে তুমি দ্রুত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে যাবে। আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাফন করার অনুমতি চাইবে। যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করবে। সম্ভবত লোকেরা বাধা দেবে। যদি তারা বাধা দেয় এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আমাকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করবে।'

যখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বড় ভাইয়ের শেষ আশা পূরণ করতে উদ্যত হলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অনুমতি সত্ত্বেও মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম বাধা দিলেন। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর লোকজন একদিকে, আরেকদিকে গভর্নরের লোকজন মুখোমুখি হয়ে গেল। মনে হলো আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হবে। তখন আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ কথা 'যদি তারা বাধা দেয় এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আমাকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করবে' স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন তাকে জান্নাতুল বাকিতে তার মায়ের পাশে দাফন করা হলো।[২৫৮]

একদিন মেসোপটমিয়া[২৫৯] থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ কিছু প্রশ্নের সমাধান এবং দুআ নেওয়ার জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করবে আমি যা জিজ্ঞেস করব তার তার সত্য জবাব দেবে? আল্লাহর কসম! তারা কীভাবে এবং কী কারণে আলীকে হত্যা করল?'

আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ জবাব দিলেন, 'আমি কেন সত্য বলব না?'

'তাহলে বলো।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ্দাদ বলা শুরু করলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বিরোধীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তার কথা শুনল না। তারা তার খেলাফতের বিরুদ্ধে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করার জন্য প্রোপাগান্ডায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন যেখানে এক পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসার জন্য প্রতি পক্ষে দুজন করে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যে কোনো একটি পরিবারের চেয়ে

---

[২৫৮] ইবনে আবদিলবার, *ইসতিয়াব*, ১:৩৯২; সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, ১:১৭০।

[২৫৯] **Mesopotamia** (Arabic: بلاد الرافدين *bilād ar-rāfidayn*; land of rivers) is a name for the area of the Tigris–Euphrates river system, roughly corresponding to modern-day Iraq, Syria and Kuwait, including regions along the Turkish-Syrian and Iranian-Iraqi borders.

মুহাম্মাদের পরিবারের সমস্যা কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়?' তখন তিনি তাদের হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সুহাইল ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্বাক্ষর করার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলেন। এটা কিছু লোককে ফেরাতে পারলেও বেশিরভাগ লোক অশান্তই রয়ে গেল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন ও সুন্নাহর উপর দৃঢ় থাকলেন। এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ এবং তার রাসূল সত্য বলেছেন।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি নিশ্চিত তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি? আর কিছুই বলেননি?'

'না, আল্লাহর কসম! তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি।'

তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন,

> কী সুন্দরই না তিনি বলেছেন! আল্লাহ এবং তার রাসূল সত্য বলেছেন। আল্লাহ আলীর উপর রহম করুন। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সত্য বলেছেন। মেসোপটমিয়ার লোকজন অনেক বেশি বাড়িয়ে বলেছে যা আমাকে কষ্ট দিয়েছে।[২৬০]

ঐ যুগে মানুষ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মিশর এবং মেসোপটমিয়ার লোকজন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচরণ করত, আর দামেস্কের লোকজন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে একমত ছিলেন। দুগ্রুপই খলীফাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। খারেজীরা উভয় খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সরাসরি জনসম্মুখে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলত। আয়েশা গভীরভাবে আহত হয়ে বললেন, 'তাদের রাসূলের বন্ধুর জন্য অনুশোচনা করতে বলা হয়েছে। আর তারা এর পরিবর্তে উল্টোপাল্টা বক্তব্য দিতে শুরু করে।'[২৬১]

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগ আগের দুই খলীফার চেয়ে আরও কঠিন সময় ছিল। তারপরেও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

---

[২৬০] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ১:৮৬-৮৭ (৬৫৬)।
[২৬১] মুসলিম, *সহীহ*, তাফসীর, ১৫ (৩০২২)।

আনহার প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন এবং তার খোঁজ-খবর নিতেন। আবার নিজে কোনো সমস্যার সমাধান না করতে পারলে তার দ্বারস্থ হতেন। তিনি নিয়মিত তার জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কখনো প্রেরকের দিকে খেয়াল করতেন না। যা হাদিয়া পেতেন অকাতরে দান করে দিতেন।

একবার খলীফা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল কাপড়, রৌপ্য ও অন্যান্য সুন্দর দামি উপঢৌকন নিয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে আসেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এগুলো দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বিড়বিড় করে কিছু বলছিলেন যা খলীফার প্রতিনিধিরা শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু যারা কাছাকাছি ছিল, তারা ঠিকই শুনল। তিনি বলছিলেন, 'রাসূল কখনো এসব জিনিস ছুঁয়ে দেখেননি অথবা এ রকম কিছুর মালিকও ছিলেন না।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার নিকটস্থ লোকদের সেগুলো তখনই গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে বললেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যা চাচ্ছেন তা কীভাবে পূরণ না হয়ে পারে? ঐ রাতেই সব দান করে দেওয়া হলো। কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, এমনকি এক দিরহামও না।

একবার খলীফা পরামর্শের জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর জবাবে লেখেন,

> সালামুন আলাইকুম। সংক্ষেপে আপনার কথার জবাব হচ্ছে, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির পরওয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, আল্লাহ তাকে মানুষের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চাইবে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেবেন। ওয়াস সালামু আলাইকা।[২৬২]

---

[২৬২] তিরমিযি, *সুনান*, যুহদ, ৬৪ (২৪১৪)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর এত হাদিয়া প্রেরণ এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সত্ত্বেও তার ভুল ধরিয়ে দিতে পিছ পা হতেন না। তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভুল কর্মকাণ্ডে লজ্জিত হতেন এবং আশা করতেন, হয়তো তা থেকে তিনি ফিরে আসবেন। তিনি হুজর ইবনে আদি এবং তার সাত বন্ধুকে হত্যার সমালোচনা করেন যারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার পর দেশে বিভিন্ন অরাজকতার পর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে হারিসের হাতে একটি পত্র প্রেরণ করে নিচের আশা ব্যক্ত করেছিলেন, 'যদি তোমার ওয়াদার মূল্য থেকে থাকে এবং আমরা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করতে পারি, তাহলে আমি হুজরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করছি। এটা আমাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা।'

কিন্তু হুজর এবং তার বন্ধুদের বাঁচানোর এ চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। যখন আব্দুর রহমান মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তাদের দণ্ড কার্যকর হওয়ার খবর পেয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হৃদয় কেঁপে ওঠে। ইতিমধ্যে এ কাজে দেরি হয়ে গিয়েছিল; আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মর্মাহত হলেন কারণ হুজরকে বাঁচাতে এবং তার ব্যাপারে ভালো কিছু বলতে তার দেরি হয়ে গেছে।

যখন খলীফা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন তিনি বলেন, 'হুজরের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের ধৈর্য ও বিচক্ষণতা কোথায় ছিল? তুমি কোথায় ছিলে?' তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পিতার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে চেয়েছেন।

পরবর্তীতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হজ করার জন্য মক্কায় আসেন। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন দ্রুত হুজরের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'হে মুআবিয়া! হুজরকে হত্যা করার সময় তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। তুমি কেন হুজরের উপর রহম করনি? তুমি কেন তার দণ্ডকে রহিত করনি?'

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বিব্রত হলেন। তারপর বললেন, 'আমি হুজর এবং তার বন্ধুদের হত্যা করিনি।'

এ উক্তি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি। তিনি ছিলেন খলীফা এবং তার অধীনস্থ এলাকাতে হুজরের বিচার কার্যকর হয়েছে। সত্যিকার অর্থে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দায় স্বীকার করেছেন এবং তাতে তিনি অনুতপ্ত ছিলেন, 'আমরা এর বিচার এ পৃথিবীতে করতে পারব না। অনুগ্রহ করে বিষয়টি আখেরাতে পুনর্মিলনের দিনে আমার এবং তাদের মধ্যে ছেড়ে দিন।
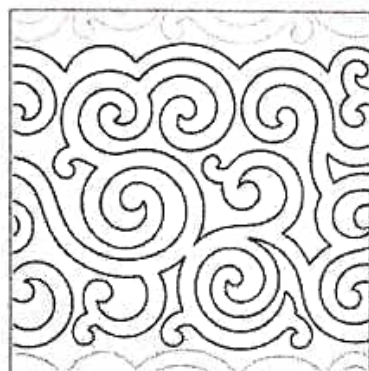
পঞ্চম অধ্যায়

আয়েশা রা.-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

সবার জন্য জ্ঞানের উৎস

শুধু যে খলীফারাই তার কাছে বিভিন্ন তথ্য ও ফতোয়ার জন্য আসতেন তা নয়, বরং একটি বিশালসংখ্যক সাধারণ মানুষও তার থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তাকে সবাই নির্ভরযোগ্য পরামর্শ ও জ্ঞানের উৎস মনে করতেন। আর যারা তার কাছে আসতে পারেননি, তারা বিভিন্ন প্রতিনিধি বা চিঠির মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেছেন।

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বসরা এবং কুফার গভর্ণর ছিলেন যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তির সত্যতা জানতে চিঠি লেখেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ফতোয়া দিতেন যে, কেউ যদি হজ না করে, শুধু কুরবানীর পশু মক্কার হারামে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পশু সেখানে জবেহ হবে, তার উপর সেই সব শর্ত আপতিত হবে যা একজন হাজীর উপর হয়।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে লিখলেন,

> এটা ঠিক নয়। আমি রাসূলের কুরবানীর পশুর জন্য রশি পাকিয়েছি, তিনি নিজ হাতে সেগুলো পশুর গলায় পরিয়েছেন। তারপর আমার পিতা সেগুলো নিয়ে মীনাতে গিয়েছেন। সেটা কুরবানী হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো হালাল জিনিসই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হারাম হয়নি।[২৬৩]

অনেক সাহাবী মনে করতেন যে, হজের কাফেলায় চলার সময়, মাথার চুল কামানোর পর এবং মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

---

[২৬৩] মুসলিম, সহীহ, হজ, ৩৯ (১১৯০)।

নিষেধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সময়গুলোতে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ মনে করতেন না।[২৬৪] আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর ফতোয়া জানার পর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবীরা তাদের মত পরিবর্তন করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মত গ্রহণ করেন।

আরেকবার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হজের ইহরাম খোলার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের উদাহরণ টেনে সত্যকে উন্মোচিত করেন।

তাদের এই ইলম চর্চা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস জীবনের শেষ দিকে চোখের সমস্যায় পড়লেন। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি দৈনন্দিন নামায এবং অযু করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন।

একদিন আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'যে ব্যক্তি গোসল ফরয অবস্থায় সকালে ঘুম থেকে ওঠে, তার জন্য রোযা রাখা জায়েয নেই।'

তিনি সম্ভবত সর্বশেষ ফতোয়া সম্পর্কে জানতেন না অথবা অসম্পূর্ণ তথ্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান বিষয়টি জেনে আব্দুল্লাহ ইবনে হারিসকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে আলোচনা চলতেই থাকে। ঐ যুগে মানুষ কিছু শুনলেই তা বিশ্বাস করতেন না। নিশ্চিত মাসআলা জানার আগ পর্যন্ত কেউ আমল করতেন না। সাধারণ জ্ঞানে বোধগম্য নয় এমন বিষয়ে এটা বেশি হতো। আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস তার পিতাকে এ কথা বললেন। তার কাছেও বিষয়টি আশ্চর্যজনক মনে হলো। সবশেষে তারা তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আয়েশার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

---

[২৬৪] বুখারী, সহীহ, গোসল, ১২-১৩ (২৬৪, ২৬৭)।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে তখন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। তাদের দুজনকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তারা উত্তর দিলেন, 'ঐ অবস্থায় রাসূল যখন ঘুম থেকে সকালে উঠতেন, রাসূল সে দিনগুলোতেও রোযা রাখতেন।'

বিষয়টির মীমাংসা হয়ে গেল। দুজন লোক তখনকার মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে আল-হাকামের কাছে বিষয়টি জানাতে গেল। কারণ ভুল জিনিস মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। এটা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন ছিল। মারওয়ান বললেন, 'আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিষয়টি জানানো তোমাদেরই দায়িত্ব। আমি তোমাদের কাছ থেকে এটা আশা করছি।'

মারওয়ানের কাছ থেকে এ দুজন সরাসরি আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সবকিছু শুনে আবু হুরাইরা বললেন, 'এটা কি সত্য?'

তখন দুজন তাতে সম্মতি দিলেন। আবু হুরাইরা বলে উঠলেন, 'আমাদের দুজন মা এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন।'

উম্মুল মুমিনীনদের কথা অনুযায়ী ঐ দিন থেকে তিনি ঐ অবস্থার সম্মুখীন হলে রোযা রাখা শুরু করলেন।[২৬৫]

আরেকদিন ইমাম শুরাইহ আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি একটি বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। সে বিষয়ে বললেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আবু হুরাইয়া এমন হাদীস বর্ণনা করছেন যা সত্য হলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, 'যারা ধ্বংস হবার, তারা ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাকে তোমার চিন্তার কারণ বল।'

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে এবং এটাকে পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে

---

[২৬৫] মুয়াত্তা, সিয়াম, ৪ (৬৩৯)।

সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন না।; এখন আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে মৃত্যুকে ভয় পায় না এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করে না?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শুরাইহর মনের ব্যথা বুঝলেন এবং তাকে নিচের হাদীসটি বললেন,

> হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলো বলেছেন। এখন এটা তোমার উপর কীভাবে তুমি নেবে। আল্লাহ তাআলা আবু হুরাইরার উপর রহম করুন। তিনি হাদীসের শেষাংশ বলেছেন, শুরুর অংশগুলো বলেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন তার কোনো বান্দাকে পুরস্কৃত করতে চান, তখন তার মৃত্যুর বছর তার কাছে একজন ফেরেশতা নাযিল করেন। ঐ ফেরেশতা তাকে আখিরাতের সুসংবাদ প্রদান করে। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এভাবে একদিন যখন তার কাছে মালাকুল মওত আসে, তখন বলে, 'হে প্রশান্ত আত্মা! আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চির কল্যাণে প্রবেশ কর' এবং তার কাছেই থাকে। বান্দা তখন মৃত্যুকে দ্রুত আলিঙ্গন করতে চায়। তার মানে আল্লাহ বান্দাকে দেখা দিতে ভালোবাসেন। আর আল্লাহর আযাব যদি কোনো বান্দার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার মৃত্যুর বছর তার উপর শয়তানকে লেলিয়ে দেন। শয়তান তাকে বিপথে নিয়ে যায়। এভাবে একদিন যখন তার কাছে মালাকুল মওত আসে, তখন বলে, 'হে দুষ্ট আত্মা (নফসে আম্মারা)! আস, আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং আযাব ভোগ কর। ঐ সময় বান্দা শুকনো পাতার মতো কাঁপতে থাকে এবং বিচলিত হয়ে পড়ে। সে কখনো আল্লাহর সাক্ষাৎ আশা করে না এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। যখন মৃত্যু এসে পড়ে, তখন মুহূর্তেই জমিন তার বুকে চাপ দেয়, হাত-পা অবশ হয়ে যায়। শরীরের লোমগুলো তুলোর মতো উড়তে থাকে। যে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ আশা করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ আশা করেন। আর যে কেউ তা অপছন্দ করে, আল্লাহও তা অপছন্দ করেন।[২৬৬]

---

[২৬৬] মুসলিম, সহীহ, যিকির, ১৭ (২৬৮৫); নাসাঈ, জানায়েয, ১০ (১৮৩৪); আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ২:৩৪৬ (৮৫৩৭)। এখানে দুটি বর্ণনাকে একসাথে লেখা হয়েছে।

একজন বিশিষ্ট সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার শেষ প্রস্তুতি হিসেবে নিজের পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন করে নতুন কাপড় পরলেন। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একজন মুসলমান যে লিবাসে (পোশাকে) মারা যায়, তাকে সেই লিবাসেই উঠানো হবে।'[২৬৭]

তিনি ভেবেছিলেন, এই হাদীসে দাফনের কাপড়কেই জীবনের শেষ পোশাক বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্যদের সাথে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ মতের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ আবু সাঈদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।'

সত্য উন্মোচনের দায়িত্ব আবার তার কাঁধে পড়ল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভিন্নভাবে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করলেন। তিনি এটাকে সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করলেন। এ দুনিয়ার কাপড়ের আখিরাতে কোনো মূল্য নেই এবং সেখানে কোনো কাপড় ছাড়াই উঠতে হবে। তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বললেন,

> এ হাদীসে 'লিবাস' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের আমল বা কর্ম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষ উলঙ্গ হয়ে উঠবে যেভাবে তারা মায়ের কোলে প্রথম জন্ম নিয়েছিল।[২৬৮]

আয়েশার প্রজ্ঞা কেবল তার সমসাময়িক মানুষদেরই উপকৃত করেনি, বরং তার মৃত্যুর পরও এটা অব্যাহত থাকে। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্তই চলতে থাকবে। যারা সঠিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তারাই তার কাছ থেকে বেশি উপকৃত হয়েছিলেন। উমর ইবনে আব্দুল আযিয মাঝে মাঝে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযামের কাছে চিঠি লিখতেন। সেসব

---

[২৬৭] আবু দাউদ, *সুনান*, জানায়েয, ১৮ (৩১১৪); হাকিম, *মুসতাদরাক*, ১:৪৯০ (১২৬০)।
[২৬৮] বাইহাকী, *সুনান*, শুআবাল ঈমান, ১:৩১৮ (৩৫৯); আরও দেখুন বুখারী, *সহীহ*, রিকাক, ৪৫ (৬১৬২); মুসলিম, *সহীহ*, জান্না, ৫৬ (২৮৫৯)।

চিঠিতে তিনি লেখেন, 'তুমি চারিদিক খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান করবে। যদি রাসূলের কোনো বাণী পাও অথবা উমরা-এর কাছে কোনো উক্তি পাও, আমাকে জানাবে। যখন জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা একের পর এক চলে যেতে থাকে, আমার ভয় হয়, হয়তো কিছু এলম হারিয়ে গেছে।'[২৬৯]

উমরা বিনতে আব্দুর রহমান ছিলেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিশেষ ছাত্রী এবং মদীনার গভর্নর আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদের চাচী।

---

[২৬৯] ইবনে, সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৪৮০; ইবনে হাজার, *তাহযিবুত তাহযিব*, ১২:৪৬৬ (২৮৫০)।

আয়েশা রা.-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

নিঃসন্দেহে জ্ঞানের বিচারে সাহাবীদের মধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য। প্রথম থেকেই তিনি সবকিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, নতুন নতুন তথ্যের সমন্বয় করেছেন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজের সন্দেহ দূর করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে সবকিছু জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যা অন্যরা দেখারও সুযোগ পায়নি অথবা রাসূলকে সরাসরি প্রশ্ন করার সাহস পায়নি। রাসূল ছিলেন তার জীবনের কেন্দ্র এবং তার জন্যই তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। রাসূলের সাথে একই ঘরে তিনি ছিলেন। দিন-রাত সবসময় তিনি রাসূলের জ্ঞানের সমুদ্র থেকে বালতি পূর্ণ করে জ্ঞান আহরণ করেছেন। তিনি সব ব্যাপারেই রাসূলকে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন। এমন কিছু ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রশ্ন করেছেন যা অন্যরা সম্মান ও ভক্তির কারণে জিজ্ঞেস করার সাহস পেত না। এভাবে তিনি এসব বিষয়ে সরাসরি রাসূলের কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছেন। মসজিদে নববীর পাশে তার ঘর ছিল। তাতে তিনি রাসূলের খুতবা বা ভাষণ শোনার তাওফীকও পেয়েছেন। যখনই কোনো কিছু তার খটকা লাগত বা পেরেশানি সৃষ্টি করত, সে বিষয়ে তখনই তিনি রাসূলকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে না বোঝার আগ পর্যন্ত প্রশ্ন করা বন্ধ করতেন না।[২৭০]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অন্তঃকরণ এসব প্রশ্ন আর উত্তরের সমন্বয় করে অভিভূত হতো। তিনি না বুঝে কোনো তথ্য গ্রহণ করতেন না এবং এ রকম অবস্থায় বোঝার আগ পর্যন্ত অস্থির থাকতেন। এ তথ্যের প্রকৃত কারণ বা হেকমত বোঝার পরই তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করতেন।

---

[২৭০] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৭৫ (২৪৫০৭, ২৪৫১১, ২৪৫১৪)।

তার সম্পর্কে ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, 'তিনি যখন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন যা তিনি জানতেন না, সেটা না জেনে তিনি দাঁড়াতে পারতেন না।'[২৭১]

বিজ্ঞ ফকীহগণ, যেমন হাকিম, বলেছেন যে, শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে এ উম্মত লাভ করেছে।[২৭২] তার সময় অনেকে তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য তার কাছে আসত, এখনো তিনি অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎস হয়ে আছেন।

আবু মূসা আল-আশআরী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

> সাহাবী হিসেবে আমরা যখনই কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতাম, আমরা এটা আয়েশার কাছে উপস্থাপন করতাম। কারণ তার কাছে এমন সব তথ্য মজুদ ছিল যার দ্বারা আমরা কঠিন সমস্যার সমাধান পেয়ে যেতাম।[২৭৩]

আতা ইবনে আবি রাবাহ এ উক্তির সমর্থনে বলেন, 'আয়েশা ছিলেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, ইলমে পারদর্শী মহীয়সী নারী এবং যিনি সবচেয়ে বিজ্ঞ চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের অধিকারিণী ছিলেন।'[২৭৪]

বড়দের মধ্যে হিশাম ইবনে উরওয়া বলেন, 'চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফিকহ অথবা সাহিত্যে, কাব্যপ্রতিভায় আমি আয়েশার চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি।'[২৭৫]

ইমাম মাসরূক বর্ণনা করেন, 'আমি বড় বড় সাহাবীদের মীরাস বণ্টন-সংক্রান্ত মাসআলা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।'[২৭৬]

---

[২৭১] *তাফসীরে বাগাভী*, ১:৩৭৪; আইনী, *উমাদাতুল কারী*, ২:১৩৬।
[২৭২] তাহমায, *সায়্যিদাতু আয়েশা*, ১৭৪।
[২৭৩] তিরমিযি, *সুনান*, মানাকিব, ৬৩ (৩৮৮৩)।
[২৭৪] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪:১৫ (৬৭৪৮)।
[২৭৫] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪:১২ (৬৭৩৩)।

আরেকজন বড় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আল-যুহরি বলেন, 'তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী। এ কারণে অনেক বিখ্যাত সাহাবী তার কাছে প্রশ্ন করে করে জ্ঞান আহরণ করত...।[২৭৭] যদি রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদেরসহ দুনিয়ার সকল মহিলাদের জ্ঞান বাম পাল্লায় রেখে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জ্ঞান ডান পাল্লায় রাখা হয়, তবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার দিকটাই অনেক বেশি ভারী হবে।'[২৭৮]

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবু সালামা বলেন, 'সুন্নাতের ব্যাপারে আয়েশার চেয়ে বেশি জ্ঞানী আমি কাউকে দেখিনি। ফিকহ বিষয়েও তিনি অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন। কোথায় কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে, এ বিষয়েও তিনি অধিক জ্ঞাত ছিলেন।'[২৭৯]

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের ফুফু ছিলেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি আয়েশার একজন উঁচু স্তরের ছাত্র ছিলেন। কালামশাস্ত্র সম্পর্কে আয়েশার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আগে এবং পরে পুরুষ অথবা মহিলাদের মধ্যে আমি আয়েশার চেয়ে জ্ঞানী কাউকে দেখিনি, তার মতো কালামশাস্ত্রে পারদর্শীও কাউকে দেখিনি।'

তার এ ইলমী দক্ষতায় শুধু যে বিজ্ঞ লোকরাই আকৃষ্ট হতো তা নয়, বরং সবাই তার মেধাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। একদিন খলীফা মুআবিয়া যায়িদকে ডাকলেন। যায়িদ ঐ জামানার একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাকে খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'বর্তমান জামানায় সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী কে?'

'অবশ্যই আপনি, হে আমীরুল মুমিনীন।

মুআবিয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ কথা সত্যের চেয়ে অতিকথনই মনে হলো। তিনি সত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এজন্য তিনি আবার তাকে বলেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি সত্য কথাটি বলুন।'

---

[২৭৬] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪:১২ (৬৭৩৬); দরিমি, *সুনান*, ২:৪৪২ (২৮৫৯)অ
[২৭৭] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ২:৩৭৪।
[২৭৮] হাকিম, *মুসতাদারক*, ২:১২ (৬৭৩৪)।
[২৭৯] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*।

'আল্লাহর কসম! তিনি হচ্ছেন আয়েশা।'

যারকাসি *আল-ইযাবা* নামক কিতাবটি কেবল আয়েশার ইলমী যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ সম্পর্কেই লিপিবদ্ধ করেন। তার ইলমের প্রতি পিপাসা ছিল অতুলনীয়। রাসূল ইন্তেকালের আগে গোপনে যে কথা ফাতিমাকে বলেছিলেন, তা রাসূলের ইন্তেকালের পরে জানতে পেরেছেন। যদি তিনি এটা জানার জন্য উদগ্রীব না হতেন, তাহলে দুনিয়াতে আর কারও সেটা জানার সৌভাগ্য হতো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রবেশ করার পর থেকে তার এ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির কখনো কোনো পরিবর্তন হয়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ ঘরের জ্ঞানের দরজা প্রশ্ন করার মাধ্যমে খুলবে এবং এ কারণেই তিনি তার সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন। এটা তার একক চরিত্র। তিনি যা দেখতেন বা শুনতেন তা বিচার-বিশ্লেষণ করতেন এবং তাতে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতেন। আর কোনো নতুন তথ্য জানলে তার সাথে জানা জ্ঞানের তুলনা করতেন এবং সন্দেহ হলে তা দূর করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতেন।

কুরআনের তাফসীর

কুরআনের মূল তাফসীরকারক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য জানতেন এবং মানুষকে তা জানানোর প্রয়োজন হলে জানাতেন। আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরভাবে অনুসরণ করতেন এবং জটিল বিষয়াদি সরাসরি তার কাছ থেকেই শিখতেন। তিনি কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য জানার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং সাধারণ বিষয়াদি ইসলামের সীমার ভেতর থেকেই তাফসীর করতেন। তিনি কেবল যা দেখেছেন বা শুনেছেন তা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ তার মর্মার্থও বর্ণনা করতেন। কুরআনের সাধারণ আয়াতসমূহের তাফসীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমেই প্রচারিত হতো যা থেকে তাফসীরবিদ হিসেবে আয়েশার গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নে উরওয়া তাকে নিচের আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জানতে চান,

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিমের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে কাজ করতে পারবে না, তবে (তাদের বিবাহ না করে) অন্য নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয়, বিবাহ কর। দুই দুইজন, তিন তিনজন অথবা চার চারজনকে। অবশ্য যদি আশঙ্কাবোধ কর যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাক। এ পন্থায় তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (সূরা আন-নিসা, ৪:৩)

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দেন, 'হে আমার ভাগ্নে! এ আয়াতে ইয়াতিম বলতে তাদের বুঝিয়েছে যারা কোনো অভিভাবকের অধীনে থাকে এবং তারা যখন বড় হয়ে সৌন্দর্যের কারণে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তাহলে অভিভাবকরা তাদের কামনা করতে পারে এবং কোনো দেনমোহর না দিয়েই নিজের কাছে রেখে দিতে পারে অথবা দিলেও সামান্য অংশ দেওয়ার আশঙ্কা আছে। এ আয়াতে অভিভাবকদের এ আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং তাদের অন্য নারীকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

এ তাফসীর শোনার পরও লোকেরা এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও প্রশ্ন করেছে। তারপর আরেকটি আয়াত নাযিল হয়,

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝

এবং (হে নবী) লোকে তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের বিধান জানাচ্ছেন এবং এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)-এর যেসব আয়াত তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে, তাও (তোমাদের শরীয়তের বিধান জানায়) সেই ইয়াতিম নারীদের সম্পর্কে যাদের তোমরা তাদের নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদের বিবাহও করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্পর্কেও (বিধান জানায়) এবং তোমাদের জোর নির্দেশ দেয় যেন ইয়াতিমের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা যা কিছু সৎকাজ করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা আন-নিসা, ৪:১২৭)

ঐ যুগে সুন্দরী এবং সম্পদশালী মহিলা ইয়াতিমদেরই কেবল বিয়ে করার জন্য পছন্দ করা হতো। প্রকৃত দেনমোহরের ভিত্তিতে শরীয়ত অনুযায়ী এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু তার সম্পদ এবং সৌন্দর্যে ঘাটতি থাকলে বিপত্তি ঘটত। এক্ষেত্রে তারা ইয়াতিমকে বাদ দিয়ে অন্য নারীকে বিয়ে করত। এ কারণে বিয়ে করুক বা না করুক, তাদের এ পরিস্থিতিতে প্রকৃত দেনমোহর পরিশোধ করতে বলা হয়েছে।[২৮০]

আয়েশার তাফসীরজ্ঞান সম্পর্কে অন্যের ধারণা করারও অবকাশ ছিল না যদিও তারা এক্ষেত্রে ইমাম ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

যারা সচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারবে। (সূরা আন-নিসা, ৪:৬)

এ আয়াতটি নিচের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে,

---

[২৮০] বুখারী, সহীহ, নিকাহ, ১, ৩৮ (৪৭৭৭, ৪৮৩৮)।

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ اَمۡوَالَ الۡیَتٰمٰی ظُلۡمًا اِنَّمَا یَاۡکُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِهِمۡ نَارًا ؕ وَ سَیَصۡلَوۡنَ سَعِیۡرًا ﴿۱۰﴾

> যারা ইয়াতীমের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে। (সূরা আন-নিসা, ৪:১০)

এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'যে আয়াতে খাওয়ার অনুমতি আছে সেটি সেইসব লোকদের জন্য যারা ইয়াতীমের বিষয়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা-শোনা করে। এমন ওলী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে তাদের বিনিময় গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তার মর্যাদা অনুযায়ী কিছু গ্রহণ করতে পারে।' তিনি বলেন যে, এই দুই আয়াতে কোনো বিরোধ নেই। শাস্তি তাদের জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য হবে যারা কোনো প্রয়োজন ছাড়া অথবা যোগ্যতা ছাড়া ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে।[২৮১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার তাফসীরের ব্যাপারে এত পারদর্শিতার অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারায় বলেছেন,

حٰفِظُوۡا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الۡوُسۡطٰی ٭ وَ قُوۡمُوۡا لِلّٰهِ قٰنِتِیۡنَ ﴿۲۳۸﴾

> তোমরা সব নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (সূরা আল-বাকারা, ২:২৩৮)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে 'মধ্যবর্তী নামায' বলতে ফজরের নামায মনে করতেন। এর মধ্যে যায়িদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু মতে 'মধ্যবর্তী নামায' হলো যোহরের নামায। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এখানে আসরের নামাযকে

---

[২৮১] বুখারী, সহীহ, বুয়ূ, ৯৫ (২০৯৮), ওয়াসায়া, ২৩ (২৬১৪), তাফসীর, ৮১ (৪২৯৯)।

বোঝানো হয়েছে। রাসূলের হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি এ তাফসীর করেছিলেন। তিনি নিজের কাছে রক্ষিত কুরআনের কপিতে এ আয়াতের পার্শ্বে টিকায় 'আসরের নামায' কথাটি লিখে রেখেছিলেন।[২৮২]

তিনি বড় বড় সাহাবীদের মতের উপর তার রায় পেশ করেছিলেন যেমন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সামুরাহ ইবনে যুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু।[২৮৩]

একই রকম ঘটনা ঘটেছিল নিচের আয়াতের ব্যাপারে,

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

> তোমরা তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। (সূরা আল-বাকারা, ২:২৮৪)

বিশিষ্ট ইমামগণ যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন এই আয়াত নিচের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

> আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না, সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। (সূরা আল-বাকারা, ২:২৮৬)

কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এটা ঠিক নয় :

---

[২৮২] মুসলিম, *সহীহ*, মাসজিদ, ২০৭ (৬২৯)।
[২৮৩] আবু দাউদ, *সুনান*, সালাত, ৫ (৪০৯); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৫:২০ (২১৮৪০)।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করার পর কেউই আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। তিনি বলেছেন, 'এটা ঐসব মুমিনদের জন্য যে অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা তার উপর কোনো বিপদ আসে অথবা কোনো সম্পদ পেয়ে তা হারানোর ভয় করে যা তাকে আল্লাহ দান করেছিলেন। এ রকম মুসিবতের কারণে একজন বান্দা, ময়লা থেকে স্বর্ণকে যেমন করে খাঁটি করা হয়, তেমন করেই নিজেকে পবিত্র করতে পারে।[২৮৪]

হাদীস

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার শান্তির ঘরই ছিল হাদীসের প্রথম দরস কেন্দ্র। মনিব-গোলাম, শিশু-মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, আরব-অনারবসহ সব শ্রেণীর মানুষ তার এ শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়মিত আসতেন। আর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষক। মসজিদে নববীর পাশেই ছিল তার ঘর। এজন্য মসজিদে যা কিছু বলা-কওয়া হতো, ঘরে বসে থেকেও সবই তিনি জানতেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে যেতেন এবং জামাতে নামাযে শরীক হতেন এবং কখনই তার খুতবা মিস করেননি। তিনি নতুন নাযিলকৃত বিধি-বিধানসহ শরীয়তের সব আহকাম মেনে চলতেন। কারও জানার আগেই আয়েশা ইসলামের সর্বশেষ খবর তিনি জানতেন।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো কিছু সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তাদের 'মুকসিরুন' (অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এ মুকসিরুনদের দলে আয়েশা বিশেষ অবস্থান ছিল, কারণ তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অন্য আর কেউ বর্ণনা করেনি। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহাবস্থানের জন্য সম্ভব হয়েছিল যেখানে অন্যের থাকার কোনো সুযোগ ছিল না।

---

[২৮৪] তিরিমিযি, *সুনান*, তাফসীর, ৩ (২৯৯০-২৯৯২)।

এসব হাদীসকে ফারদ (একক) অথবা মুনফারিদ (এককভাবে) বলা হয়। এটা কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠতার জন্যই হয়েছিল তা নয়, বরং তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের তথ্যের ভাণ্ডার, তার ব্যক্তিগত অবস্থা, রাত্রিকালীন ইবাদত এবং তিনি কীভাবে একাকী সময় ব্যয় করতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, যদি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা না থাকতেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের অনেক তথ্য হারিয়ে যেত এবং এ উম্মত এক বিশাল তথ্যের ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত থেকে যেত।

অন্যান্য মুকসিরুনদের মতো তিনি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি মাহফিল বা সভায় থাকতে পারতেন এবং তার সাথে আরও বেশি সফর করতে পারতেন এবং তিনি যদি তার বেশিরভাগ সময় ঘরে না কাটাতেন, তাহলে তিনি হয়তো আরও বেশি হাদীস বর্ণনা করতে পারতেন। তিনি সর্বমোট দুই হাজারের বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকারণ জানাও জরুরি। আয়েশা সব সময় বিচার-বিবেচনা প্রয়োগের আগে তার কার্যকারণ জানার চেষ্টা করতেন। এটা তিনি স্বচক্ষে দেখে অথবা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবারে গোসল করাকে উৎসাহিত করেছেন। অন্যান্য সাহাবীরা এটাকে একটি সাধারণ সুন্নাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর বিস্তারিত কার্যকারণসহ বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন তার উম্মতগণ সকালের ঘর্মাক্ত কাজ-কারবার শেষে শরীর ধুয়ে পরিষ্কার করে, আতর লাগিয়ে মসজিদে নামাযের জন্য আসবে যা তাদের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এভাবে সেটা বর্ণনা করেছেন, 'শুক্রবারে জুমুআর নামাযে মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে এবং মদীনার বাইরের বসতি থেকে আসত। তারা ধুলোবালির মধ্য দিয়ে আসত। এতে তারা ঘামে ও ধুলোবালিতে একাকার হয়ে যেত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট অবস্থান করছেন, এমন সময় তাদেরই

এক ব্যক্তি তার কাছে আসে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা যদি এই দিনটিতে গোসল করতে তাহলে ভালো হতো।"

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'লোকেরা নিজ হাতে কাজ করত। যখন তারা জুমুআর নামাযে যেত তখন সেই অবস্থায় চলে যেত। তখন তাদের বলা হয়, তোমরা যদি গোসল করতে তাহলে ভালো হতো।'[২৮৫]

ঈদুল আযহার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, 'কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খাওয়া যাবে না।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ আরও অনেক বড় বড় সাহাবী এই নির্দেশকে চিরস্থায়ী বলে মনে করতেন।[২৮৬] কিন্তু এ ব্যাপারে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মত ছিল ভিন্ন। তখন লোকেরা লবণ দিয়ে কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করত। এটা খুবই সাধারণ একটি রীতি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে তিনি আশা করতেন মানুষ যেন এই গোশত থেকে কিছু অন্যদেরও খেতে দেয়। যেহেতু গোশত তিন দিনের বেশিও সংরক্ষণ করা যায়, এজন্য এ হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, 'কুরবানীর গোশত কি তিন দিনের বেশি খাওয়া নিষেধ?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, 'না। তখন কুরবানী করার লোক কম ছিল। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন, যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদেরকেও যেন ঐ গোশত খেতে দেওয়া হয়। আমরা খাসির সামনের পায়ের গোশত ঈদুল আযহার দশ দিন পরও খেতাম।'[২৮৭]

যখন কেউ কেউ বলত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুম্বার ঘাড়ের গোশত পছন্দ করেন, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ বিষয়ে বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাড়ের (বাহুর) গোশতই

---

[২৮৫] বুখারী, *সহীহ*, উযু'আ, ১৩-১৪ (৮৬০-৮৬১)।
[২৮৬] মুসলিম, *সহীহ*, আদাহী, ২৬ (১৯৭০)।
[২৮৭] তিরমিযি, *সুনান*, (১৫১১), ইবনে মাযাহ, *সুনান*, আত'ইমা, ৩০ (৩৩১৩)।

অধিক প্রিয় ছিল তা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অনেক দিন পর পর তিনি গোশত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। তাই তাকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হতো। কেননা বাহুর গোশত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায়।'

প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন কর্মচারীকে খাইবার থেকে কর আদায় করতে পাঠাতেন। বর্ণনায় এসেছে, ঐ কর্মচারী উৎপন্ন ফসলের উপর করের পরিমাণ অনুমান করে আদায় করতেন। কিন্তু তিনি তার অনুমানের কোনো ভিত্তির কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় এর ভিত্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কর্মচারীকে উৎপন্ন ফসল থেকে যেটুকু খাওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

আয়েশার বর্ণনার সম্পূর্ণতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করত। এর মধ্যে একই ঘটনা বার বার দেখা, যা স্বচক্ষে দেখেননি অথবা যেখানে তার খটকা লাগত এমন বিষয়াদিতে প্রশ্ন করা ছিল বড় কারণ। আয়েশা খুব সতর্ক ছিলেন এবং সত্যানুসন্ধানে খুবই আন্তরিক ছিলেন। যা কিছু তিনি শুনতেন তার কার্যকারণ জানার চেষ্টা করতেন এবং মূল উৎস থেকে তা নিশ্চিত করতেন।

একবার দুজন আগন্তুক তাকে একটি হাদীস শোনালেন, 'তিনটি জিনিসে খারাপ ভাগ্য নিহিত থাকে; নারী, বাহন এবং বাড়ি।' তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন?' তাদের কথা শুনে আয়েশা রেগে যান এবং তার আচরণেও এ রাগ প্রকাশ পায়। তিনি চারিদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে ওঠেন, 'আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি যিনি আবুল কাসিমের উপর কুরআন নাযিল করেছেন, আবু হুরাইরা যা বলেছেন তা ঠিক নয়। যখন রাসূল কথা বলছিলেন, তখন আবু হুরাইরা ঘরে প্রবেশ করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, 'ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ বলত, তিনটি জিনিসে খারাপ ভাগ্য নিহিত থাকে; নারী, বাহন এবং বাড়ি।'

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসের শেষাংশ শুনেছেন, প্রথম অংশ শোনেননি। তারপর তিনি কুরআন মাজীদের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ﴿۲۲﴾

> পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের উপর যে মুসিবত দেখা দেয়, তার মধ্যে এমন কোনোটিই নেই, যা সেই সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ। (সূরা হাদীদ, ৫৭:২২)

এ আয়াতের মাধ্যমে আয়েশা উপস্থাপন করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার সাথে বান্দার ইচ্ছার কোনো তুলনা চলে না এবং এ ব্যাপারে কোনো ভুল বোঝাবুঝিরও কোনো অবকাশ নেই। জাহিলিয়্যাতের যুগে সামাজিক বন্ধনে অনেক কুপ্রথা ছিল। বিভিন্ন ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল। তারা মূতা বিয়েতে (অস্থায়ী বিবাহবন্ধন) অভ্যস্ত ছিল।

সতের হিজরীতে এ সম্পর্কে কুরআনে বিধান নাযিল হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দৃঢ়ভাবে বলেন যে, ইসলামে এ বিবাহ নিষিদ্ধ। তখনো অনেকে এমন ছিলেন যারা মূতা বিবাহ রহিত হওয়ার বিধান শোনেননি এবং মূতা বিবাহের পক্ষে ছিলেন। যখন কেউ কেউ এ বিয়ের বৈধতার ব্যাপারে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি অবাক বিস্ময়ে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন,

وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ لِفُرُوۡجِهِمۡ حٰفِظُوۡنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰۤی اَزۡوَاجِهِمۡ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَیۡرُ مَلُوۡمِیۡنَ ۚ﴿۶﴾

> এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (সূরা মুমিনুন, ২৩:৫-৬)

একদিন তিনি এ কথা শুনলেন যে, গোসলের সময় মেয়েদের চুলের খোপা খুলে চুল ভেজানো জরুরি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু

আনহু এটা বর্ণনা করতেন। আয়েশা এর জবাবে বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কথা শুনে বিস্মিত হয়েছি। তিনি গোসলের সময় মেয়েদের চুলের খোপা খুলে চুল ভেজাতে বলেন! তিনি মহিলাদের এ কথা বলে দেন না কেন যে, তারা যেন তাদের খোপা কেটে ফেলে। আমি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই জায়গায় গোসল করতাম এবং আমি তার সামনেই চুলের খোপা না খুলে কেবল তিনবার মাথায় পানি দিতাম।'[২৮৮]

আরেকদিন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি ফতোয়া শুনতে পেলেন যে, অযু অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিলে অযু ভেঙ্গে যায়। তিনি সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে এমন বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছিলেন যে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল না। আয়েশা এ বিষয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরা জরুরি মনে করলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ তুলে ধরলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন এবং পুনর্বার অযু ছাড়াই নামাযে চলে যেতেন।'[২৮৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলার ধরন এবং হাদীস কিভাবে বর্ণনা করতে হবে - এ ব্যাপারে তিনি অন্যদের শেখাতেন। কেউ একজন তাকে রাসূল কিভাবে কথা বলতেন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন, 'তিনি এত ধীরে এবং পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন যে, যদি কেউ শব্দগুলো গোনার চেষ্টা করত, তাহলে সহজেই সেটা করতে পারত।' আরেক সময় আয়েশা নামায পড়ছিলেন। তিনি তখন ঘরের বাইরে কাউকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলেন। ঐ ব্যক্তি এত দ্রুত হাদীস বলছিলেন যে কেউই কিছু বুঝতে পারছিল না।

স্বাভাবিকভাবেই এভাবে হাদীস বর্ণনা করাতে আয়েশার কষ্ট হলো। তিনি বললেন, 'এক ব্যক্তি এসে আমার ঘরের বাইরে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা

---

২৮৮ মুসলিম, *সহীহ*, হায়েয, ৫৯ (৩৩৯); ইবনে মাযাহ, *সুনান*, পবিত্রতা, ১০৮ (৬০৪)।

২৮৯ হাদীস বর্ণনাকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে এ আচরণ করেছিলেন কি না জানতে চাইলে তিনি হেসে দেন। দেখুন আবু দাউদ, *সুনান*, তারাহ, ৬৯ (১৭৮-১৭৯)।

করা শুরু করল যেন আমি শুনি। তারপর দ্রুত সে সেখান থেকে প্রস্থান করে। আমি নামায পড়ছিলাম এবং আমার নামায শেষ হওয়ার আগেই লোকটির হাদীস বর্ণনা শেষ হয়ে যায়। যদি আমি তাকে ধরতে পারতাম, তাহলে তাকে বলতাম, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এভাবে কথা বলতেন না যেভাবে তুমি বলেছ।'

ইলমে ফিকহ

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নতুন নতুন সমস্যায় অপূর্ব সব ফতোয়া দিয়েছেন। ফিকহের জন্য উদ্ভূত সমস্যার গুরুত্ব ও কার্যকারণ অনুধাবন অপরিহার্য। মূল ও সঠিক কার্যকারণের উপরই শরীয়তের বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভর করে। যদি কোনো বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা না পাওয়া যায়, তখন ফিকহ ও কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আয়েশা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন।

আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো কথা বা আচরণ বুঝতে অক্ষম হলে তিনি বারবার প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতেন। পরবর্তীতে কোনো হাদীসের ব্যাপারে ভুল বা অপব্যাখ্যার বিপরীতে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শুধরে দিতেন।

আয়েশা বলতেন যে, কোনো সন্তানসম্ভবা বিধবা নারী বাচ্চা প্রসব করার পরই নতুন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আর তার বাচ্চা প্রসব করার মাধ্যমেই তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনার দিকে ইশারা করে এ ফতোয়া দিয়েছিলেন। সুবাইয়া আল-আসলামিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান প্রসব করেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরেকজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।[২৯০]

---

[২৯০] মুসলিম, *সহীহ*, তালাক, ৩৬ (১৪৮০)।

মাগরিবের নামায কেন তিন রাকাত এ ব্যাপারে আয়েশা বলেন, 'এটা ঐ দিনের জন্য বিতর!' তিনি জানতেন ফজরের নামায কেন দুই রাকাত এবং এটা একীনের সাথে বিশ্বাস করতেন যে, ফজরের নামাযে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা জরুরি, কত বেশি পড়া হলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আয়েশা সবাইকে হজে তাওয়াফ করা, সাঈ করা এবং শয়তানের জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার মতো কাজগুলোতে বাহ্যিক দিক পরিহার করে আল্লাহর স্মরণ করার প্রতি তাগিদ দিতেন।[২৯১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের সময় মুহাসসার উপত্যকায় (যা আবতাহ নামে পরিচিত) তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটাকে সুন্নাত মনে করেননি। এ ব্যাপারে বলতেন, 'আল-আবতাহ' উপত্যকায় অবস্থান করা সুন্নাত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এ জন্য অবস্থান করেছিলেন যে, সেখান থেকে বের হওয়া তার জন্য সহজ ছিল।[২৯২]

হাতিম কাবার অংশ কি না এ ব্যাপারে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'এটাকে কেন কাবা ঘরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'তখনকার যুগে লোকজনের কাছে টাকা-পয়সার স্বল্পতা ছিল। নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে বেশি ব্যস্ত থাকাতে তারা এটা করতে পারেনি।'

তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কাবা ঘরের দরজা এত উঁচুতে কেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'লোকেরা এ রকম করেছিল কারণ তারা যাদের চাইত তাদের কেবল ভেতরে প্রবেশ করতে দিত, আর যাদের ব্যাপারে তারা তা চাইত না, তাদের প্রবেশ করতে দিত না।'

---

[২৯১] আবু দাউদ, *সুনান*, মানাসিক, ৫১ (১৮৮৮); তিরমিযি, *সুনান*, সওম, ৬৪ (৯০২)।
[২৯২] বুখারী, *সহীহ*, হজ, ১৪৬ (১৬৭৬)।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আপনি কি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মূল ভিত্তির উপর ঘরটি আবার নির্মাণ করতে চান না?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদি তোমার লোকেরা স্বল্পকাল আগে পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তা করতাম।'

তার মতো এ রকম অবিশ্বাস্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা এ ঘটনা থেকে অনেক কিছুরই সমাধান বের করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি কখনো কাউকে এমন কোনো কিছু শিক্ষা দিতেন না যা লোকেরা হয়ত সঠিক সময় ও কালের অভাবে গ্রহণ করতে পারবে না অথবা শতাব্দী পরে পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তনে তা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। আয়েশা সেই সব সৌভাগ্যশীল জ্ঞানীদের একজন যিনি স্থান ও কালভেদে ফতোয়ার পরিবর্তনকে বিশ্বাস করতেন। উদহারণস্বরূপ তিনি মসজিদে মহিলাদের নামায পড়তে উৎসাহিত করার মাসআলা পরবর্তীতে আর প্রযোজ্য ছিল না বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, এখন পরিবেশ পরিবর্তন হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মানুষের মধ্যে যে পবিত্রতা ও তাকওয়া-পরহেজগারি ছিল, তা এখন আর সেরকম নেই। এজন্য এ ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং নতুন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া জরুরি।[২৯৩]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ফিকহ সম্পর্কিত জ্ঞান সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহনির্ভর ছিল, তাফসীর ও হাদীসের বেলায়ও একই রকম ছিল। তিনি নতুন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা খাঁটিয়ে প্রয়োজনের সময় সমাধান দিতেন। তার কাছে কোনো বিষয় উপস্থাপিত হলে তিনি তা কুরআন ও সুন্নাহতে তা তালাশ করতেন। তিনি একই ধরনের ঘটনাগুলো পরখ করার চেষ্টা করতেন। যদি সেখানে কোনো মিল খুঁজে পেতেন, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, আগুনের উপসনাকারী যদি কোনো পশু

---

[২৯৩] বুখারী, সহীহ, সিফাতুস সালাত, ৭৯ (৮৩১)।

কুরবানী করে তাহলে সে গোশত খাওয়া যাবে কি যাবে না, তিনি তখন তাদের কুরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিতেন যেখানে বলা হয়েছে, যে প্রাণী আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি, সে গোশত খাওয়া যাবে না। তিনি পার্সিয়ানদের দিকে ইশারা করে বলতেন, যেহেতু তারা আল্লাহর নামে পশু জবাই করে না, এজন্য তাদের গোশত খাওয়া হারাম।[২৯৪]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্যদের মতের বিরুদ্ধেও রায় দিতেন। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতকালীন সময় নিয়ে কুরআনে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যদি কোনো তালাকপ্রাপ্তা মহিলা আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে এটা নিশ্চিত হওয়া জরুরি যে, ঐ মহিলা অন্তঃসত্ত্বা নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, ইদ্দতকালীন সময়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ঋতুর তিনটি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যখন নতুন মাস শুরু হয়, তখন তাকে স্বামীর ঘরে ছেড়ে চলে আসতে বলতেন এবং লোকজনকে এ রকম আমল করতে বলতেন। আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, 'আমি তাকে ছাড়া আর কোনো ফকিহ দেখি না যে কিনা এ বিষয়ে এ রকম ব্যাখ্যা ও ফতোয়া দিয়েছেন।'[২৯৫]

কোনো কোনো সাহাবী একটি পরিবারের বিচ্ছেদকে তালাক সাব্যস্ত করেছিলেন। সেখানে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তালাক হয়নি বলে ফতোয়া দিলেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকেই এ ফতোয়া দিয়েছিলেন। যারা তার এ সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের এই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা তাকে ছেড়ে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য গ্রহণ করতে পারেন অথবা তার সাথে থেকে এই দারিদ্র ও অনাহারকে বরণ করতে পারেন। তিনি কখনো এটাকে তালাক হিসেবে গণ্য করেননি।'[২৯৬]

একদিন সা'দ ইবনে হিশাম জিজ্ঞেস করেন, 'বিয়ে না করা সম্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। চিরকুমার থাকার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

---

[২৯৪] সূরা আল-বাকার, ২:১৭৩; কুরতুবী, *আল-জামি*, ২:২২৪।
[২৯৫] মালিক, *মুয়াত্তা*, তালাক, ১১৯৮।
[২৯৬] বুখারী, তালাক, ৪ (৪৯৬২, ৪৯৬৩)।

কোনো রকমের দ্বিধা ছাড়াই তিনি জবাব দিলেন,

> কখনো এটা করবে না। তুমি কি আল্লাহর আয়াত শোননি, তিনি বলেছেন,
>
> وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
>
> বস্তুত তোমার আগেও আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি।' কুমার থাকা থেকে দূরে থাক। (সূরা আর-রদ, ১৩:৩৮)

ফিকহ সম্পর্কে তার জ্ঞানকে অনেকেই মূল্যায়ন করেছেন। প্রাজ্ঞ আলেম যেমন আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে জ্ঞানী কাউকে দেখেননি। অন্যদিকে আবু উমর ইবনে আব্দুল বার-এর মতো জ্ঞানীরা মনে করতেন যে, আয়েশা তার যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ। অন্যদের মধ্যে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় তিনি একাই ছিলেন ফতোয়ার একটি প্রতিষ্ঠান। ঐ যুগে বসরা থেকে দামেস্ক, কুফা থেকে মিশর - সব জায়গা থেকে অনেকে মানুষ দলে দলে মদীনায় তার কাছে আসত। তার কাছে ধর্মীয় বিষয়াদি জিজ্ঞেস করত। যারা আসতে পারত না, তারা চিঠি ও হাদিয়া পাঠাত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিশেষ ছাত্রী আয়েশা বিনতে তালহা সেসব চিঠি ও হাদিয়ার উত্তর দিতেন।

ইলমে কিয়াস

কুরআনের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো তথ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খুবই মর্মাহত হতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন বলে মনে করতেন। তারা আনুষঙ্গিক কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করতেন এবং কুরআনের এ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করতেন, 'এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, সে তাকে (অর্থাৎ জিবরাইলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখতে পেয়েছে' (সূরা আত-তাকবির, ৮১:২৩), 'বস্তুত তিনি

তাকে (ফেরেশতা) আরও একবার দেখেছেন। সেই কুল গাছের কাছে যার নাম সিদরাতুল মুনতাহা' (সূরা আন-নাযম, ৫৩:১৩-১৪), এবং 'সত্য কথা হলো, তিনি তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছেন।' (সূরা আন-নাযম, ৫৩:১৮)

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীলুল্লাহ উপাধি দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলে তাকে কালিমুল্লাহ উপাধিতে সম্মানিত করেছেন, একইভাবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকে দেখার সৌভাগ্য দিয়ে অতি উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।'

তার সাথে অনেকেই একমত পোষণ করেননি। এর মধ্যে আয়েশা, আবু যর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং উবাই ইবনে কাব অন্যতম। তারা বলতেন, রাসূল জিবরাইল আলাইহিস সালামকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং এ ব্যাপারে মেরাজের হাদীস পেশ করতেন যেখানে এ দৃষ্টিকোণ দিয়ে তা দেখার কথা বলা হয়েছে।

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূল কি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন?'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন,

> তুমি এমন একটি কথা বলেছ যা শুনে আমার দেহের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এখানে তিনটি বিষয় আছে। প্রথমত, যে তোমাকে বলে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলে :
>
> لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝
>
> দৃষ্টিসমূহ তাকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ। (সূরা আনআম, ৬:১০৩)

আবার,

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿۵۱﴾

কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো দূত পাঠাবেন। (সূরা শূরা, ৪২:৫১)
দ্বিতীয়ত, যে কেউ বলে রাসূল ভবিষ্যৎ জানতেন, সে মিথ্যা বলে। কারণ আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

কোনো প্রাণ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে। (সূরা লুকমান, ৩১:৩৪)

তৃতীয়ত, যদি কেউ বলে রাসূল কোনো কিছু গোপন করে গেছেন, তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই মিথ্যা বলে। কারণ আল্লাহ রাসূলকে আদেশ করেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ

হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা প্রচার কর।' যা হোক তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে স্বচক্ষে তার প্রকৃত আকৃতিতে দুবার দেখেছিলেন। (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৬৭)।[২৯৭]

সাহিত্য

আরবী ভাষায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি জানতেন কোনো কথা কীভাবে বলতে হবে। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন সবার মনযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হতেন। তার বর্ণনাভঙ্গি ছিল শক্তিশালী এবং শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন।

---

[২৯৭] 'দেখা' সম্পর্কে দেখুন বুখারী, *সহীহ*, বাদুল খালক, ৭ (৩০৬২); তাবরানি, *মুযমাউল কাবির*, ১২:৯০ (১২৫৬৫); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:২৪১ (২৬০৮২)।

উদাহরণস্বরূপ, তিসি যখন রাসূলের উপর প্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা বর্ণনা করতেন, তখন তার অভিব্যক্তি ছিল, 'তার সব স্বপ্ন সকালের আলোর মতো বাস্তব হতো।'[২৯৮]

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর ভারে কষ্ট সহ্য করতেন, তার বর্ণনায় বলতেন, 'ওহী নাযিল হওয়ার সময় তার অবস্থা এমন মনে হতো যেন তিনি ঐশী শব্দাবলি আত্মস্থ করছেন। এ শব্দাবলির ভারে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতেন। শীতকালেও তার চেহারায় মুক্তার দানার মতো ঘাম ঝরে পড়ত।'

তিনি যখন মুনাফিকদের দ্বারা অপবাদের শিকার হয়েছিলেন, তখন তিনি তার দুঃখ-যাতনা এভাবে ব্যক্ত করতেন, 'ঐদিন আমি এত বেশি ব্যথিত হয়েছিলাম যে, আমার চোখে আর কান্নার কোনো পানি অবশিষ্ট ছিল না। মনে হতো আমার চোখের নালি শুকিয়ে গেছে। আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। এত দীর্ঘ সময় চোখ খোলা ছিল যে চোখে সুরমাও লাগাতে পারিনি।'[২৯৯]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে কবিত্ববোধ ছিল প্রখর। তিনি তা দৈনন্দিন কথাবার্তায় শুধু ব্যবহারই করেতন না, বরং এতে শব্দচয়নও ছিল তার অপূর্ব। এসব শব্দ ছিল গভীর অর্থবোধক এবং সহজবোধ্য।
আয়েশা ইতিহাস ও বংশপরিক্রমাবিদ্যা তার পিতার কাছ থেকে শিখেছিলেন। তার কবিত্ববোধ, বাগ্মিতা এবং ব্যক্তিত্বও একই উৎস থেকে তিনি লাভ করেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সময়ের সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যও জ্ঞানের উৎস ছিলেন। একবার বিখ্যাত কবি হাসসান ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠালেন এই বলে, 'আবু বকরের কাছে যাও। তিনি তোমার চেয়ে বেশি বংশসংক্রান্ত জ্ঞান রাখেন।'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ যে জ্ঞান লাভ করেন, তা দিয়ে হাসসান ইবনে সাবিত কাফিরদের কবিতার জবাব ভালোভাবেই দিতে

---

[২৯৮] বুখারী, সহীহ, বাদুল ওহী, ১ (৩)।
[২৯৯] বুখারী, সহীহ, শাহাদাত, ১৫ (২৬৬১), মাগাযি, ৩৪ (৪১৪১)।

সক্ষম হয়েছিলেন। তার কবিতায় জ্ঞানের গভীরতা দেখে কাফেররাও বিস্মিত হয়ে যায় এবং তারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাণ্ডিত্যের প্রশংসায় বলে ওঠে, 'শুধু ইবনে আবু কুহাফার (আবু বকর) পক্ষেই এ কবিতার বিষয়বস্তু এত গভীরভাবে জানা সম্ভব। নিঃসন্দেহে এটা ইবনে আবু কুহাফার কবিতা।'[৩০০]

ঐতিহাসিক এবং আধুনিক উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার যুগে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য, যিনি তার কথায় ভবিষ্যতের অনপনেয় ছাপ রেখে দিতেন এবং ভাষার পণ্ডিত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে লালিত-পালিত আয়েশাকে এত উচ্চতায় আসীন করতে সহায়তা করে। বিখ্যাত আলেম এবং আয়েশার শিষ্য মূসা ইবনে তালহা বলেন, 'আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অপেক্ষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।'[৩০১]

আরেকজন বিখ্যাত আলেম আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন, 'আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ এ পর্যন্ত সব খলীফার খুতবা শুনেছি। তারপরেও আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মুখের চমৎকার বর্ণনা ও শক্তিশালী কথার চেয়ে ভালো কথা আর শুনিনি।'[৩০২]

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যওকানকে সাথে নিয়ে আয়েশার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যাওকান তাকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কাউকে আমি আয়েশা থেকে প্রাঞ্জলভাষী দেখিনি।'

আরবি সাহিত্যের উপর পিতার পারদর্শিতার পাশাপাশি আয়েশার অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গির পেছনে আরও কয়েকটি বিষয় জড়িত ছিল। এর মধ্যে তার

---

[৩০০] ইবনে আব্দিবার, *ইসতিয়াব*, ১:৩৪২।
[৩০১] তিরমিযি, *সুনান*, মানাকিব, ৬২ (৩৮৮৪)।
[৩০২] হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪:১২ (৬৭৩২)।

কুরআনের উপর গভীর জ্ঞান, নিয়মিত রাসূলের মুখের খুতবা শ্রবণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে আত্মস্থ করার প্রচণ্ড আগ্রহ ও ধীশক্তি এবং মৌখিক বর্ণনার প্রতি গুরুত্বারোপ, কবিত্ব ও সপ্তম শতকের আরব বেদুইনদের গল্প বলার শিল্পকে অনুসরণ। তিনি অন্যান্য দেশের মুসলিম কবিদেরও দেখা পেয়েছিলেন।

তিনি কথার শব্দ খুব সতর্কতার সাথে চয়ন করতেন এবং অন্যদের কুরআনের শব্দ ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। যখন ইয়াজিদ ইবনে বাবনুস এবং তার বন্ধুরা আয়েশার সাথে দেখা করতে এল, তখন তিনি পর্দার আড়াল থেকে তাদের সাথে কথা বলেছিলেন। ইয়াজিদ তাকে মাসিক চলাকালীন স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করেন। এ পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি অনুধাবন করলেন যে, এ অবস্থার বর্ণনায় কুরআনে এমন শব্দের ব্যবহার নেই। এজন্য তিনি তাকে সতর্ক করলেন, 'এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত যা আল্লাহ পছন্দ করেন।'

যারা কুরআনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করত, তিনি তাদের সর্বদা সতর্ক করতেন এবং কুরআন ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যস্ত হওয়া পছন্দ করতেন না। যখন মানুষ খারাপ শব্দ ব্যবহার করে কথা বলত, তখন আয়েশার সতর্কবাণী তাদের হুঁশ এনে দিত।

একদিন ইবনে আবু শাইব তার কাছে এলেন। তাকে দেখে আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনটি বিষয়ে অবশ্যই তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে, আর নতুবা তোমাকে শোনানোর জন্য আমি মৃত্যু পর্যন্ত চেষ্টা করেই যাব।'

'হে উম্মুল মুমিনীন! কোন তিনটি বিষয়? আমি অবশ্যই শুনব।'

'তুমি যখন নামায পড়বে, তখন এমন কোনো আচরণ করবে না যাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর গাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের কখনো এমন করতে দেখিনি। মানুষকে প্রতিদিন উপদেশ দেওয়ার চেয়ে সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার উপদেশ দেবে। আর যদি আরও বেশি করতে চাও তাহলে দুদিন, সর্বোচ্চ তিন দিন করতে পার। মানুষকে কুরআনের ব্যাপারে নিরাশ করো না। আমি আশা করি, তুমি লোকদের কথা বলার মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করবে

না। যদি তুমি কোনো মজমার পাশ দিয়ে যাও, তাহলে তাদের তাদের মতো থাকতে দিও। যদি তারা তোমাকে সম্মান করে এবং তোমার কাছে কিছু জানতে চায়, তখন কথা বল।'[৩০৩]

আয়েশা খুব বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার আওয়াজে কথা বলতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে কথা বলতে দেখেছেন, সেভাবেই কথা বলার চেষ্টা করতেন। তার বক্তৃতা ছিল দীপ্তিময়, বিশেষ করে যখন তিনি কোনো মাহফিলে কথা বলতেন। যখন সন্দেহ আর অবিশ্বাসে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়, তখন কাউকে না-কাউকে নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলতে হয়। এমনকি কোনো কোনো কথাকে বার বার বলার প্রয়োজন পড়ে যেন লোকেরা বুঝতে পারে। যারা দ্রুত কথা বলতেন, তিনি তাদের বিরোধিতা করতেন। তিনি বলতেন, কথা সতর্কতার সাথে বলা উচিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করতেন। আয়েশা এও বলতেন, বক্তার শব্দ শ্রোতার হৃদয়কে আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

আয়েশা রাসূলের মহানুভবতাকে ঝড়ো বাতাসের মতো বর্ণনা করতেন যা সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।[৩০৪] তার কথায় সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠত,

> নিশ্চিতভাবে বিয়ে মানে আল্লাহর দাসত্ব করা। এজন্য কার সাথে তোমার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছ, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।[৩০৫]

বক্তৃতা ও কাব্যপ্রীতি

আরবদের কাব্যপ্রীতি ছিল স্বভাবগত বিষয়; তারা নিজেদের মনোভাবকে কবিতার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে পছন্দ করত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেন যখন তার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকদিন একটানা কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। সে যুগে

---

[৩০৩] যারকাসি, *ইযাবা*, ১৭৬।
[৩০৪] বুখারী, *সহীহ*, বাদউল ওহী, ১ (৬)।
[৩০৫] সাইদ ইবনে মানসূর, *সুনান*, ১:১৯১।

বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস ছিল কবিতা; তারা কবিতায় ইতিহাস ব্যক্ত করত, নিজেদের কৃষ্টি-কালচার ফুটিয়ে তুলত এবং কবিতার আসরেই তাদের জীবন পার হতো। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মতে কবিতা দুধরনের। এক, ভালো ও সুন্দর কবিতা। দুই, খারাপ ও নষ্ট কবিতা। তিনি বলতেন, 'খারাপ ও নষ্ট কবিতা বাদ দিয়ে ভালো ও সুন্দরের তালাশ কর।' তিনি এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে সরাসরি শুনেছিলেন।[৩০৬]

একদিন শুরাইহ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসূল কি কখনো কবিতা আবৃত্তি করেছেন?'

তিনি জবাব দেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা লিখিত কবিতা রাসূল নিজে আবৃত্তি করেছেন এবং সেখান থেকে উপমা দিতে দ্বিধা করতেন না।[৩০৭]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্মৃতিশক্তি ছিল ক্যামেরার মতো। তিনি যা শুনতেন, তা কখনই ভুলে যেতেন না এবং সঠিক সময় ও স্থানে তা মনে করতে পারতেন।

কয়েক বছর পর বদরের যুদ্ধে মক্কার কুরাইশরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং তাতে তাদের অনেক বড় বড় নেতা নিহত হয় যাদেরকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বর্ণনা দেন; কুরাইশ কবিরা এ যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে আবেগঘন কবিতা রচনা করেছিল, তা তিনি মুসলমানদের কাছে বর্ণনা করেছেন।[৩০৮] একজন বৃদ্ধা মহিলা যিনি এই কবিদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে মদীনায় মসজিদে নববীতে ইসলামে দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তার প্রতি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার গভীর ভালোবাসা ছিল।[৩০৯]

---

[৩০৬] বুখারী, সহীহ, আদাবুল মুফরাদ, ১:২৯৯ (৮৬৫)।
[৩০৭] বুখারী, সহীহ, আদাবুল মুফরাদ, ১:৩০০ (৮৬৭)।
[৩০৮] বুখারী, সহীহ, মানাকিবুল আনসার, ৪৫ (৩৯২১)।
[৩০৯] বুখারী, সহীহ, সালাত, ৫৭ (৪৩৯); মানাকিবুল আনসার, ২৬ (৩৮২৫)।

আয়েশা এ রকম কিছু মহিলা কবিকে রাসূলের সামনে পেশ করেছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর অসুস্থ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমের ইবনে ফুহাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে গিয়ে তিনি তাদের মুখে আবেগজড়িত যেসব কবিতাসমূহ শুনেছিলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই সেসব কবিতা বর্ণনা করেছিলেন।[৩১০]

একদিন আয়েশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলেন। তখন তিনি জাহিলিয়্যাতের যুগের কবি আবু কবির আল-হুযালির একটি কবিতার দুটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। এ কবিতায় কবি তার ছেলের সাহসিকতার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তারপর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'যদি আবু কবির আল-হুযালি আপনাকে দেখত, তাহলে সে আপনাকেই তার কবিতার বিষয়বস্তু বানাত।'

তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কপালে চুমো খেয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে সবচেয়ে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার দিন। তুমি যেমন আমাকে খুশি করছে, আল্লাহও তোমাকে খুশি করুন।'[৩১১]

খাইবারের যুদ্ধে সা'দ ইবনে মুআয একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেটা বর্ণনা করেছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিদ্বেষ ও কুৎসা রটানোর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব ইবনে মালিক এবং হাসসান ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামরে পক্ষে কবিতার মাধ্যমে সমুচিত জবাব দিতে বলেন। যারা এ কবিতায় অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও একজন।[৩১২] মুসলমানদের বিয়ের অনুষ্ঠানে যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হতো, আয়েশা

---

[৩১০] বুখারী, *সহীহ*, ফাযায়েলুল মদীনা, ১২ (১৮৮৯); মানকিবুল আনসার, ৪৬ (৩৯২৬); মারদা, ৮, ২২ (৫৬৫৪, ৫৬৭৭)।

[৩১১] বাইহাকী, *সুনান*, ৭:৪২২ (১৫২০৪)।

[৩১২] মুসলিম, *সহীহ*, ফযায়েলুস সাহাবা, ১৫৬ (২৪৮৯, ২৪৯০)।

রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যান্য মহিলাদের সাথে তাতেও অংশগ্রহণ করতেন।[৩১৩]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কবিতা এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি এমন একজন নারী ছিলেন যার অন্তরে অনেক কবিতা জমা ছিল। সময় হলেই সেসব আবৃত্তি করতেন এবং অন্তরে প্রোথিত ঈমানের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার জন্য সেসব ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পারতেন।[৩১৪]

তিনি বলেন, 'শিশুদের কবিতা শেখাও যাতে তাদের কথা মিষ্টি হয়।'

তিনি শিশুদের কথা বলায় সাবলীলতা আনা এবং নিজকে প্রকাশ করার জন্য কবিতা শেখানো প্রয়োজন বলে মনে করতেন।[৩১৫]
এটা সত্য যে, কবিতার ভালো ও মন্দ দুদিকই আছে। মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাষা ও উপকারী শব্দাবলিতে নিজের কথাকে প্রকাশ করা। আয়েশা মনে করতেন ভাষাকে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সাপ পেটানোর মতোই ব্যবহার করা যায়, 'সবচেয়ে পাপী ঐ ব্যক্তি যে কোনো গোত্র বা জাতির প্রতি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া মন্দ কবিতা রচনা করে।'[৩১৬]

কবিতার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশও পাওয়া যায়। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, 'কথার মধ্যেই কবিতা লুকিয়ে থাকে; তার সৌন্দর্য কথার সৌন্দর্যের মতো; তার অসৌন্দর্য মন্দ কথার মতোই।'[৩১৭]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর আয়েশা খবর পেলেন যে, কিছু লোক তার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। এটা স্পষ্টতই

---

[৩১৩] বাইহাকি, *সুনান*, ৭:২৮৯ (১৪৪৬৬)।
[৩১৪] আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আরও কবিতা দেখার জন্য দেখুন বাইহাকি, সুনান, ৭:২৮৯ (১৪৪৬৬); তাবারি, *তারিখ*, ৩:৭, (৪৭); ১০:৩; ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া*, ৭ (২৪৪)।
[৩১৫] ইবনে আব্দিরাব্বিহ, *আল-ইখদুল ফরিদ*, ৫:২৩৯।
[৩১৬] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:৩০২ (৮৭৪)।
[৩১৭] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:২৯৯ (৮৬৫)।

মুনাফিকদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা ছিল। কিন্তু সত্য বলার প্রয়োজন ছিল। মিথ্যাকে বিশ্বাস করার আগেই মানুষকে সতর্ক করা প্রয়োজন। তিনি কিছু মানুষকে ডাকলেন যারা তার কথা শুনবে। তিনি সবার সামনে বিগত খলীফার অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য একটি ভাষণ দিলেন, হয়ত কোনো সত্যকে লোকেরা খেয়াল করেনি।

তিনি তার বক্তব্য শেষ করার পর লোকজনের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা বল, আমি যা বলেছি এর মধ্যে কি কোনো অসত্য বা মন্দ কিছু আছে?'

মজলিসের ভালো লোকেরা একসাথে বলে উঠল, 'না, আল্লাহর কসম, আপনি যা বলেছেন তা সবই সত্য।'[৩১৮]

উসমান হত্যার খবর শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা সত্য কি সত্য না। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তার উপর রহম করুন এবং তাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি দুনিয়ার এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। যেহেতু অতীতে তোমরা তার বিরুদ্ধাচারীদের কিছু বলনি এবং তাকে বাধা দিয়েছ, আর তোমরা তাদের কাছে নত ছিলে, আজ আবার নতুন করে ন্যায় ও সত্যের জন্য তোমাদের দাঁড়াতে হবে, তোমাদের ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। মহান আল্লাহ তোমাদের উপর একের পর এক অনুগ্রহ করেছেন, তারপরেও তোমরা দুনিয়ার মোহে জড়িয়ে আছ, তার ধর্মকে সাহায্য করতে চাও না। তোমরা ভালো করেই জান সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংস করা অনেক সহজ। ভুলে যেও না, অকৃতজ্ঞতার বদলা চাইলে অনুগ্রহের পরিবর্তে তোমরা ধ্বংস ডেকে আনবে।'[৩১৯]

আরেকদিন উসমান ইবনে হুনাইফ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? এটা কি রাসূল আপনাকে করতে বলেছেন অথবা এটা আপনার নিজস্ব মত?'

---

[৩১৮] ইবনে আব্দিরাব্বিহ, *আল-ইখদুল ফরিদ*, ২:২০৬।
[৩১৯] আবু হাইয়্যান, *ইমতা*, ৫১১; ইবনে তাইফুর, *বালাগাতুন নিসা*, ৫; বুতি, *আয়েশা*, ৮১।

তিনি জবাব দিলেন, 'মূলত উসমান হত্যার কথা শুনে আমি নিজের তাগিদেই এখানে এসেছি। উসমানকে হত্যার মাধ্যমে তোমরা একই সময় তিনটি বিষয় অমান্য করেছ এবং তিনটি অপরাধ করেছ। তোমরা পবিত্র জায়গার পবিত্রতা রক্ষায় অবহেলা করেছ, খলীফার প্রতি অসম্মান করেছ এবং পবিত্র মাসের অবমাননা করেছ।' যদিও খলীফা তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন, তবুও তোমরা তার জন্য একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে হত্যা করেছ যা তাকে দাগহীন সাদা কাপড়ের মতো আরও পবিত্র করেছে। তোমাদের অত্যাচারে তিনি দগ্ধ হয়েছেন এবং তার সাথে তোমার যা করেছ, এজন্য আমি তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। তুমি কি মনে কর যে, উসমানের বিরুদ্ধে তরবারি উঁচু করায় আমার এ ক্ষিপ্ত হওয়া ঠিক নয়?'

আয়েশার গলার আওয়ায ছিল উঁচু। তিনি জনতার শোরগোলের মধ্যে জোরে কথা বলে সবার দৃষ্টি কাড়তে পারতেন। উটের যুদ্ধে আয়েশা তার এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে প্রায়ই জনগণকে শান্ত করতে দেখা গেছে। সেরকম এক ভাষণে, যা ছিল ভাষাগত দিক দিয়েও অপূর্ব, তিনি বলেন, 'মা হিসেবে তোমাদের উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার আছে।'

তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তি। তিনি সকলের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব অনুগ্রহে ধন্য হয়েছিলেন, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ধর্মকে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে তার পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের কর্মকাণ্ডকেও তুলে ধরেন। তিনি বিনয়ের সাথে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন :

> একমাত্র খোদাদ্রোহী মানুষ ছাড়া কেউ আমার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বুকে মাথা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি তার প্রিয়তমা স্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তাআলা অন্য মানুষ থেকে আমাকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করেছেন। আমার সত্তা দ্বারা মুমিন মুনাফিকের পরিচয় নির্ণীত হয়েছে এবং আমাকে উপলক্ষ করে আল্লাহ আপনাদের জন্য তায়াম্মুমের বিধান দান করেছেন। আপনারা জানেন, আমার পিতা ছিলেন দুজনের

> একজন, আর তৃতীয়জন ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি ছিলেন চতুর্থ মুসলমান। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় এবং তার গলায় খেলাফতের মালা পরিয়ে ইন্তেকাল করেছেন। যখন ইসলামের রশি দুলতে থাকে, তখন আমার পিতাই তা শক্ত করে হাতে মুষ্ঠি করে ধরেন এবং তা শক্তিশালী করেন। কিন্তু ফিতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু লোক ঈমান আনার পরও মুরতাদ হয়ে যায়।

এ ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বসরার লোকজন দুদলে ভাগ হয়ে যায় এবং অনেকে তার বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করে। যারা এ বক্তব্য শুনেছিলেন, তারা পরবর্তীতে বলেছেন যে, তারা কখনো এমন প্রাঞ্জল ও দীপ্তিময় ভাষণ শোনেননি এবং অনেকে উসমান ইবনে হুনাইফের পক্ষ ছেড়ে আয়েশার সেনাক্যাম্পে এসে যোগ দেয়।[৩২০]

চিকিৎসাবিদ্যা

ঔষধ-পত্র ব্যবহারেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পারদর্শী ছিলেন। এমনিতে আধুনিক যুগের সাথে তখনকার চিকিৎসাবিদ্যার কোনো তুলনা চলে না। সেই যুগে বিভিন্ন গাছ-গাছালি, ফুল ও ফলের নির্যাস থেকে তৈরিকৃত ঔষধ ব্যবহৃত হতো। তবে এ জ্ঞানকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভালো দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। যারা এ জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন, তারা পরবর্তীদের শেখাতেন এবং এভাবেই সেটা যুগ যুগ চলে এসেছে।

তবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ছিল ব্যতিক্রম। তিনি ঔষধবিদ্যায় দক্ষ চিকিৎসকও ছিলেন না, আবার কোথাও নার্সিংবিদ্যাও শেখেননি। আয়েশার যুগে সবচেয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন হারিস ইবনে কালদা। তিনি 'আরবদের ডাক্তার' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩২১]

---

[৩২০] ইবনে আসাকির, *তারিখ দামেস্ক*, ৩০; ৩৯০; মুত্তাকি, *কানযুল উম্মল*, ১২:২২৪, ২২৫ (৩৫৬৩৮)।
[৩২১] বুখারী, *সহীহ*, ওয়াসায়া, ২; ফারায়েয, ৬।

মহিলারা শিশুদের রোগ-বালাই দূর করার জন্য পরিচিত ছিলেন। তখনকার সমাজের স্বাভাবিক চিত্র দেখলে বোঝা যায়, পরিবারে পুরুষ এবং নারীরা মিলেমিশে কাজ করতেন। পুরুষরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করত, আর মহিলারা আহতদের শুশ্রূষা করত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেও অনেক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে, এ রকম একজন জ্ঞানী মহীয়সী নারীর জন্য যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা করার পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা ছিল সহজ ব্যাপার।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তিনি যা দেখতেন বা শুনতেন, তা কখনো ভুলে যেতেন না এবং পরিপূর্ণভাবে কোনো কিছু না বোঝা পর্যন্ত তিনি তার প্রশ্ন বন্ধ করতেন না। তার চারিদিকে যা কিছু ঘটত, তিনি তার সবকিছুই যাচাই করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর ছিল বহুমুখী শিক্ষার কেন্দ্র। তিনি কেবল জ্ঞানকে অনুসরণ করতেন না, জ্ঞানও তার কাছে ধরা দিয়েছে। এভাবেই তিনি মেডিসিন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন।

তার কাছে যেসব তথ্য ছিল, তা লোকদের দৃষ্টি কেড়েছে। লোকেরা তাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করার জন্য আসত। অবশ্যই অনেকে, এমনকি তার অনেক নিকটাত্মীয়রা পর্যন্ত, তার মেডিসিন সম্পর্কে জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছে এবং অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছে, তিনি কীভাবে এটা অর্জন করলেন! তার বড় বোন আসমার ছেলে উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,

> হে উম্মুল মুমিনীন! আমি কখনো আপনার বুদ্ধিমত্তা, গভীর জ্ঞান, ধীশক্তি এবং স্মরণশক্তি দেখে অবাক হইনি। কারণ আমি আমাকে বলেছি, 'তিনি হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা' এবং এটাকে স্বাভাবিকই মনে করতাম। আমি কখনো আপনার কাব্যপ্রতিভা বা ইতিহাসবিদ্যায় দক্ষতা দেখে বিস্মিত হইনি এবং তা এ বলে নিজেকে বোঝাতাম, 'তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা যিনি সকলের চেয়ে সেরা জ্ঞানী এবং কুরাইশদের মধ্যে বিখ্যাত

> মনীষী। কিন্তু আপনার চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান কী করে এল, এটা আমার বুঝে আসে না। অনুগ্রহ করে আমাকে কি বলবেন আপনি কীভাবে এ জ্ঞান পেয়েছেন এবং কোথায় শিক্ষা নিয়েছেন?

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে আমার প্রিয় উরওয়া! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষজীবনে অসুস্থ থাকতেন। তার চিকিৎসার জন্য আরব ও পার্সিয়ান অনেক ডাক্তার আসতেন। তারা তার জন্য বিভিন্ন ধরনের পথ্য দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঔষধ সেবন করানো আমার দায়িত্ব ছিল এবং আমি নিজেই তা করতাম। এটাই আমার চিকিৎসা জ্ঞানের উৎস।'[৩২২]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিজের উক্তি থেকেই এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অনেকের কাছ থেকেই চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং সেগুলো প্রয়োগও করেছেন। অনেকে তার এ অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে চাইতেন এবং সুস্থ হওয়ার পর তার বিদ্যার প্রশংসা করতেন। এটা বলা সম্ভব যে, এ বিষয়টি কখনই মুখ্য ছিল না। সমাজের নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতায় তার জ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়াই ছিল মুখ্য। এ বিষয়টি উরওয়া ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তাকে মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারে এত বেশি ব্যতি-ব্যস্ত করে রাখত যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য তার কোনো সময়ই ছিল না এবং তার মৃত্যুর সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক না বলা কথা হারিয়ে যায়।[৩২৩]

---

[৩২২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৬৭ (২৪৪২৫); হাকিম, *মুসতাদরাক*, ৪:২১৮ (৭৪২৬)।
[৩২৩] যাহাবি, *সিয়ার*, ২:১৮৩।

শিষ্যবৃন্দ

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্যের কাছে তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অসম্ভব পারদর্শী ছিল। তার নিজের কোনো সন্তানাদি ছিল না। তিনি ছিলেন সবার মা। তিনি গরিব-অসহায়দের শিক্ষা দিতেন যাতে তারা সমাজে অবদান রাখতে পারে। তিনি শুধু তাদের জাগতিক প্রয়োজনই মেটাতেন না, বরং তাদের জ্ঞানের আলোয়ও উদ্ভাসিত করতেন।

ঐসময় মদীনা ছিল ইসলামের জ্ঞানের কেন্দ্র। আর আয়েশা ছিলেন এই শহরের অন্যতম ফকীহ। প্রতিনিয়ত জ্ঞানসন্ধানী মানুষ তার সাক্ষাতে আসত। যখন তিনি হজে মক্কায় গমন করতেন, তখন হিরা এবং সাবরি পাহাড়ের মাঝখানে তার জন্য বিশেষ তাঁবু স্থাপন করা হতো। মানুষ এখানে তার সাথে দেখা করতে আসত এবং জ্ঞানের আলো নিয়ে ফিরে যেতেন।[৩২৪]

শেখা এবং শেখানোর জন্য তিনি জমিনের উপর প্রচলিত সব উপায় এবং উপকরণ ব্যবহার করেছেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার অনেক মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার অন্যতম বিষয় ছিল হাদীসশাস্ত্র। তার জন্যই হাজারেরও বেশি সহীহ হাদীস আজ প্রতিটি মুসলমানের কাছে পৌঁছেছে।

তার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। গোলাম থেকে মনিব, নিকটাত্মীয় থেকে দূরবর্তী - সবাই। একটিই শর্ত ছিল, প্রত্যেকের স্বাভাবিক দ্বীনদারি থাকতে হবে। তারা তার কাছে আসত এবং তার কথা গভীর মনযোগ সহকারে শুনত। তারপর তা অন্যের কাছে প্রচারের নিয়তে বের হয়ে যেত।

---

[৩২৪] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৪০ (২৪১৭০); ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৫:৫৯৫,; ৮:৬৮।

দ্বীনি ব্যাপারে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন পথ অবলম্বন করতেন যা যে কেউ অনুসরণ করতে পারে এবং এমনভাবে প্রশ্নের জবাব দিতেন যেন তা সহজে বোঝা যায়। যখন কেউ তাকে প্রশ্ন করতে দ্বিধা বা লজ্জা পেত, তিনি তাকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রশ্ন করার মতো সহজ পরিবেশ তৈরি করতেন। এভাবে তিনি তাদের মনের গোপন রোগ বা অভিব্যক্তি জানতে সচেষ্ট হতেন যা তারা প্রকাশ করতে চাইত না।[৩২৫]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জ্ঞানের সাগরে এমন ঝড় তুলেন যার ঢেউ আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তার জ্ঞান আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেবে।

তার শিক্ষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি অনুভব হতো। তার কাছে দীক্ষা নিতে যারা আসত, তিনি তাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে কথোপকথন বর্ণনা করতেন যাতে রাসূলের বর্ণনাভঙ্গিই মূর্ত হয়ে উঠত। তিনি তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলতেন এবং তার শিষ্যদের মধ্যে যারা একবার শুনেই সব আয়ত্তে আনার চেষ্টা করত, তাদের জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তিনি তাদের বলতেন যে, রাসূল কখনো এ আচরণ করেননি।[৩২৬]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাদরাসার নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন উমর এবং তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরাইরা, আবু মূসা আল-আশারি, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং আরও অনেক পরিচিত সাহাবী যেমন আমর ইবনে আস, যায়েদ ইবনে খালিদ আল যুহানি, রাবেয়া ইবনে আমর আল যুরাইসি, শাইব ইবনে ইয়াযিদ এবং হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ।

তাবেঈনদের মধ্যে যারা তার মাদরাসায় আসতেন, তারা এ জ্ঞানের ফোয়ারা বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায়

[৩২৫] ইবনে মাযাহ, *সুনান*, তাহারা, ১১১ (৬১০); আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৯৭, ২৬৫ (২৪৬৯৯, ২৬৩৩২)।
[৩২৬] বুখারী, *সহীহ*, মানাকিব, ২০ (৩৩৭৫)।

লিপ্ত হতেন। বলা হয় যে, প্রায় দেড়শ তাবেঈন তার ক্লাশে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং তার কাছে দরস নিয়েছে। বিখ্যাত তাবেঈনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উরওয়া ইবনে যুবায়ের, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ, আলকামা ইবনে কায়িস, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, তাবুস ইবনে কাইসান, মুহমাম্মাদ ইবনে সিরিন, আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হাশিম, আতা ইবনে আবি রাবাহ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আলী ইবনে হুসাইন, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়া'মার, এবং ইবনে আবি মালাইকা। তারা এমন সব ব্যক্তিত্ব, যারা শুধু তাদের সময়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যুগের পর যুগ ধরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

আবু আমর, যাকওয়ান, নাফি, আবু ইউনুস, ইবনে ফাররুহ, আবু মুদিল্লা, আবু লুবাবা মাওরওয়ান, আবু ইয়াহইয়া এবং আবু ইউসুফ প্রমুখ আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং তারাও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার শিষ্য ছিলেন।

কেবল পুরুষরাই তার মাদরাসা থেকে উপকৃত হয়নি। এসব শিষ্যদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত অনেক মহিলাও ছিলেন। এর মধ্যে তার বোন উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর, উমরা বিনতে আব্দুর রহমান, উমরা বিনতে আয়েশা বিনতে তালহা, আসমা বিনতে আব্দুর রহমান, মুআযা আল-আদাবিয়া, আয়েশা বিনতে তালহা, জাসরা বিনতে দাযাযা, হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর, সাফিয়্যা বিনতে শাইবা, বারিরা, সায়িবা, মারযানা এবং হাসান আল-বসরীর মা, হাইরা উল্লেখ্য। প্রায় পঞ্চাশজন মহিলা তার শিষ্য ছিলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার শিষ্য হতে পারাটাই ছিল বিশেষ গৌরবের। তার নিকটজনেরা অন্যদের সাথে মিলেমিশে তার দরসে বসতেন। তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। তার ভাতিজা উরওয়া সবার দৃষ্টি কেড়েছিলেন।[৩২৭]

---

[৩২৭] ইবনে হাযার, *তাহযিবুত তাহিযিব*, ১২:৪৬৩।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের

উরওয়া ইবনে যুবায়ের শিশুকাল থেকেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সান্নিধ্য পান। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ বছর ২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্ঞান চর্চায় মেতে ওঠেন। দেখা যায় যে, তার মধ্যে জ্ঞান আহরণের পৌনঃপুনিক আগ্রহ ছিল যাতে অন্যরা তার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃত হতে পারে।

এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে, একবার তিনি তার বিশিষ্ট তিন বন্ধুর সাথে মক্কায় কাবার নিকটে হিজরের কাছে আলাপ করছিলেন। মুসআব ইবনে যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন। উরওয়া দুআ করেন,

> হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন জ্ঞান দেন যাতে আমার মৃত্যুর পরও লোকেরা আমার জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে।[৩২৮]

সম্ভবত, এ দুআর কারণে অল্প সময়েই তিনি মদীনার জ্ঞান ও মহত্ত্বের শিরোমণিদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রবীণরা সমীহ করত। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খুব কাছাকাছি থাকতেন। খুব কমই তার সান্নিধ্য থেকে দূরে ছিলেন। তার কাছ থেকে সারাক্ষণ আরও বেশি জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত থাকতেন। কাবিসা ইবনে যুআইব বলেন,

> আমাদের মধ্যে হাদীসে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী উরওয়া। কারণ আমাদের মধ্যে শুধু তিনিই কোনো সমস্যা ছাড়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে দেখা করতে পারতেন।[৩২৯]

হাদীসশাস্ত্রে অন্যতম বিশারদ ইবনে শিহাব আল-যুহরি উরওয়ার জ্ঞানকে সাগরের সাথে তুলনা করেন যার গভীরতা মাপা অসম্ভব।'[৩৩০]

---

[৩২৮] আবু নুয়িম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ১:৩০৯; ২:১৭৬; ইবনে আসকার, *তারিখ দামেস্ক*, ৪০:২৬৭।

[৩২৯] ইবনে হাযার, *তাহযিবুত তাহযিব*, ৭:১৬৫; ১২:৪৬৩।

উরওয়া নিজে বলেন, 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবনের শেষ চার-পাঁচ বছর আমি মনে করতাম, যদি আমাদের উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ইন্তেকাল করেন, তাহলে তার জ্ঞানভাণ্ডারে এমন কোনো হাদীস বাকি ছিল না যা আমি জানতাম না।'[৩৩১]

একদিন উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং তার ছেলে মুহাম্মাদ ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের সাথে দেখা করতে তার শস্যাগারে যান। যখন তারা শস্যাগারে ছিলেন, তখন সেখানকার ঘোড়াগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঘোড়ার খুরের আঘাতে মুহাম্মাদ সেখানেই ইন্তেকাল করল। উরওয়া নিজেও তার পায়ে কঠিন আঘাত পেলেন। পরবর্তীতে গ্যাংগ্রিনের জন্য এ পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। পা কাটার সময় তাকে অজ্ঞান করা হয়নি। চোখের সামনেই পা কাটার দৃশ্য দেখছিলেন এবং অতুলনীয় সবর করছিলেন। যখন সার্জারি শেষ হলো, তখন তিনি কুরআনরে একটি আয়াত পড়লেন,

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

এ সফরে আমাদের কিছু কষ্ট হয়েছে। (সূরা কাহফ, ১৮:৬২)

তাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

তার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি তার কপাল থেকে ঘাম মুছলেন এবং তার কর্তিত পা চাইলেন। সেটাকে হাতে ধরে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! যিনি তোমার সাহায্যে আমার হাঁটার তাওফীক দিয়েছিলেন, আমি কখনো কোনো গুনাহের কাজে এটা দিয়ে এক পাও অগ্রসর হইনি।'[৩৩২]
তারপর আশেপাশের লোকজন তাকে এই দুআ করতে শুনল,

> হে আল্লাহ! আমার চারটি অঙ্গ ছিল; দুটি হাত ও দুটি পা। তুমি তার একটি নিয়ে গেছ, আরও তিনটি আমার কাছেই রেখেছ।

---

[৩৩০] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৫:১৮১।
[৩৩১] ইবনে হাযার, *তাহযিবুত তাহযিব*, ৭:১৬৫।
[৩৩২] ইবনে আসকার, *তারিখ দামেস্ক*, ৬১:৪১০।

> অবশ্যই প্রতিক্ষণ তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। আমার চারটি ছেলে ছিল। তুমি তাদের একজনকে নিয়ে গেছ এবং বাকি তিনজনকে আমার কাছে রেখেছ। অবশ্যই প্রতিক্ষণ তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। তুমি যা নিয়ে গেছ তা কি চিরকালের জন্য থাকবে না?[৩৩৩]

উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর মূল পদ্ধতি, মহানুভবতা ও উদারতার দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তিনিই তার ইবাদতের দৈনন্দিন রুটিন ও অভ্যাসগত আমলের বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআন তিলাওয়াত করে রাতের পর রাত কাটাতেন, এক রাতেই এক-তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং সারারাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন। এমনকি এক পা হারানোর পরও তিনি তার ইবাদতে কোনো কমতি করেননি। শুধু এক রাত তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও নামাযের মধ্যে কাটাতে পারেননি - যে রাতে তার পা কাটা হয়েছিল - তারপরের রাতেই তিনি ইবাদতে মশগুল হয়েছেন। তিনি কখনই আত্মিকভাবে পিছিয়ে থাকতে চাইতেন না। তিনি তার পরিবারকেও সারাক্ষণ ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে বলতেন,

> যদি দুনিয়ার কোনো কিছু তোমার ভালো লাগে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে নামাযে পড়তে বলবে; তোমার উচিত আল্লাহর দিকে ফেরা। কারণ আল্লাহ তার রাসূলকে বলেছেন, 'তুমি পার্থিব জীবনের ঐ চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের (কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণিকে মজা লুটার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রবের রিযিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী। (সূরা ত্বহা, ২০:১৩১)

উরওয়ার ছেলে হিশাম পিতা সম্পর্কে বলেন, 'আমার পিতা সারাজীবনই রোযা রেখেছেন এবং তিনি তার ইন্তেকালের দিনও রোযা অবস্থায় ছিলেন।'[৩৩৪]

---

[৩৩৩] আবু নুয়িম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ২:১৭৯।
[৩৩৪] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৫:১৮০।

উরওয়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মহানুভবতাও লাভ করেছিলেন। যখন খেজুর পাকত, তিনি তখন কিছু খেজুর পেরে তার বাড়ির দেয়ালে ছড়িয়ে দিতেন। মানুষকে তার বাগানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তাদের সেখান থেকে কিছু খেজুর নিয়ে যেতে অনুরোধ করতেন। চারিদিক থেকে তার কাছে লোকজন আসত এবং কেউই খালি হাতে ফিরে যেত না। তিনি যখন তার বাগানে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন মাশাআল্লাহ (আল্লাহ কত সুন্দর সৃষ্টি করেছেন)! আর কুরআনের ঐ আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ

> তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন এ কথা কেন বললে না; আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কারও কোনো ক্ষমতা নেই। (সূরা কাহফ, ১৮:৩৯)।[৩৩৫]

নিচের উক্তি থেকে তার জ্ঞানের গভীরতা বোঝা যায় যা অনেক অর্থবহ,

> যখন কেউ ভালো কাজ করে, মনে রেখ ঐ লোকের কাছে এই ভালো কাজের সাথি আছে। একইভাবে যখন কেউ মন্দ কাজ করে, তখনো তার কাছে মন্দ কর্মের সাথিও থাকে। এভাবে একটি ভালো কাজ অনেক ভালো কাজের কারণ হয়, তেমনি একটি মন্দ কাজ আরও মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইসলামের আরও অনেক বিখ্যাত ফকীহ এ বছর ইন্তেকাল করেন। এজন্য এ বছরকে 'সানাতুল ফুক্বাহ' (ফকীহর বছর) বলা হয়।[৩৩৬]

---

[৩৩৫] আবু নুয়িম, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ২:১৮০।
[৩৩৬] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৫:১৮১।

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ

পিতা শাহাদাতবরণ করার পর কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ আয়েশার স্নেহেই বেড়ে ওঠেন এবং তার কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। আয়েশা তার পুরো দায়িত্ব নেন এবং তাকে ইলমে দীক্ষিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এমনকি আয়েশা নিজেই তার মাথার চুল ছেঁটে দিতেন এবং বিভিন্ন আনন্দ-উৎসবে ভালো কাপড় পরিয়ে দিতেন।

কাসিমের জন্য আয়েশা যা সবচেয়ে বেশি রেখে যান, তা হচ্ছে তার জ্ঞান। প্রসিদ্ধ আছে যে, কাসিম, উরওয়া এবং উমরা - তিনজন আয়েশার কাছ থেকেই হাদীসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[৩৩৭] তিনি খুব বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মনে করা অপছন্দ করতেন এবং তিনি অন্যদের তুলনায় নিজেকে কখনো শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না।

একবার বাদিয়া থেকে কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করে যে, বিখ্যাত ফকীহ সালিমের চেয়ে তিনি বেশি জ্ঞানী কি না।

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ চিন্তা করলেন যে, সালিমকে মিথ্যা প্রশংসা করে উপরে উঠানো যেমন ঠিক নয়, তেমনি আত্মপ্রশংসারও অবকাশ নেই। এজন্য লোকটিকে তিনি একই প্রশ্ন সালিমকে করতে বললেন।[৩৩৮]

উরওয়ার মতোই কাসিম অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন। কখনো কারও কাছে কিছু চাননি। আত্মমর্যাদা এবং বিবেকে আঘাত লাগে এমন কোনো ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হননি। একবার উমর ইবনে উবাইদুল্লাহ তাকে এক হাজার দিনার পাঠান। কিন্তু তিনি তা সবই ফেরত দিয়ে দেন। কেউ কেউ তাকে ন্যূনতম একশ দিনার রেখে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু তিনি তার মত পরিবর্তন করেননি। কাসিম সদকার কোনো অংশ খেতেন না।

---

[৩৩৭] ইবনে হাযার, *তাহযিবুত তাহযিব*, ৮:৩০০।
[৩৩৮] প্রাগুক্ত।

ঐ যুগের খলীফা ছিলেন উমর ইবনে আব্দুল আজীজ কাসিম ইবনে মুহাম্মাদকে খুব সম্মান করতেন এবং এবং সারাজীবন একইভাবে আচরণ করেছেন। এমনকি তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাসিমের নাম ঘোষণা করেন এবং জনসম্মুখে তা বলতেও দ্বিধা করেননি।[৩৩৯]

যখন তিনি কিছু লোককে আখেরাত সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করতে শুনলেন, তখন বললেন, 'যে বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিস্তারিত কিছু বলেননি, সে বিষয়ে অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে কথা বলা উচিত।'

তিনি তার আগে যারা বেঁচে ছিলেন, বিশেষ করে সাহাবীরা, তাদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল, সেগুলোকে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বড় ধরনের আশির্বাদ মনে করতেন।[৩৪০] সত্তর বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ইন্তেকালের আগে তিনি নিজের ছেলেকে কাছে ডেকে নেন এবং তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, 'আমি যে কাপড়ে নামায পড়তাম এবং আমার এ পায়জামা-পাঞ্জাবি, ইযার ও রিদা, কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করবে।'

তার ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমার পিতা! আপনার জন্য দুটি নতুন কাফনের কাপড় কিনলে কেমন হয়?'

তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো, যাকে তিনি নিজের জন্য আদর্শ মনে করতেন, একই জবাব দিলেন,

> হে আমার প্রিয় ছেলে! আবু বকর তিন কাপড়ে এ দুনিয়া ছেড়ে গিয়েছেন। ভুলে যেও না জীবিতদের জন্যই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন।[৩৪১]

---

[৩৩৯] যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, ১:৯৭।
[৩৪০] ইবনে সা'দ. *তাবাকাত*, ৫:১৮৮-১৮৯।
[৩৪১] ইযার হচ্ছে এমন পোশাক যা দিয়ে কোমরের নিচের অংশ ঢাকা হয় এবং রিদা মানে যা শরীরের উপরের অংশে পরা হয়।

উমরা বিনতে আব্দুর রহমান

বনু নাযির গোত্রের বিখ্যাত আনসার সাহাবী আসআদ ইবনে যুরারা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বোন ছিলেন উমরা বিনতে আব্দুর রহমান। সা'দ ইবনে যুরারা তার দাদা ছিলেন। মায়ের দিক দিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় ছিলেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উমরা এবং তার ভাইকে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তাদের হাদীসের বিখ্যাত আলেম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যেসব শিশুদের মধ্যে মেধার ছাপ লক্ষ করতেন, তাদের দীক্ষা দিয়ে রাসূলের কথাগুলোকে (যা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিখেছিলেন) প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন।

ভাইয়ের মতো উমরাও আয়েশার এ ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজেকে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমের কাতারে শামিল করেন। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ইবনে আল-মাদানি বলেন, 'আয়েশার হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ছিলেন উমরা। তিনি এ বিষয়টি বুঝতেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে বেশি বেশি জ্ঞান আহরণের জন্য অবিশ্বাস্য চেষ্টা-সাধনা করতেন।'

ইবনে হিব্বান বলেন, 'আয়েশার হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন উমরা।'

সুফইয়ান সাওরী তাকে 'আয়েশার হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক বিজ্ঞ' বলে সম্বোধন করতেন।[৩৪২]

উমরাকে মানুষ খুব ভালোবাসত। যারা আয়েশার জ্ঞানের প্রতি আসক্ত ছিল, তার উমরার জ্ঞানের প্রতিও সমান আকৃষ্ট ছিল। তারা তাদের এ ভালোবাসাকে হাদিয়া-তোহফা দিয়ে প্রকাশ করত। তিনি আয়েশার কাছ

---

[৩৪২] ইবনে হিব্বান, *সিককাত*, ৫:২৮৮ (৪৮৮১)।

থেকে যেমন শিখেছিলেন, এ হাদিয়া গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং তিনিও কোনো হাদিয়াদানকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি।[৩৪৩]

একদিন কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইমাম যুহরীকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাকে শেখার জন্য উদগ্রীব দেখা যায়। আমি কি আপনাকে একটি জ্ঞানের ভাণ্ডারের সন্ধান দেব?'

'অবশ্যই।'

'আপনার সরাসরি উমরা বিনতে আব্দুর রহমানের কাছে যাওয়া উচিত কারণ তাকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শিক্ষা দিয়েছিলেন।'

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের কথা অনুযায়ী ইমাম যুহরী উমরা বিনতে আব্দুর রহমানের কাছে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, 'আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি যে, তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর যার তলা স্পর্শ করা অসম্ভব।'[৩৪৪]

ঐ যুগে মানুষ ইলম অর্জনের জন্য যত চেষ্টা-সাধনা করত, উমরা তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি এ পৃথিবীতে প্রথম চোখ খুলেছেন, তখনই তার পাশে পেয়েছেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে। শিশুকাল থেকেই তিনি আয়েশার তথ্যভাণ্ডারে বেড়ে উঠেছেন। উমরা সেই সৌভাগ্যবতীদের অন্যতম যিনি জ্ঞান অন্বেষণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে হাদীস এবং ফিকহীশাস্ত্রে তার জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পাশাপাশি রাফি ইবনে হাদিয, উবায়েদ ইবনে রিফাআ, মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম, হাবিবা বিনতে সাহল, হামনা বিনতে জাহশ, উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা এবং উম্মে সালামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[৩৪৩] বুখারী, *সহীহ*, আদাবুল মুফরাদ, ১:৩৮২ (১১১৮)।
[৩৪৪] যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১:১১২; আ'লাম, ৪:৫০৮, ৫:৩৪৭।

সঠিক তথ্যনির্ভর জ্ঞান অন্বেষণের সোনালি যুগে মানুষ তার কাছে আসত। তিনি তার বাড়িকে জ্ঞানচর্চার মাদারাসায় পরিণত করেছিলেন এবং অনেককে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তার বিশিষ্ট কিছু ছাত্রের মধ্যে হারিসা ইবনে আবি রিযাল, রুযাইক ইবনে হাকিম, সা'দ ইবনে সাইদ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আব্দিরাব্বিহ ইবনে সাইদ, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আমর ইবনে দিনার, মালিক ইবনে আবি রিযাল, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর, মুহমাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, ইবনে শিহাব আল-যুহরি, ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ, ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ, রাইতা আল-মুযানি, ফাতিমা বিনতে মুনযির উল্লেখ্য।

তিনি ৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে তৎকালীন ফকীহদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তিনি যেসব শিষ্যদের রেখে গিয়েছিলেন, তারা বেদনায় মুষড়ে পড়ে। উমাইদ বংশের খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজীজ, যিনি তাকে বিশেষভাবে সম্মান করতেন এবং যে কোনো জটিল বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন, বলেন, 'উমরার ইন্তেকালের পর আয়েশার হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী আর কোনো ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই।'

তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার রেখে যাওয়া হাদীসসমূহ অনুসন্ধান করার জন্য একটি পর্ষদ গঠন করে দায়িত্ব দেন।[৩৪৫]

---

৩৪৫ ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৪৮০, সিয়ার, ৪:৫০৭-৫০৮।

মুয়াযা আল-আদাবিয়্যা

মুয়াযা আল-আদাবিয়্যার ডাকনাম ছিল উম্মে শাহবা। এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সিলা ইবনে আশইয়ামের বিধবা স্ত্রী। সিলা ইবনে আশইয়ামকে কাবিলের কাছে এক যুদ্ধক্ষেত্রে তার ছেলে শাহবাসহ হত্যা করা হয়েছিল। আয়েশার কাছে জ্ঞান ও চরিত্রের দীক্ষা নেওয়া মুয়াযার মনোবল এত দৃঢ়চেতা ছিল যে, স্বামী এবং ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে যারা তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

'তোমারা যদি আমাকে স্বাগত জানাতে আস, তাহলে আস। আর যদি তোমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে না আসাই ভালো।'

স্বামীর মৃত্যুর পর এ মহীয়সী নারী সারারাত ইবাদতে কাটাতেন। যুগের অন্যতম ধার্মিক হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। মুয়াযা যিনি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ইবাদতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন একদিন তার নিকটস্থ লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

> আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এ দুনিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসা পার্থিব উন্নতি বা আরাম-আয়েশের জন্য না। আল্লাহর কসম, আমি এ দুনিয়াকে ভালোবাসি এখানে থাকতেই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। এভাবে আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে আমার স্বামী এবং ছেলের সাথে বেহেশতে দেখা করার সৌভাগ্য দেবেন।[৩৪৬]

তিনি রাতের শুরু থেকে সকাল অবধি ইবাদত করতেন। যখন তার ঘুম বা আলস্য অনুভব হতো, তখন তিনি একটি পায়চারি করতেন। আর নিজেকে বলতেন, 'হে আমার নফস! ঘুমে তুমি এখন কাতর। যদি তুমি সত্যিই ঘুমাতে চাও, তাহলে জেনে রাখ, কবরে একটি দীর্ঘ সময়

---

[৩৪৬] ইবনুল জাওযি, *সিফাতুস সাফওয়া*, ৪:২৩।

তোমাকে ঘুমিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু একটি পার্থক্য আছে, এই ঘুম হয় তোমাকে অনুতাপে ভোগাবে অথবা অনুগ্রহে খুশি করবে।'[৩৪৭]

যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিল, তখন সবাই দেখল যে, তিনি খুব কাঁদছেন এবং তারপর হঠাৎ আবার হাসলেন। তারা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেন কাঁদলেন, আবার হাসলেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমার অসুস্থতা আমাকে রোযা, নামায এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখবে। এজন্য আমি দুঃখ পেয়ে কেঁদেছি। তারপর আবু শাহবা একদল লোকের সাথে দুটি সবুজ কাপড়সহ একটি বাগানে এলেন। আল্লাহর কসম! এত সুন্দর বাগান আমি এ পৃথিবীতে কখনো দেখিনি। এজন্য আমি হেসেছি। আমার মনে হয় না যে, আর এক ওয়াক্ত নামাযের সময় এখানে আমি পাব!'

তিনি যা বলেছিলেন, তা-ই হয়েছিল। পরের ওয়াক্ত নামাযের সময় হওয়ার আগে ঐ দিনই তিনি ৮৩ হিজরীতে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[৩৪৮]

---

৩৪৭ প্রাগুক্ত, ৪:২২।
৩৪৮ প্রাগুক্ত।

আয়েশা রা.-এর বিয়ের সময় বয়স কত ছিল

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার সময় তার বয়স কত ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে এটি একটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বাল্যবিবাহকে একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ের সময় আয়েশা বিনতে আবু বকরের বয়স ছিল ৬ এবং পরবর্তীতে মদীনায় ৯ বছর বয়সে তিনি রাসূলের ঘরে ওঠেন।[৩৪৯] এটাই সাধারণভাবে সর্বজনগৃহীত মত। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ বয়সে বিয়ে করা তখনকার সমাজে খুবই প্রচলিত একটি বিষয় ছিল এবং তখন শিশুরা একটু আগেই বেড়ে উঠত। এ কারণে বিষয়টি ইসলামের প্রাথমিক যুগে এত আলোচ্য বিষয় ছিল না।

অরিয়েন্টালিস্টরা, যারা ইসলামকে বাহ্যিকভাবে বিবেচনা করে এবং ঘটনার সময়কার সামাজিক অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামায় না, এটাকে একটি বড় ইস্যুতে পরিণত করেছে। আর এতে মুসলমানরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। অনেকে পূর্বে উল্লেখিত বিয়ের বয়সকে যথার্থ মনে করে, আবার অনেকে তার তখন বয়স আরও বেশি ছিল বলে মতপ্রকাশ করে। এ পরিস্থিতিতে, যেখানে সব সময় ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুশকিল, অরিয়েন্টালিস্টদের জবাব দেওয়ার জন্য অনেকগুলো সুযোগ রয়েছে।

---

[৩৪৯] বুখারী, *সহীহ*, মানাকিবুল আনসার, ২০, ৪৪; মুসলিম, *সহীহ*, নিকাহ, ৭১।

এমনকি তাদের মতামতেরও জবাব দেওয়া যেতে পারে যারা হাদীসের বর্ণনাকে অস্বীকার করে অথবা ভিন্নমতের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে। প্রথমত, সবাই তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একসময় শিশু থাকে। এজন্য এ ব্যাপারে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি সমাজেরই বিশেষ কিছু প্রথা থাকে এবং যখন একটি নির্দিষ্ট সমাজকে বিবেচনা করার দরকার হয়, তখন এসব প্রথাগুলোও বিবেচনা করতে হয়। আর নতুবা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এটা জানা সত্য যে, রাসূলের যুগে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত ছিল।[৩৫০] বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়সের পার্থক্যও কোনো আলোচ্য বিষয় ছিল না।[৩৫১] বিশেষ করে মেয়েশিশুরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে আগেই বালেগ হয়ে যেত এবং স্বামীর গৃহে তারা যথেষ্ট দক্ষতারও পরিচয় দিত। অধিকন্তু এটা শুধু মেয়েদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল না। তখনকার সমাজে ছেলেরাও ৮-১০ বছর বয়সে বিয়ে করত এবং এ বয়সেই তারা পরিবারের কর্তা বনে যেত যা আজকের সমাজে অবিশ্বাস্য মনে হয়।[৩৫২] মনে রাখতে হবে যে, এখন মানুষ যেভাবে পারে, সেভাবেই রাসূলকে অবমাননা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, হয় এটা যায়নাব বিনতে জাহশের সাথে বিয়ের ব্যাপার হোক অথবা মৌরুসি অভিযানে আয়েশার অপবাদের ব্যাপার হোক। এ ধরনের লোক দ্বারা যদি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত না হতো, তাহলে হয়ত এটা ঐতিহাসিকভাবে সাধারণ বিষয় হিসেবেই থেকে যেত।

---

[৩৫০] রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব হালা বিনতে উহাইবকে বিয়ে করেন। তখন হালা বিনতে উহাইবের বয়স ছিল খুব কম। একই সময় তিনি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে আমিনার সাথে বিয়ে দেন। এজন্য চাচা হামযা রা. এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়সের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। তারা প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

[৩৫১] রাসূল সা. এর সাথে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আরও ঘনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য উমর ইবনে খাত্তাব আলী রা. এর মেয়ে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। আর তখন এ রকম অসম বয়সে বিয়েতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

[৩৫২] আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বয়সে তার ছেলে আব্দুল্লাহর চেয়ে মাত্র দশ বছরের বড় ছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মাত্র দশ বছর বয়সেই বিয়ে করেছিলেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইবনে আসির, *উসদুল গাবা*, ৩:২৪০।

কুরআনের আয়াতেও বিয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তা বালেগ হওয়ার পর সম্পন্ন করার বিধান দেওয়া হয়েছে।[৩৫৩] ঐশী নির্দেশকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। উমর রা. এর মতে, যদি এখানে কোনো ব্যতিক্রমের অনুমতি থাকত, তাহলে হয়ত অন্য কোনো আয়াতে তা রহিত করা হতো। যা হোক, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে ঐশী নির্দেশেই সম্পন্ন হয়েছিল।[৩৫৪]

যে কোনো প্রান্তিকতাকে পাশ কাটিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের বয়স সম্পর্কে বর্ণনা ও পারস্পরিক ঘটনাসমূহ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করলে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ পাওয়া যায় ঃ

১। ইসলামের প্রথম দিকের মুসলমানদের তালিকা বর্ণনা করার সময় সাবিকুন আল-আওওয়াম (প্রথম পর্যায়ের মুসলমানগণ) যেমন উসমান ইবনে আফফান, যুবায়ের ইবনে আওওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, আরকাম ইবনে আবিল আরকাম এবং উসমান ইবনে মাদউন এর তালিকার পরপরই বড় বোন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার নামের সঙ্গেই আয়েশার নাম বর্ণিত হয়। আঠারোতম মুসলমান হিসেবে আয়েশার নাম উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালিত ইবনে আমর, জাফর ইবনে আবি তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ, আবু হুযাইফা, শুহাইব ইবনে সিনান, আম্মার ইবনে ইয়াসির, উমর ইবনে খাত্তাব, হামযা ইবনে আব্দিল মুত্তালিব, হাব্বাব ইবনে আরাত, সাইদ ইবনে যাইদ এবং ফাতিমা বিনতে খাত্তাব এর আগে উল্লেখিত হয়েছে।[৩৫৫]

এ থেকে বোঝা যায়, তিনি ইসলামের শুরুর দিকেই দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন এবং এ রকম ইচ্ছা পোষণ ও তা বাস্তবায়নের মতো পরিপক্ব

---

[৩৫৩] সূরা নিসা ৪:৬।

[৩৫৪] বুখারী, *সহীহ*, তা'বীর, ২১, মানাকিবুল আনসার, ৪৪, নিকাহ, ৯; মুসলিম, *সহীহ*, ফাযায়েলুস সাহাবা, ৭৯; ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬:৪১, ১২৮।

[৩৫৫] ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ১:২৭১; ইবনে ইসহাক, *সিরাহ*, কনইয়া, ১৯৮১, ১২৪।

বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। এসব বর্ণনায় 'তিনি তখন ছোট ছিলেন' বলে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে প্রতীয়মান হয়, তার নাম সচেতনভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৫৬]

এ থেকে ইসলামের শুরু দিকের সময়ই বোঝা যায়। এটা জানা যায় যে, আয়েশার বড় বোন আসমা বিনতে আবু বকর ৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ১৫। এ থেকে বোঝা যায়, ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাসূল ওহী পাওয়া শুরু করেন এবং আয়েশার বয়স তখন ন্যূনতম ৫, ৬ অথবা ৭ ছিল এবং মদীনায় রাসূলের ঘরে রুখসতে যাওয়ার সময় তার বয়স ন্যূনতম ১৭ বা ১৮ ছিল।

২। মক্কার দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আয়েশা রা. বলেন, 'যখন কুরআন শরীফের এ আয়াত নাযিল হয়, 'বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর'[৩৫৭] - তখন আমি খেলছিলাম।'[৩৫৮] এ তথ্য তার বয়স সম্পর্কে আলোচনার নতুন দুয়ার খুলে দেয়।

এ আয়াতটি সূরা কমারের ৪৬ নম্বর আয়াত। এ সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজেযা বর্ণিত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বর্ণনা বিচার-বিশ্লেষণ করে এ মত পোষণ করেন যে, নবুওতের চতুর্থ বছর (৬১৪)[৩৫৯], অথবা অষ্টম বছর (৬১৮) অথবা নবম বছর (৬১৯)[৩৬০] দ্বারে আরকামে অবস্থানের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এ সূরাটি নাযিল হয়। ঘটনার পরম্পরা রক্ষার তাগিদে অনেক অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ৬১৪ সালকেই যথার্থ মনে করেন। যদি এ বছরকে ধরা হয়, তাহলে বলতে হবে হয়ত আয়েশার

---

[৩৫৬] ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ১:১৭১; ১২৪।
[৩৫৭] সূরা আল-কামার ৫৪:৪৬।
[৩৫৮] বুখারী, *সহীহ*, ফাযায়েলুল কুরআন, ৬; তাফসিরুস সূরা, (৫৪) ৬; আইনি, বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবনে আহমাদ, উমদাতুল কারী শরহ সহীহ বুখারী, ২০:২১; আসকালানি, ফতহুল *বারি*, ১১:২৯১।
[৩৫৯] সুয়ূতি, *ইতকান*, বৈরুত, ১৯৮৭, ১:২৯, ৫০; দগরুল, *আসরি সাদাত*, ২:১৪৮।
[৩৬০] মাস গণনায় পাথর্ক্যের কারণে চান্দ্র বছরের হিসেবে গড়মিল হতে পারে।

তখন জন্মই হয়নি অথবা কেবল জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি ৬১৪ সাল গ্রহণযোগ্য বছর হয়ে থাকে, তাহলে দেখা যায় ঐ বছরের কমপক্ষে আট-নয় বছর আগে তার জন্ম হয়েছে। আর যদি ৬১৮ অথবা ৬১৯ সালকেও ধরা হয়, তাতে পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। যে বছরই ধরা হোক, যদি তখন তার বয়স চার অথবা পাঁচেরও কম হয়ে থাকে, তাহলে সে বয়সে এ ঘটনাকে আয়ত্তে আনা এবং পরবর্তীতে তা বর্ণনা করা অসম্ভব মনে হয়।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে বলা যায় যে, আয়েশা সম্ভবত নবুওতের শুরুর বছরই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৩৬১]

আরেকটি বিষয় এখানে বর্ণনা করা অযৌক্তিক হবে না যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঐ দিনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি তখন খেলছিলাম।' এখানে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য যে শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে জারিয়া (جَارِيَةٌ)। এ শব্দটি আরবীতে 'বালেগা হওয়ার পথে' বোঝায়। যদি এ বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয় এবং ৬১৪ সালকে সূরা কমার নাযিল হওয়ার সময় ধরা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে নবুওতের কমপক্ষে আট বছর আগে তার জন্ম হয়েছিল অথবা ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে। আর যদি ৬১৮ সালকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে তার জন্মের বছর হয় ৬১০; এ ঘটনাটি থেকে তার রোখসতের বয়স ৯ হওয়া অসম্ভব মনে হয়।

যখন এসব তথ্য-উপাত্তকে একত্রীকরণ করা হয় এবং প্রথম সারির মুসলমানদের সাথে তার নাম উচ্চারিত হয়, তখন সহজেই অনুমেয় যে, তার জন্ম হয়েছিল ৬০৬ সালে। সুতরাং এ হিসেবে তার ১৭ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

৩। অধিকন্তু এই একটি ঘটনাতেই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মক্কার স্মৃতি সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে আরও কিছু ঘটনা বিষয়টিকে নিশ্চিত করে :

---

[৩৬১] এ হিসেবে অনেক মনে করেন যে, বিয়ের সময় আয়েশার বয়স ছিল ১৪ অথবা ২২, এমনকি ২৮। এসব বর্ণনা দুর্বল হওয়াতে তা এখানে আলোচনা করা হল না।

ক। তিনি দুজন লোককে ভিক্ষা করতে দেখেছেন যারা হাতির বছরের সাক্ষী ছিলেন। রাসূলের নবুওতের ৪০ বছর আগে হাতির বছরের ঘটনা ঘটেছিল এবং ঘটনাটি ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার তারিখ নির্ণয়ে মাইলস্টোন হিসেবে গণ্য হতো। তিনি এ তথ্য কেবল তার বোন আসমাকেই জানিয়েছিলেন।[৩৬২]

খ। তিনি বর্ণনা করেছেন, মক্কায় মুসলমানদের কঠিন সময়ে রাসূল তাদের বাড়িতে সকালে অথবা বিকেলে প্রতিদিন আসতেন এবং তার পিতা এ কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।[৩৬৩]

গ। তিনি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ যখন নামায ফরয করেছিলেন, তখন দুরাকাত ফরয করেছিলেন। এরপর মুকিমের নামায পুরা করেন (চার রাক'আত), কিন্তু সফরের নামায প্রথম অবস্থায় রাখা হয় (দুরাকাত)।[৩৬৪]

ঘ। মক্কার প্রথম দিকের স্মৃতি বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা শুনেছি, ইসাফ এবং নাইলা কাবা শরীফে অপরাধ করেছে এবং এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের পাথরের মূর্তিতে পরিণত করে দিয়েছিলেন। তারা দেখতে জুহরুম গোত্রের পুরুষ ও নারীর মতো ছিল।'

৪। বিয়ের আগে বাগদান : আরেকটি কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ের সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স বেশি থাকার বিষয়টি বহুলভাবে আলোচিত। বিয়ের আগে যুবায়ের ইবনে মুতইম আবনে আদির সাথে তার বাগদান হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবটি উসমান ইবনে মাদউনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিমের মাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের কোনো সদস্যা

---

[৩৬২] ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ১:১৭৬; ইবনে কাসির, *তাফসীর*, ৪:৫৫৩; *আল-বিদায়া*, ২:২১৪; কুরতুবি, *তাফসীর*, ২০:১৯৫।

[৩৬৩] বুখারী, *সহীহ*, সালাত, ৭০, কাফেলা, ৫, মানাকিবুল আনসার, ৪৫, আদব, ৬৪; ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬:১৯৮।

[৩৬৪] মুসলিম, *সহীহ*, ৩:৪৬৩; *মুযামুল কাবির*, ২:২৮৫; *মুযামুল আওসাত*, ১২:১৪৫; ইবনে হিশাম, *সিরাহ*, ১:২৪৩।

ছিলেন না। এ পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের বয়সে উপনীত হয়েছিলেন এবং বিষয়টি সমাজের অন্যান্য লোকেরাও জানত।

এটা জানা কথা যে, ইবনে আদির পরিবারই এ বাগদানকে পরবর্তীতে ছেলেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে ভেবে বাতিল করেছিলেন এবং তারপরই কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং হয় এ বাগদান রাসূলের নবুওতের আগেই হয়েছিল অথবা ইসলাম প্রকাশ্যে প্রচার শুরু হওয়ার পর সম্পন্ন হয়েছিল (নবুওতের তিন বছর পর)। যদি এটা নবুওতের আগে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্ম ধারণার আরও আগে হয়েছিল। এজন্য অনেকে বলে থাকে, তার বয়স তখন ১৩ অথবা ১৪ ছিল।

এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সিদ্ধান্ত তখনই নেওয়া হয়েছিল যখন ইসলামের দাওয়াতের কাজ প্রকাশ্যভাবে শুরু হয়েছিল। এ দিক দিয়ে এটা ছিল ৬১৩-৬১৪ সাল। যদি মনে করা হয় যে, আয়েশা রা. নবুওতের চার বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাহলে এটা স্বীকার করতে হবে যে, তখনো তার জন্ম হয়নি। আর যদি তার জন্মই না হয়ে থাকে, তাহলে তার বাগদানের প্রশ্নই আসে না। এজন্য এটা সহজেই অনুমেয় যে, বাগদান বাতিল হওয়ার সময় তার বয়স ৭ বা ৮ হয়ে থাকবে। এ হিসেবে সম্ভবত ৬০৫ সালে তার জন্ম হয়েছিল।[৩৬৫]

এখানে আরেকটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যায়। হতে পারে আয়েশা রা. এর জন্মের পরপরই দুপক্ষের অভিভাবকের মধ্যে কথা-বার্তা চূড়ান্ত (বাগদান) হয়েছিল এবং বালেগ হওয়ার পর তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য জানা যায় না।

৫। আয়েশা রা. এর ভাই-বোনদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা স্বীকৃত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছয়জন ছেলে-মেয়ে ছিল। কুতাইলা বিনতে উমায়েসের গর্ভে আসমা এবং

---

[৩৬৫] বেরকি, *আলী হিকমাত*, ওসমান এসকিওগুলু, *হাতেমুল হযরত মুহাম্মাদ ভি হায়াত*, ২১০।

আব্দুল্লাহ, উম্মে রুমানের গর্ভে আয়েশা এবং আব্দুর রহমান, আসমা বিনতে উমাইসের গর্ভে মুহাম্মাদ এবং হাবিবা বিনতে হারিযার গর্ভে উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। আসমা এবং আব্দুল্লাহ একই মায়ের সন্তান। আয়েশা এবং আব্দুর রহমানও একই মায়ের সন্তান। একই মায়ের সন্তানদের বয়সের পার্থক্য বিবেচনা করলে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়সের ব্যাপারে কিছু চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়।

ক। আবু বকর রা. এর কন্যাসন্তান আসমার জন্ম হয় ৫৯৫ সালে, হিজরতের ২৭ বছর আগে।[৩৬৬] হিজরতের সময় তিনি যুবায়ের রা. এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।[৩৬৭] তার ছেলে আব্দুল্লাহ তিন মাস পরে কুবাতে জন্মগ্রহণ করে। এ সময় আসমা মদীনায় হিজরত করছিলেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে ১০০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; তার সব দাঁত তখনো ভালো ছিল।

এখানে আরেকটি জটিল তথ্য লুকিয়ে আছে। আসমা এবং আয়েশার বয়সের পার্থক্য ছিল ১০ বছর।[৩৬৮] এ হিসেবে আয়েশার জন্মের বছর হয় ৬০৫ (৫৯৫+১০=৬০৫) এবং হিজরতের সময় আয়েশার বয়স ছিল ১৭ (২৭-১০=১৭)। যেহেতু তার রোখসত হয়েছিল হিজরতের ৬, ৭ অথবা ৮ মাস পর অথবা বদর যুদ্ধের পরপর[৩৬৯], তার মানে তখন তার বয়স ছিল ১৭ অথবা ১৮ বছর।

খ। আয়েশা এবং আব্দুর রহমানের বয়সের পার্থক্যও খুব অবাক করার মতো। আব্দুররহমান হুদাইবিয়াার সন্ধির পর মুসলমান হন, হিজরতের ছয় বছর পর। তিনি তার পিতার সাথে বদরের যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়াকে এড়িয়ে গেছেন। এটা হিজরতের দ্বিতীয় বছরের ঘটনা। আর

---

[৩৬৬] নববী, *তাহযিব আল-আসমা*, ২:৫৯৭।

[৩৬৭] প্রাগুক্ত।

[৩৬৮] বাইহাকি, *সুনান*, ৬:২০৪, ইবনে মান্দা, *মারিফাতুস সাহাবা*, নং ২৪২, পৃ. ১৯৫; ইবনে আসকির, *তারিখ দামেস্ক*, তারাযিমুন নিসা, দামেস্ক, পৃ. ৯-১০, ২৮, ১৯৮২; ইবনে সা'দ, *তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরুত, ৮:৫৯, ১৯৬৮।

[৩৬৯] ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৫৮; ইবনে আব্দিল বার, *ইসতিয়াব*, ৪:১৮৮১; সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, সিরাতুস সাইয়্যিদাতি আয়েশা, মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ হাফিয আল-নদভী কর্তৃক আলোচনা, দারুল কালাম, দামেস্ক, ৪০, ৪৯, ২০০৩।

এ সময় আব্দুর রহমানের বয়স ছিল ২০।[৩৭০] অন্য কথায় তিনি নিশ্চয়ই ৬০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদিক দিয়ে আয়েশার জন্ম আরও ১০ বছর পর ৬১৪ সালে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বিষয়টাকে অন্যভাবেও বলা যায় যে, যখন ভাই-বোনদের বয়সের পার্থক্য সাধারণত ১ বা ২ বছরের বেশি হতো না, সেখানে দশ বছরের পার্থক্য হওয়া বিস্ময়কর বটে।

৬। আয়েশার মৃত্যুর তারিখও বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য যথেষ্ট হতো। তার মৃত্যুর বছর হিসেবে ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরী বলা হয়[৩৭১] এবং তখন তার বয়স ছিল ৬৫, ৬৬, ৬৭ অথবা ৭৪।[৩৭২] আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তার জন্মের তারিখের ব্যাপারে যেমন কোনো ঐক্যমত নেই, তেমনি তার মৃত্যুর তারিখের ব্যাপারেও নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই।

তবে একটি বর্ণনা প্রসিদ্ধ। এ বর্ণনামতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং মৃত্যুকালীন তার বয়স ছিল ৭৪। এটা প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এ বর্ণনায় তার মৃত্যুকালীন অবস্থার একটু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেমন, তিনি বুধবার ইন্তেকাল করেছিলেন। সেদিন ছিল সতেরো রমাযান। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে রাতে বেতের নামযের পর জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিল। তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে তার বোন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহার দুই ছেলে আব্দুল্লাহ এবং উরওয়া, তার ভাই মুহাম্মাদের দুই ছেলে কাসিম এবং আব্দুল্লাহ কবরে নামিয়েছিলেন।[৩৭৩] এ বর্ণনামতে আমরা দেখি যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে ৪৮ বছর বেঁচে ছিলেন (৪৮+১০=৫৮+১৩=৭১+৩=৭৪)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি রাসূলের নবুওতের তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রোখসতের সময় তার বয়স হয়েছির ১৭ (৭৪-৪৮=২৬-৯=১৭)।

---

৩৭০ ইবনে আসির, উসদুল *গাবা*, ৩:৪৬৭।
৩৭১ ইবনে আব্দিল বার, *ইসতিয়াব*, ২:১০৮; *তাহযিবুল কামাল*, ১৬:৫৬০।
৩৭২ ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৭৫; সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, *সিরাতুস সাইয়্যিদা আয়েশা*, ২০২।
৩৭৩ ইবনে আব্দিল বার, *ইসতিয়াব*, ২:১০৮।

এ মতের পক্ষে আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করা যায় : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; এ যুদ্ধে কিছু বালককেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার মেধা ছিল প্রখর, যা অপবাদের ঘটনায় তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে ফাতিমা এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়সের পার্থক্য থেকেও বোঝা যায় যে, আয়েশার বয়স ছিল ১৭; তার জ্ঞান, হিজরত সম্পর্কে সতর্কতা এবং পরবর্তী ঘটনাবলি তার স্বাক্ষর বহন করে। মদীনায় পৌঁছার পর পিতার পরামর্শে মোহর আদায় করার পর তার রোখসত সম্পন্ন হয়েছিল।[৩৭৪] তার রোখসতের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৭৫] অধিকন্তু ঐ সময় সমাজে মানুষের জন্মতারিখ এবং মৃত্যুর তারিখ বর্তমান সময়ের মতো এত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হতো না।

এসব বর্ণনা এ সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের আগেই তার জন্ম হয়েছিল, ১৪ অথবা ১৫ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল এবং রোখসতের সময় তার বয়স ছিল ১৭ অথবা ১৮।

এ জটিল পরিস্থিতিতে আরেকটি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 'বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল ৬ বছর এবং ৯ বছর বয়সে আমার রোখসত হয়েছিল' - উক্তির সাথে 'আমি ৬ বছরের বালিকার মতো ছিলাম' কথাটার তুলনা করা প্রয়োজন।[৩৭৬] মূল বিষয় হচ্ছে, আয়েশার গড়ন ছিল হালকা-পাতলা যা এ বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করার যৌক্তিকতায় উপনীত করেছে। তিনি শারীরিক পরিশ্রমে দ্রুত আক্রান্ত হতেন এবং তার সমবয়সীদের তুলনায় একটু ছোট-খাটো মানুষ

---

[৩৭৪] তাবরানি, *কাবির*, ২৩:২৫; ইবনে আব্দিল বার, *ইসতিয়াব*, ৪:১৯৩৭, ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ৮:৬৩।

[৩৭৫] এ ধরনের কয়েকটি বর্ণা হচ্ছে, 'হিজরতের দেড় অথবা দুবছর আগে', 'যখন তার বয়স ছিল ৬ অথবা ৭', 'যখন খাদিজা রা, এর ইন্তেকাল হয় অথবা তার ইন্তেকালের তিন বছর পর', 'হিজরতের সাত অথবা আট মাস পর অথবা হিজরতের প্রথম বছর', 'বদর যুদ্ধের পরপর', দেখুন বুখারী, মানাকিবুল আনসার, ২০, ৪৪; ৩৬।

[৩৭৬] অনেকে মনে করেন যে, এ বর্ণনায় ভুল হয়েছে। তারা বলেন, এখানে আসলে হবে, 'যখন প্রথম ওহী নাযিল হয় তখন আমার বয়স ছিল ৬ অথবা ৭।'

ছিলেন। তার ছোট-খাটো গড়নের পক্ষে এ ঘটনা সাক্ষী বহন করে : মদীনায় হিজরতের পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন;[৩৭৭] তার মা তার প্রতি বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করতেন; [৩৭৮] এবং মৌরুসীর অভিযানে তিনি যখন গলার হার হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন তিনি এত হালকা ছিলেন যে, হাওদায় তার অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায়নি। উটের চালকরা ভেবেছিলেন যে, তিনি হয়ত হাওদার ভেতরেই আছেন।[৩৭৯]

সংক্ষেপে, রোখসতের সময় তার বয়স ৯, ১৭ অথবা ১৮ যা-ই হোক না কেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ এটা তখন কোনো আলোচ্য বিষয় ছিল না। প্রতিটি সমাজকেই তার নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার দিয়ে বিচার করতে হবে। উপরের উদাহরণগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তখন ছেলে-মেয়ে উভয়েরই অল্প বয়সে বিয়ে হতো। আবার আমরা যদি প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যায় যে, তার জন্ম হয়েছিল ৬০৫ সালে, বিয়ে হয়েছিল 14 অথবা ১৫ বছর বয়সে এবং রোখসতের ঘটনা ঘটেছিল ১৭ অথবা ১৮ বছর বয়সে—এটা বাদ দেওয়া বা অস্বীকার করার মতো শক্ত কোনো দলীলও নেই।

---

[৩৭৭] বুখারী, *সহীহ*, মানাকিবুল আনসার, ৪৩, ৪৪, মুসলিম, *সহীহ*, নিকাহ, ৬৯; ইবনে মাযাহ, *সুনান*, নিকাহ, ১৩।

[৩৭৮] বুখারী, *সহীহ*, মানাকিবুল আনসার, ৪৪; মুসলিম, *সহীহ*, নিকাহ, ৬৯।

[৩৭৯] বুখারী, *সহীহ*, শাহাদা, ১৫; মাগাযি, ৩৪; তাফসীর, (২৪) ৬; মুসলিম, তাওবা, ৫৬; তিরমিযি, তাফসীর, (৬৩) ৪; ইবনে সা'দ, *তাবাকাত*, ২:৬৫, ইবনে হিশাম, *সিরা*, ৩:৩১০।

আলী রা. এবং আয়েশা রা.

একটি বড় অপবাদ হচ্ছে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে অপমান করেছিলেন এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। সুতরাং অপবাদের ঘটনার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দূরত্ব বজায় রাখেন; বলা হয় যে, এর পরিণাম হিসেবে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এর প্রমাণ হিসেবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার একটি উক্তিকে পেশ করে। অন্তিম অসুস্থতার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজনের হাত ধরে মসজিদে গিয়েছিলে। এ ঘটনা বলার সময় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম না বলে 'অন্য আরেকজন' বলেছিলেন, দুজনের একজন হিসেবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসুস্থতার সময় তাকে মসজিদে হেঁটে যেতে সহায়তা করেছিলেন। তারা দাবি করে যে, আয়েশা এত বেশি ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচবোধ করতেন।

এ ঘটনার সত্যতা কী? এটা কি সত্য যে, আয়েশা আলীর প্রতি ক্ষিপ্ত ছিলেন এবং তার দ্বারা তিনি অপমানিত হয়েছিলেন? আয়েশার এ আচরণের ব্যাপারে আর কোনো ঘটনা বা তথ্য আছে কি? রাগ এবং আক্রমণের ব্যাপারে আয়েশার সাধারণ আচরণ কী ছিল? এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি কী আচরণ করতেন?

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে অপবাদের ঘটনা ছাড়া আর কোথাও সামান্যতম বিরোধেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত, অপবাদের ঘটনায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির স্বপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়, তা সন্দেহযুক্ত। এসব বর্ণনা দুর্বল,[৩৮০] এবং এত বড় একটি ঘটনা এত দুর্বল বর্ণনার উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করা অযৌক্তিক যেখানে শক্তিশালী আরও বর্ণনা রয়েছে।

তৃতীয়ত, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার 'অন্য আরেকজন' বলার দ্বারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ইশারার সম্ভাবনা ধরে নিলেও হাদীস বিশারদরা বলেন যে, এখানে উসামা বা ফাযল ইবনে আব্বাসের দিকেও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। অন্যান্য হাদীসবেত্তারা আরও দুজনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তারা হচ্ছেন বুরাইরা এবং নুবা। বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায় যে, এখানে 'অন্য আরেকজন' দ্বারা একজন গোলামকে বোঝানো হয়েছে যার নাম জানা যায়নি।[৩৮১]

এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। হয় এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় আরেকজন যার হাত ধরে হাঁটছিলেন, তিনি বদল হয়েছেন। কেবল একজনই সব সময় ছিলেন। তিনি হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নিকটাত্মীয় হিসেবে সারাক্ষণ রাসূলের পাশে ছিলেন এবং সব সময় তার হাত ধরার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যদি আরেকজন বদল হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি উসামা, আলী, ফাযল, বুরাইরা, নুবা বা অজ্ঞাত গোলাম হতে পারেন।[৩৮২]

সম্ভবত যারা বদল করে করে হাত ধরেছেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের সবার নাম না বলে কেবল 'অন্য আরেকজন' বলেছেন। সুতরাং এখানে শুধু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামই বলা হয়নি বিষয়টি এমন নয়। বরং এখানে উসামা, ফাযল, বুরাইরা, নুবা এবং অজ্ঞাত গোলামের নামও নেওয়া হয়নি। এটা অসম্ভব যে, তাদের সকলের প্রতি আয়েশা বিরাগভাজন ছিলেন। এর মানে এখানে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করা বা ইচ্ছাকৃত তার নাম এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় ছিল না।

---

[৩৮০] ইবনে হিব্বান, *সহিহ*, ১০:১৩; ১৬:১৩; আবু ইয়াআলা, *মুসনাদ*, ৮:৩২২, ৩৩৯।
[৩৮১] ইবনে হাযার, *ফাতহুল বারি*, ৮:১৪১; আইনি, *উমদাতুল ক্বারী*, ৩:৯২; ৫:১৮৮।
[৩৮২] নববী, *শরহু মুসলিম*, ৪:১৩৭; ইবনে হাযার, *ফতহুল বারি*, ৮:১৪১, *উমদাতুল ক্বারী*, ৩:৯২, ৫:১৮৮।

চতুর্থত, অপবাদের ঘটনার সময়, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিজেকে কেন কষ্টে ফেলেছেন? আল্লাহ আপনাকে আরও কষ্ট পাওয়া থেকে হেফাজত করুন। তাকে ছাড়া আরও তো অনেক নারীই আছে! আপনি কেন এই কাজের মহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন না? আমার মনে হয়, সে এমন কিছু বলবে যাতে আপনি খুশি হবেন।'[৩৮৩]

তার উক্তি থেকে এটা পরিষ্কার যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উদ্ভূত সমস্যা থেকে মুক্তি কামনা করেছিলেন। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, 'আমি কেবল আপনার জন্যই চিন্তিত। আপনি যখন কষ্ট পান, তখন দুনিয়ার সবকিছু আমার জন্য গৌণ হয়ে যায়।'

সম্ভবত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টিকে বারিরার দিকে ফেরাতে চেয়েছেন। এটাও আশা করেছিলেন, আয়েশা কারও দ্বারা হয়ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন। আর এক্ষেত্রে বারিরা তাকে খুব ভালোভাবেই জানে। অধিকন্তু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন। অপবাদের এক মাসের মাথায় এই আয়াত নাযিল হলো,

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ⑫

> তারা যখন এটা শ্রবণ করল তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করেনি এবং কেন তারা বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (সূরা আন-নূর, ২৪:১২)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, অপবাদ ও মিথ্যা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানদারদের কী রকম আচরণ করা উচিত। ইতহাস সাক্ষী, সেদিন অনেক সাহাবীরাই কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী সঠিক আচরণ করেছিলেন এবং এমন কোনো তথ্য নেই যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের একজন ছিলেন না।

---

[৩৮৩] বুখারী, *সহীহ*, শাহাদাত, ১৫ (২৫১৮), মাগাযি, ৩২ (৩৯১০-১১)।

পঞ্চমত, ঐ দিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার ভাষায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিষয়টি নিয়ে সাহাবীদের সাথে আলাপ করছিলেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের ঘরে প্রবেশ করেন। সবাই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেছেন এবং একবাক্যে ঘোষণা করেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা একটি অপবাদ। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ধীর-স্থিরভাবে কথা বলা শুরু করেন এবং এভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতার বর্ণনা দেন :

> ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জানি তিনি এ ঘটনা থেকে পবিত্র এবং নির্দোষ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, একদিন আপনি জুতা পরেই নামায পড়াচ্ছিলেন এবং একসময় এক পায়ের জুতা খুলে ফেলেন। এটা আমাদের জন্য একটি বিব্রতকর অবস্থা ছিল এবং আমরা শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম, এটা সুন্নাত কি না। আপনি বলেছিলেন, না। পরে এর ব্যাখ্যায় বললেন যে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আপনার কাছে এসেছিলেন এবং আপনাকে বলেছিলেন যে, আপনার এক জুতায় ময়লা লেগে আছে যাতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যদি আপনাকে এ রকম সামান্য বিষয় থেকে রক্ষা করেন, তাহলে কি তিনি আপনার পরিবারের বিষয়ে রক্ষা করবেন না?

এখানে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহান চরিত্র এবং সত্যিকার আচরণ ফুটে ওঠে। উমর এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মতো তিনিও বলেছেন যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নির্দোষ। তার এ আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়েছিলেন এবং তা কুরআনেরও সমার্থক বটে।

ষষ্ঠ, আমরা যদি কোনো কারণে বাধ্য হয়ে ধরে নেই যে, আলী এ অপবাদ বিশ্বাস করতেন, তাহলেও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে এটা প্রমাণ করা অসম্ভব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপবাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হওয়ার পর হাসসান ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু, মিসতাহ

ইবনে উসাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হামনাহ বিনতে জাহশকে শাস্তি দিয়েছেন। যদি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তিকে অপবাদের পক্ষে সাব্যস্ত করা হতো, তাহলে তাকেও শাস্তি দেওয়া হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, যে কেউ এ ঘটনায় জড়িত, সে যেই হোক না কেন, তাকে শাস্তি দেবেন।[৩৮৪]

তারপরেও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনে অতীত কোনো ক্রোধ বা আক্রোশ ছিল না। এটা বাস্তবিক একটি অসম্ভব ব্যাপার যে, রাসূলের প্রিয়তম স্ত্রী হয়ে তিনি এ ধরনের আক্রোশ অন্তরে লালন করবেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাই বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতেন না।[৩৮৫] এ ব্যাপারে সবার ঐক্যমত যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের একজন একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন যেখানে ঘৃণার পরিবর্তে ঘৃণাকে মারাত্মকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।[৩৮৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে নিশ্চয়ই তার মধ্যে এ ধরনের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। এ রকম অনকে উদাহরণ রয়েছে। যখন তার পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল হয়, তখনো তিনি হাসসান ইবনে সাবিতের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করেননি। হাসসান ইবনে সাবিত আসলে মুনাফিকদের চক্রান্তে পড়ে এ হীন কাজে শরীক হয়েছিলেন এবং এজন্য শাস্তি পেয়েছেন। তার ব্যাপারে যখন কেউ মন্দ কথা বলেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা শুনে খুব মর্মাহত হয়েছেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেছেন, তিনি তার কবিতার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন।[৩৮৭]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রে মানুষকে ক্ষমা করার ঘটনা এই একটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নিজের ভাইকে যে হত্যা করেছিল, তার প্রতি

---

[৩৮৪] তিনি এ কথা এক মহীয়সী নারীর ক্ষেত্রে ঘোষণা করেছিলেন যিনি চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। দেখুন বুখারী, *সহীহ*, আম্বিয়া, ৫২ (৩২৮৮)।
[৩৮৫] বুখারী, *সহীহ*, মানাকিব, ২০ (৩৩৬৭)।
[৩৮৬] দেখুন সূরা ফুরকান, ২৫:৭২।
[৩৮৭] বুখারী, *সহীহ*, মাগাযি, ৩২ (৩৯১৪)।

আয়েশার আচরণও বিস্ময়কর।[৩৮৮] যখন সে আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ করতে এল, আয়েশা তাকে আব্দুর রহমান ইবনে সুমাসার প্রশ্নগুলো করলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা খলীফার প্রতি সন্তুষ্ট, তখন তিনি বললেন, 'তিনি আমার ভাইয়ের সাথে যে আচরণ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা তোমাকে বলার ক্ষেত্রে সেটা কোনো অন্তরায় নয়।' তারপর যে শাসকের প্রতি তার অধীনস্থরা সন্তুষ্ট, তার প্রশংসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খোশখবরী দিয়েছেন, তা বর্ণনা করেন।

এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন মানুষকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবেন যিনি সর্বদা আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে ছিলেন, যিনি তার ভাইয়ের হত্যাকারীর সাথে এত স্বাভাবিক সুন্দর ব্যবহার করেছেন এবং জীবনে এক কঠিন সময় পার করেছেন। এটা চিন্তার কোনো অবকাশ নেই যে, তিনি তার মৃত্যু অবধি কারও সম্পর্কে ঘৃণার কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

সপ্তম, হুজর ইবনে আদি এবং তার সাতজন বন্ধুকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খলীফা মুআবিয়ার নিকট হুজর ইবনে আদির জন্য সুপারিশ করে পত্র লিখেছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনার পর তিনি যে কোনো উপায়ে যে কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। হুজরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তিনি চরমভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তিনি খলীফার নিকট এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনি যখন হুজর এবং তার বন্ধুদের হত্যা করা হলো? তুমি কেন হুজরকে ক্ষমা করোনি? কেন তুমি তাকে অব্যাহতি দিলে না?'[৩৮৯]

---

[৩৮৮] আয়েশার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর আলী রা.-এর পক্ষে জঙ্গে আমাল এবং সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

[৩৮৯] এখানে বিভিন্ন বর্ণনা একত্র করা হয়েছে : আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ৪:৯২ (১৬৮৭৮)। এর বিস্তারিত জানতে দেখুন : তাবারি, *তারিখ*, ৩:২২০, ২৩২; ইবনে আব্দিল বার, *ইসতিয়াব*, ১:৩৩২।

অষ্টম, দেখা যায় যে, সবচেয়ে কঠিন সময়ে আয়েশা আলীকে সামনে অগ্রসর করে দিয়েছেন।[৩৯০] উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর তিনি বলেছেন যে, আলীই খেলাফতের উপযুক্ত এবং সবাইকে তার কাছে বাইআত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।[৩৯১] যে প্রশ্নের উত্তর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ভালো দিতে পারবেন বলে মনে করতেন, সেক্ষেত্রে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লোকজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[৩৯২]

একদিন উষ্ট্রের যুদ্ধের কথা মনে করে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তখন তিনি নিকটস্থ লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

> হে আমার সন্তানেরা! দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা একে অন্যকে আঘাত করেছি। মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত করেছি এবং খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর থেকে কেউ যেন কারও দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে না তাকায় অথবা যা হয়েছে এজন্য আবার যুদ্ধে লিপ্ত না হয় অথবা অনর্থক বাক-বিতণ্ডা না ছড়ায়। আল্লাহর কসম! একজন নারীর তার জামাইদের সাথে যেরকম সম্পর্ক থাকে, তাছাড়া অন্য কোনো বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক আমার ও আলীর মধ্যে অতীতে ছিল না। যদিও আমি কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, তারপরেও তিনি সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠদের একজন যার জন্য আমি ভালো কামনা করি।

উপরের বক্তব্য থেকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মহান চরিত্রই প্রকাশ পায়। তিনি জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং যারা এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল, তিনি তাদের নিরাশ করেছেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজে আয়েশাকে মক্কার পথে এগিয়ে দিতে একসাথে হেঁটেছেন এবং তার ছেলেকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে নির্দেশ

---

[৩৯০] তিরমিযি, মানাকিব, ৬১ (৩৮৭৪)।
[৩৯১] ইবনে আবি শাইবা, *মুসান্নাফ*, ৭:৫৪৫ (৩৭৮৩১); ইবনে হাযার, *ফতহুল বারি*, ১৩:৫৭।
[৩৯২] মুসলিম, *সহীহ*, তহারা, ৮৫ (২৭৬); নাসাঈ, *সুনান*, তহারা, ৯৯ (১২৯)।

দিয়েছেন—আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুও উম্মুল মুমিনীনের প্রতি একই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।[৩৯৩]

তারা দুজনেই সব দিক থেকেই মহান মানুষ ছিলেন। একদিন আগে কি হয়েছিল, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। বরং তারা একে অন্যের অধিকারকে মূল্য দিয়েছেন এবং কাউকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো সুযোগ দিতেন না। একদিন এক লোক এসে আয়েশার কাছে আলী এবং আম্মারের বদনাম বলা শুরু করে। তিনি তখনই তাকে থামিয়ে দেন এবং আর একটি কথাও বলার সুযোগ দেননি। তিনি আলী এবং আম্মারের প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি। তিনি একের পর এক তাদের প্রশংসাসূচক গুণাবলির উল্লেখ করেছেন।[৩৯৪] যদিও তিনি জানতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার সম্পর্কে কী বলেছেন এবং তিনি এও জানতেন যে, আম্মার আলীর পক্ষে তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু এক উচ্ছ্বসিত ও নিষ্ঠুর জাতির হাতে নিহত হবেন এবং তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে লড়ে নিহত হন।

অন্যদিকে যুহ আস-সুদাইয়্যার মতো মানুষ বর্বতার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে নিহত হন। আয়েশা খুব গভীরভাবে সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন এবং ঘটনাসমূহ আলীর সততাই প্রকাশ করে। তার সমস্যা-সঙ্কুলতা দেখে তিনি প্রায়ই আফসোস করতেন, তিনি কত ভালো মানুষ এবং তার অবর্তমানে তার জন্য দুআ করতেন। খারিজীরা আলীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আয়েশা খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তারা যখন উসমানকে হত্যা করল, তখন বলেন, 'যখন তাদের আল্লাহর রাসূলের বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হলো, তার পরিবর্তে তারা আরও জঘন্য মন্তব্য করছে।'[৩৯৫]

---

[৩৯৩] তাবারি, *তারিখ*, ৩:৬১।
[৩৯৪] যারকাসি, *আল-ইযাবা*, ৮৬৩-৮৬৪।
[৩৯৫] মুসলিম, *সহীহ*, তাফসীর, ১৫ (৩০২২); ইসহাক ইবনে রাহুইয়া, *মুসনাদ*, ২:৩২১ (৮৪৭)।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিহত হওয়ার ঘটনায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ভীষণভাবে আহত হন। তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ দিনের ঘটনা জানার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের জন্য চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন, তখন তিনি তার জন্য দুআ করেন এবং এটা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, তার হত্যাকারীরা সীমা অতিক্রমকারী।[৩৯৬] আর তারা যে শহরে থাকত, হারুরা শহর, সেটাকে শয়তানের কেন্দ্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তীতে যখন কাউকে মন্দ কোনো কাজ করতে দেখতেন, তাকে বলতেন, 'তুমি কি হারুরা শহরের অধিবাসী?'[৩৯৭]

নবম, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর আচরণ ভিন্ন ছিল না। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো আয়েশার বিরুদ্ধে কাউকে তার সামনে কিছু বলতে দিতেন না এবং নিজে কখনই তার সাথে অসম্মানের ব্যবহার করেননি। উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল তার জীবনের সবচেয়ে চরম পরীক্ষা। এ ঘটনায় তিনি খুব মর্মাহত হন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার সাথে তার এ পরীক্ষার কথা মনে হলেই তিনি প্রচণ্ডভাবে অনুশোচনায় আক্রান্ত হতেন। ঐ দিন তিনি আয়েশার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে একটি নির্দেশ দেন যে তার বাহিনীতে ছিল। তিনি আয়েশাকে তার ভাই এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মক্কায় পাঠান, তাদের সাথে বসরার চল্লিশজন মহিলাও সফরসঙ্গী হন। তিনি তার বাহিনীর সদস্যদের আয়েশার বাহিনীর কাউকে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে বলেন।[৩৯৮] তিনি বলেন, 'আজ আমি আশা করি, যারা তাদের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তারা জান্নাতে যাবে।'[৩৯৯] তিনি শহীদদের জানাযায় ইমামতি করেন।[৪০০]

এই মহানুভবতা কেবল আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর

---

[৩৯৬] আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*, ১:৮৬-৮৭ (৬৫৬); হাকিম, *মুসতাদরাক*, ২:১৬৫ (২৬৫৭)।
[৩৯৭] বুখারী, *সহীহ*, হাইদ, ২০ (৩১৫)।
[৩৯৮] তাবারি, *তারিখ*, ৩:২৯; ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া*, ৭:২৩৮।
[৩৯৯] বাইহাকি, *সুনান*, ৮:১৮১ ।
[৪০০] তাবারি, *তারিখ*, ৪:৫৩৪; ইবনে হালদুম, *তারিখ*, ২:৬০৬।

সকলের মধ্যে এই একই আচরণ পরিলক্ষিত হয়।[৪০১] এসকল ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে কোনো ধরনের গোস্বা বা বিরোধ ছিল না। এটা কোনোভাবেই উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ ছিল না।

[৪০১] সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, *সিরাতুস সাইয়্যিদা আয়েশা*, ১৮০।

গ্রন্থপঞ্জি

- আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম, আবু বকর আস-সানানি, *আল-মুসান্নাফ*, হাবীবুর রহমান আল-আযমি কর্তৃক আলোচনা, আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, বৈরুত ২০০৩
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশাস আস-সিজিসতানি আল-আযদি, *সুনান*, মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুলহামিদ কর্তৃক আলোচনা, তালিক: কামাল ইউসূফ হাট, দারুল ফিকির, বৈরুত
- আবু হাইয়্যান, আসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ আল-আন্দালুসি, *বাহরুল মুহিত*, দারুল ফিকির: ১৯৮৩।
- আবু হাইয়্যান আত-তাওহিদি, আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাস, *আল ইমতা ওয়াল মুআনাসা*, www.alwarraq.com
- আবু নুইম, আহমাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-ইসফাহানি, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কিতাবিল আরাবিয়া, বৈরুত: ১৪০৫ হি.।
- আবু ইয়ালা, আহমাদ ইবনে আলী আল-মাওসিলি, *মুসনাদ*, দারুল মামুন লিত-তুরাস, আলোচক: হুসাইন সেলিম আসাদ, দামেস্ক:১৯৮৪।
- আবুল ফারায আল-ইসফাহানি, *আল-আগানি*, আলোচক: সামির যাবির, দারুল ফিকির, বৈরুত।
- আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলী ইবনে বলবান, *আল ইহসান বি তারতিবি সহিহি ইবনে হিব্বান*, আলোচক: ইউসূফ হাট, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু আব্দুল্লাহ আস-শাইবানি, *আল-মুসনাদ*, যাইল: শুআইব আরনাবুত, মুআসসাসাতু কুরতুবি, কায়রো
- আল-আযলুনি, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে মুহমাম্মাদ, *কাশফুল খাফা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৯৮৮।
- আলী আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত: ১৯৮৯।
- আলুসি, *রুহুল মাআনি*, দারু ইহাইআত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- আইনি, আবু মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *উমদাতুল ক্বারি*, দারু ইহাইআত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- আযিমাবাদি, আবুত তাইইব মুহাম্মাদ, শামসুল হক, আওনুল-মা'বুদ শরহু সুনান-ই আবি দাউদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত: ১৪১৫ হি.।
- বুখারি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, সহীহ বুখারি, ১-৪, বৈরুত : দার ইবনে কাছির, ১৯৮৭
- যাহাবি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান আয-যাহাবি, সিয়ারুন নুবালা, ১-১৩, বৈরুত : মুআসসাসাত আর-রিসালা, নবম সংস্করণ, ১৯৯৩.

- জামিলি, আস-সৈয়দ, নিসাউন হাউলার রাসূল, আল মাকতাবাত আত-তাওফীকি
- হাকীম, আবু আব্দুলাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুলাহ আন-নাইসাবুরি, আল-মুসতাদারাক আলাস-সহীহাইন, ১-৫, বৈরুত, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৯০
- হালাবি, মাহমুদ তু'মা, আলা-মায়িদাত আল-আওয়াল মিন সাহাবিয়্যাত আর-রাসূল, বৈরুতঃ দার আল-মা'রিফা, ২০০৪
- হাইসামি, আলী ইবনে আবি বকর আল-হাইসামি, আল-মাযমা উয্যাওয়াইদ, দারুল ফিকির, বৈরুতঃ ১৪১২ হি.।
- ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ ইবনে আব্দুলাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুতঃ ১৯৯৫।
- ইবনে আসির, উসদুল গাবা, কায়রোঃদার আস-সাব, ১৯৭০
- ইবনে হাযার, আবুল ফযল শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে আলী আল-আসকালানি, ফতহুল বারি শরহু সহীহুল বুখারী, দারুল মারিফা, বৈরুতঃ ১৩৭৯ হি.।
- ইবনে হিশাম, আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হিমইয়ারি, আস-সিরাতুন নবুওওয়া, ১-৬, বৈরুত : দার আল-যিল, ১৪১১ হি.
- ইবনে ইসহাক, সিরাহ, কনইয়াঃ ১৯৮১।
- ইবনে কাসির, আবু আল-ফিদা, ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির আদ-দিমাশকি, আল-বিদইয়া ওয়ান-নিহাইয়া, ১-১৪, বৈর ত : দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৮
- ইবনে মাযাহ, *আস-সুনান*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- ইবনে মানদা, *মারিফাতুস সাহাবা*।
- ইবনে মনযুর, আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী আল-আনসারি জামালুদ্দিন, *আল-ইফরিকি*, *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ১-৮, বৈরুত : দার আস-সাদির
- মুনাবি, মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ ইবনে আলী আল-মুনাবি, *ফাইযুল কাদির শরহে আল-জামিউস সাগির*, ১-৬, ইজিপ্ট : আল-মাকতাবাত আত-তিযারিইয়্যাত আল-কুবরা, ১৩৫৬ হি.
- মুসলিম, আবুল হুসাইন ইবনে হাজ্জায আল-কুশাইরি আন-নুসাইবুরি, *সহীহ মুসলিম*, আলোচক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি, দার আল-ইলহা আত-তুরাস আল-আরবি, বৈরুত।
- সানানি, সুবুলুস সালাম, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুতঃ ১৯৮৭।
- সালাবি, মাহমুদ, *হায়াতু আয়েশা*।
- সুয়ূতি, আবুল ফযল জালালুদ্দিন আব্দুররহমান ইবনে আবু বকর, *আল-জামিউস সাগির ফি আহাদিসুল বাশিরুন নাযির*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরুতঃ ১৯৯০।
- তাবারানি, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ, *আল-মু'যাম আল-আওসাত (তারিক ইবনে ইবাদুল্লাহ কর্তৃক আলোচনা)*, দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি.

- তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ ইবনে খালিদ আত-তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক (তারিহ আত-তাবারি)*, ১-৫, বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৭ হি.
- তাহমায, আব্দুল হামীদ মুহাম্মাদ, *আস-সাইয়্যিদাতু আয়েশা*, দারুল কলম, দামেস্ক, ১৯৯৯
- তানতাভি, *আবু বকর আস-সিদ্দীক*, দারুল মানার, জিদ্দা: ১৯৮৬
- তাইয়ালিসি, *আবু দাউদ*, *মুসনাদ*, দারুল মাআরিফা, বৈরুত
- তিরমিযি, *আল-জামিউল কাবির (সুনান)*, তাহকিক তাহযির ওয়া তালিক: বাশশার আওওয়াদ মারুফ, দারুল ঘারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত: ১৯৯৬
- ইয়াকুত আল-হামাভি, আবি আব্দিল্লাহ শিহাবুদ্দিন ইবনে আব্দিল্লাহ, *মুযামুল বুলদান*, ফরিদ আব্দুল আজিজ আল-যুনদি কর্তৃক আলোচনা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
- জগলুল, আবু হাজার মুহাম্মাদ সাইদ আবু হাজার মুহাম্মাদ সাইদ ইবনে বাসইউনি, *মাউসুআতু আতরাফিল হাদিসীন নববীয়্যিশ শরীফ*, আল-মাকতাবাতুত তিযারিয়্যা, মুস্তফা আহমাদ আল-বায, দারুল ফিকর, বৈরুত:১৯৯৪
- যাবিদি, আবুল ফাইয মুরতাযা মুহাম্মাদ, *তাযুল আরুস মিন যাওয়াহিরুল কামুস*, দারুল ফিকর, বৈরুত: ১৪১৪
- যারকাসি, বদরুদ্দিন, *আল-ইযাবা লিমা ইসতাদরাকাসু আয়েশা আলাস-সাহাবা*, মাকতাবাতু মিশকাতিল ইসলামিয়্যা
- যাইলাঈ, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়ূসুফ আল-হানাফী, নসবু'র রাইয়া লি আহাদিসিল হিদায়া, গ্রন্থ সমালোচনা, মুহাম্মাদ ইয়ূসুফ আল-বাননূরী, দারুল হাদীস, মিশর : ১৩৫৭ হি.
- যিরিকলি, *আলম*, দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত : ১৯৮০

কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ওয়েবসাইটসমূহ

১। মাওসুআতুল হাদীস শরীফ ২.০০, শহর কোম্পানী (শিরকাতু হরফ লি তাকনিয়াতিল মালুমাত, মিশর)

২। 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' ২.১১, http://www.waqfeya.net/shamela

৩। 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা' ১.৫, http://www.waqfeya.net/shamela

৪। 'আল-জামিউল কবির লী কুতুবিত তুরাসী' ২.০, তুরাস কম্পিউটার সার্ভিসেস, জর্ডান, ২০০৫

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন

- কুরআন ও বিজ্ঞান (৳২৪০) | ইসলাম ও সামাজিকতা (৳৩০০) । ইসলামে আধুনিকতা (৳৩০০) | তাবলীগ ও তা'লীম (৳২৪০) | পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি (৳৩০০) । An Appeal to Common Sense (৳৪০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন

- আত্মশুদ্ধির পাথেয় (৳২৪০) | প্রফেসর হযরতের মালফুযাত (৳৩০০) | সংকলন : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

- প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর (৳৩০০) | প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর (৳২২০) | সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি (৳২৩০) | পথের দিশা (প্রতিটি ৳৪০০) | সোহবতের গল্প (৳৩০০) | একজন আলোকিত মানুষ (৳৩০০) | একা একা আমেরিকা (৳৩০০) | পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন (৳৩০০) | মুহাম্মাদ আদম আলী

- খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি (৳২৪০) | জীবন ও কর্ম : আয়েশা রা. (উম্মুল মুমিনিন, সঙ্গীনী, ফকীহ) (৳৪০০) | রশীদ হাইলামায | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয় | মাওলানা মনযূর নুমানী রহ. | অনুবাদ : মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ | মূল্য : ৳ ৩০০.০০

- জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (মোট মূল্য ১২০০) | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ | ড. তারিক রমাদান | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ৪০০.০০

- মুনাজাতে মাকবুল (৳২০০) | মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. | পিচ্ছিল পাথর (৳৪৮০) | খাদের বেগ | বাংলা অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী

- মালফুজাতে বোয়ালভী রহ. | সংকলন : মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ | মূল্য : ৳ ৩০০.০০

- **মুমিনের সফলতা** | হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া | সংকলন : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ২০০
- **হাদীসের দুআ দুআর হাদীস** | ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী | অনুবাদ ও টীকা : মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৩০০.০০
- **রমযান মাস : গুরুত্ব ও করণীয়** | মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান | মূল্য : ৳ ৩২০.০০
- **মুহাররম মাস : গুরুত্ব ও করণীয়** | সংকলন ও অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান | মূল্য : ৳ ২৪০.০০
- **The Accepted Whispers** (৳৪০০.০০) | **Listening to the Quran** (৳৫০০.০০) | **First Things First** (৳৮০০.০০) | Khalid Baig
- **জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য ১১০০
- **জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : উম্মে মুহাম্মাদ / মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য : ৳ ১৪০০.০০
- **মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন** | শায়খ মাহমূদ আল-মিসরী অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক | মূল্য : ৳ ৯০০.০০
- **জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা. (প্রথম খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী | মূল্য : ৳ ৮০০.০০
- **জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা. (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)** | ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মোট মূল্য : ৳ ১৫০০.০০
- **তোমাকেই বলছি হে আরব** | সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. | অনুবাদ : মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ | মূল্য : ৳ ২০০.০০
- **তাফসীরে মুযিহুল কুরআন (প্রথম খণ্ড)** | শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম | মূল্য : ৳ ৮০০.০০
- **সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. : হৃদয়ের বাদশাহ (প্রথম খণ্ড)** | রাশীদ হাইলামায | অনুবাদ : মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য : ৳ ৮০০.০০

রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রী, সঙ্গিনী, ফকীহ

এ গ্রন্থে ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত বিভিন্ন অপবাদ ও অপব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য বিবিদের তুলনায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আরও বেশি সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। সীরাত বিশেষজ্ঞ ড. রাশীদ হাইলামায ইসলামের বিশ্বস্ত তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপ্তিময় জীবনের ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন; ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নে তার বিশাল ভূমিকা, বিশেষ করে মহিলাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণে ইসলামী অভিজ্ঞান প্রচার-প্রসার এবং রাসূলের বাণীকে সঠিকভাবে সংরক্ষণে যে নিবেদিত ভূমিকা রেখেছেন, তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তার ধার্মিকতা এবং তাকওয়া-পরহেজগারিসহ অন্যান্য গুণাবলী বিভিন্ন ঘটনায় যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়সমূহ (যেমন : তার বিয়ের বয়স, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি) আলাদা অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। দ্বীনী ব্যক্তিত্ব গঠন ও নিজেকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।